কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র

(ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
ভূমিকা সম্বলিত)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কলিকাতা
শ্রীগুরু লাইব্রেরী

প্রথম সংস্করণ
আষাঢ়
১৩৬৬

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস-সি.
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মূল্য—পাঁচ টাকা

আচার্য্য যতুনাথ সরকার

স্মরণে

আমার কথা

শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। এই আপ্তবাক্যটির সারবত্তা বর্তমান পুস্তক প্রকাশ ব্যাপারে মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি। আট-নয় বৎসর অতীত হইল, পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কলিকাতার সে যুগের বিশিষ্ট সংস্কৃতি-কেন্দ্রগুলির কথা লিখিতে সুরু করি। সম্পাদক অনুগ্রহ করিয়া লেখকস্থলে 'কহ্লন' এই ছদ্ম নামটি বসাইয়া দেন। কয়েকটি কেন্দ্রর কথা প্রকাশিত হইবার পর আমি একদিন আচার্য যদুনাথ সরকারকে এই প্রবন্ধমালার কথা বলি। পরে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলে প্রসঙ্গতঃ তিনিই এই লেখাগুলির বিষয় উল্লেখ করিলেন এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার পক্ষে কিছু উপদেশও আমাকে দিলেন। প্রবন্ধমালার শেষ কিস্তি বাহির হইলে, তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিবেন এইরূপ আশ্বাসও আমায় দিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে সরকারী অর্থসাহায্য কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত হওয়ায় পুস্তকখানি প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু আচার্য্য যদুনাথ সরকার আর ইহলোকে নাই।

পুস্তকখানিতে ঊনত্রিংশটি সংস্কৃতি কেন্দ্রের কথা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪) হইতে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির (১৯১৭) পর্যন্ত প্রায় দেড়শত বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় বহু শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষিকার্য্য, সমাজসেবা প্রভৃতির কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল কেন্দ্রের বিশেষ কয়েকটি লইয়া আমি আলোচনা করিয়াছি। আলোচনা-কালে প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যবিবরণী, মূল নথিপত্র, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তকাদির বিশেষভাবে

আশ্রয় লইয়াছি। কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ পূর্তির ইতিহাস বা স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের ভিতর হইতেও তথ্য সংগ্রহে সুবিধা হইয়াছে। সাধারণ পাঠক-পাঠিকার নিমিত্তই এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হয়। কাজেই ইহাতে বাহুল্যবর্জ্জন করিতে সবিশেষ যত্ন লইয়াছিলাম। তথ্যপঞ্জীও তখন দেওয়া আবশ্যক বোধ করি নাই। এখন, এতদিন পরে এসব সংগ্রহ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার দৃষ্টিশক্তি অতিমাত্রায় ক্ষীণ হওয়ায় এ বিষয় এখন একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক, 'এশিয়াটিক সোসাইটি' নামে প্রাচ্য বিদ্যা চর্চ্চার নিমিত্ত বিদ্বজ্জন-সভা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, এমন কি ভারতবর্ষে একাধিক রহিয়াছে। বাঙ্গালার 'এশিয়াটিক সোসাইটিকে' বিশেষ করিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে 'বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি' এই নাম দিয়াছি। বস্তুতঃ ইহা নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমানে মূল 'এশিয়াটিক সোসাইটি' নামেই অভিহিত হইতেছে।

যাহারা পুস্তকখানি প্রকাশে আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এবং সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায়ের কথা প্রথমেই মনে উদিত হয়। শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। গ্রন্থোক্ত সংস্কৃতি-কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটির সঙ্গে ছেলেবেলা হইতে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটির বিষয় বলিতে বলিতে তিনি আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সান্যাল বৎসরাধিক কাল ধরিয়া এই প্রস্তাবগুলি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একারণ তাঁহাকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থখানির প্রুফ পরীক্ষণে এবং নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করায়

শ্রীযুক্ত গৌতম সেন আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাস কয়েকটি কেন্দ্রের আলোকচিত্র তুলিয়া দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

আরও কয়েকজনের কথা বড়ই স্মরণ হইতেছে। গ্রন্থোক্ত সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলির প্রত্যেক স্থলেই বিভিন্ন প্রস্তাব লিখিবার প্রাক্কালে পুনরায় গমন করি এবং স্বচক্ষে দেখিয়া শুনিয়া লই। এই সময় আমার শরীর ভাল ছিল না। কনিষ্ঠপ্রতিম শ্রীমান্ মনীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কোন কোন সময় আমার সঙ্গী হন। অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম বীক্ষণকালে প্রায় তিন ঘণ্টা আমার সঙ্গে ছিলেন। শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায় শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে আমার সমভিব্যাহারী হন। টাউন হল নূতন করিয়া দেখিবার সুযোগ পাই শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষালের একখানি পত্রের সাহায্যে। আরও কয়েকজনের সহায়তা লাভ করিয়াছি, কিন্তু সকলের নাম মনে পড়িতেছে না। তবে তাঁহাদের প্রত্যেককেই আমি সাধুবাদ করি।

দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর বর্ত্তমানে পুস্তকখানি প্রকাশ সম্ভব হইল দুইটি কারণে। একটি, সরকারী সাহায্য লাভ; দ্বিতীয়টি বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক শ্রীগুরু লাইব্রেরীর আন্তরিক সহানুভূতি। পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মজুমদারকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আজ বার বার আচার্য্য যদুনাথ সরকারকে অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি নিবেদন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। ইতি—১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ সাল

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভূমিকা

আধুনিক যুগে বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও প্রগতি লইয়া যাঁহারা সার্থক আলোচনা ও গবেষণা করিয়া এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় একজন অগ্রণী। পরলোকগত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃতিত্ব এ বিষয়ে ছিল অনন্যসাধারণ, এবং তিনি বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ সম্বন্ধে এই যুগের পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও নথী-দলিল আদি ঘাঁটিয়া যে তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন, তাহার মূল্য সকলেই স্বীকার করেন ; এবং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যু এক্ষেত্রে বাঙ্গালীর গবেষণায় একটা মস্ত বড় ছেদ রাখিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেশ-বাবুর বয়স এখন ৫৬ বৎসর, কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া নিজ নির্বাচিত ক্ষেত্রে নীরব সাধনা করিয়া আসিতেছেন, এবং আমাদিগের সমক্ষে যে-সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ উপস্থাপিত করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য বাঙ্গালী সমাজ তাঁহাকে আত্মজ্ঞানলাভের পথে কল্যাণ-মিত্র বলিয়া চিরকাল সাধুবাদ দিবে।

প্রস্তুত পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত যোগেশ-বাবুর অন্যতম দান। বিগত শতক ও এই শতকের প্রথম পাদ ধরিয়া ভারতের আধুনিক সংস্কৃতির যে ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার গঠনে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব সর্ববাদিসম্মত। ইংরেজ জাতি ও ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে ইউরোপের মনন-শক্তি ও কর্ম-প্রচেষ্টার সহিত পরিচয়ের সুযোগ ভারতবর্ষের তিনটী অঞ্চলের লোকেদের পক্ষে সর্বপ্রথম ঘটিয়াছিল,—বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা (এবং বাঙ্গালা)। কিন্তু বাঙ্গালাদেশেই প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ এমন কয়েকজন মনীষী ও চিন্তানেতার আবির্ভাব ঘটিল, যাঁহাদের চেষ্টায় ও আগ্রহে আধুনিক ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মোড় ফিরিয়া গেল,

ভারতবর্ষ মধ্যযুগের বাতাবরণ পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক যুগের দিকে গতিপথ গ্রহণ করিল। ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতি নূতন রূপ গ্রহণ করিল ; এবং এই রূপের মুখ্য কথা হইতেছে, ভারতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বমানবের গ্রহণ-যোগ্য এবং সকলের কল্যাণাবহ, তাহার সংরক্ষণ ; এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান-কলা-দর্শন-সাহিত্য প্রভৃতি সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমস্ত অঙ্গ হইতেই আমাদের পক্ষে যাহা কিছু শুভঙ্কর ও গ্রহণযোগ্য হইবে, সাদরে তাহার গ্রহণ ও আত্মসাৎকরণ ; এক কথায়, যোগ ও ক্ষেম, অর্থাৎ পার্থিব বস্তুর যোগ, ও ভাল যাহা আছে তাহার রক্ষা দ্বারা ক্ষেম বা কল্যাণ-সাধন। এইভাবে আধুনিক ভারতের চিন্তাধারা ও সভ্যতা পুষ্টিলাভ করিয়াছে ; এবং এই কার্য্য সর্ণম্পূ করা এখনও হয় নাই, ইহা এখনও চলিতেছে। ছয় সাত পুরুষ ধরিয়া বাঙ্গালী এদিকে সাধনা করিয়াছে,—চিন্তা ও কর্ম দ্বারা জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়ের এই আদর্শকে—ভারতবর্ষকে স্বাধীন এবং শক্তিশালী ও বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত করিবার আদর্শকে—রূপায়িত করিবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছে।

এই সাধনা, এই চেষ্টা ও শ্রম বাঙ্গালী কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফলবান্ করিতে পারিয়াছে ; এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দুই চারিটী ইংরেজ মনীষী ও সহৃদয় ব্যক্তিগণের চেষ্টায় প্রথম স্থাপিত হয় ও কার্য্যকর হয়, দু-দশটী ইংরেজ ও বাঙ্গালীর সহযোগিতায় গঠিত হয়, এবং কয়েকটী কেবল বাঙ্গালীরই আগ্রহে ও কর্মচেষ্টার ফলে স্থাপিত ও পরিচালিত হয়। সমস্তগুলিই কলিকাতাতেই স্থাপিত হয়। এই প্রকারের প্রায় ত্রিশটী মুখ্য প্রতিষ্ঠানের কথা গ্রন্থকার এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাসের সহিত এ যুগের বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের মানসিক প্রগতির ইতিহাস অন্তরঙ্গভাবে জড়িত হইয়া আছে। এইগুলি একাধারে বাঙ্গালীর মানসিক স্ফূর্তির এবং কর্মের উৎস ও প্রকাশভূমি। এগুলির পূর্বকথা

ভুলিলে চলিবে না, যদিও সাধারণ বাঙ্গালী শিক্ষিত জন এগুলির কথা ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের কার্য্য সমগ্র মানবজাতির সংস্কৃতির প্রসারণে সহায়তা করিয়াছে—যেমন কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, ভারতীয় সংগ্রহালয়, কলিকাতা (ও সমকালীন অন্য দুইটী) বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদি। কতকগুলির দ্বারা বিজ্ঞানের পত্তন ও উন্নতি এই দেশে সম্ভবপর হইয়াছিল, এবং অন্য কতকগুলির দ্বারা Humanities বা Humanistic Studies অর্থাৎ "মানবিকী বিদ্যা"-ও স্বকীয় বিশিষ্ট ভারতীয়তার আধারে পুনপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্রের বইখানি নানা তথ্যে সমৃদ্ধ, এবং বহু দিন ধরিয়া এই বই একখানি প্রথম শ্রেণীর প্রামাণিক গ্রন্থরূপে বিরাজ করিবে। নিজের জাতির কৃতিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে, আত্মবিশ্বাস ও কর্মস্পৃহা শক্তিলাভ করে না। আধুনিক কালের শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে আত্মসমীক্ষার সাধন এই বইখানি মানসিক জীবনে ও সমাজ সেবার এবং শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে শক্তি আনিয়া দিতে সাহায্য করিবে, ইহাই হইতেছে এই বইয়ের মুখ্য সার্থকতা। এতদ্ভিন্ন, যে-সকল মনীষীর চেষ্টার ফলে আধুনিক কালে বাঙ্গালীর গৌরব বাড়িয়াছে, বাঙ্গালীকে সত্য সত্য রক্ষা করিতে যাঁহাদের সাধনা কার্য্যকর হইয়াছে, শ্রীযুক্ত যোগেশ-বাবু সেই-সমস্ত বরণীয় ও স্মরণীয় মহাপুরুষদের কথাও প্রসঙ্গতঃ আমাদের শুনাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হইবার সুযোগ আমাদের দিয়াছেন, এবং আংশিকভাবে আমাদের ঋষিঋণ—পরিশোধ করিবার কথা দূরের বস্তু—ঋষিঋণ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

আশা করি এই পুস্তক নিজগুণে বাঙ্গালা পাঠক-সমাজে সাদরে গৃহীত হইবে, এবং সর্বত্র ইহার বহুল প্রচার হইবে। ইতি মার্গশীর্ষ ১৯, ১৮৮০ শকাব্দ, ডিসেম্বর ১০, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

"সুধর্মা"
১৬, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা—২৯

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিষয়				পৃষ্ঠা

চিত্রসূচী

এশিয়াটিক সোসাইটি

টাউন হল

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি

একটি বিষয়ে কলিকাতা সমগ্র প্রাচ্যের গৌরবস্থল। প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার জন্য এখানেই সর্বপ্রথম এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীনত্বের দিক দিয়া সমগ্র পৃথিবীতে ইহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই উদ্দেশ্যে প্রথম সভা স্থাপিত হয় ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে, নাম 'ব্যাটেভিয়ান সোসাইটি'। ফ্রান্সে, বৃটেনে এবং বৃটেনের সভার শাখাস্বরূপ বোম্বাই প্রদেশে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপিত হয় যথাক্রমে ১৮২২, ১৮২৩ ও ১৮২৯ সনে।

এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হইল ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী। ইঁহার স্থাপয়িতা স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রাচ্য-বিদ্যা সংস্কৃত ও আরবি-ফারসিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ১৭৮৩, অক্টোবর মাসে কলিকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হইয়া এদেশে আগমন করেন। তখন সুপ্রিম কোর্ট বর্তমান হাইকোর্টের পশ্চিম অংশ জুড়িয়া ছিল। এইখানে উক্ত ১৫ই জানুয়ারী দিবসে (১৭৮৪) জোন্সের আহ্বানে প্রাচ্য-বিদ্যায় অনুরাগী ত্রিশজন ইউ-রোপীয় সুপ্রিম কোর্টের 'গ্রাণ্ড জুরী রুমে' সম্মিলিত হন। জোন্স সভার উদ্দেশ্য বক্তৃতায় বিশদভাবে ব্যক্ত করিলে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল—নাম হইল 'এশিয়াটিক সোসাইটি'। এশিয়া খণ্ডের 'মানুষ এবং প্রকৃতি-সংক্রান্ত' যাবতীয় বিষয় অর্থাৎ ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা ও গবেষণা সভার উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

এই সময় হইতে বহু বৎসর ধরিয়া একই স্থানে সোসাইটির অধিবেশন হইতে লাগিল। জোন্স মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও এখানে সভার কার্য পরিচালিত হইতে থাকে বটে, কিন্তু এখানে সভা হইবার পক্ষে ক্রমশঃই নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আদালতের কার্য বাড়িয়া যাওয়ায় একদিকে যেমন সোসাইটির জন্য ঐ স্থান ছাড়িয়া দেওয়া কঠিন হইয়া উঠে, অন্য দিকে তেমনি সোসাইটির বই, পুঁথি, পুরাদ্রব্যসংগ্রহ এবং আপিসের কাগজপত্র রাখার মত জায়গারও অসংকুলান হইতে লাগিল। সেজন্য সোসাইটির একটি স্বতন্ত্র গৃহের কথা স্বতঃই সভ্যদের মনে উদয় হয়। ১৭৯৬, ১লা ডিসেম্বরের সভার কার্য বিবরণ হইতে জানা যায়, একটি স্থায়ী আবাসস্থলের জন্য সরকারে আবেদন করা হইয়াছিল। এতদিন সভ্যদের কোন চাঁদা ধার্য হয় নাই। এ সময় ত্রৈমাসিক চাঁদা স্থির হইল মাথা পিছু এক সুবর্ণ মোহর, আর ভর্তি-ফি দুই মোহর। গৃহ নির্মাণের জন্য এই অর্থ মজুত রাখার কথা হয়।

সরকারের নিকট প্রথম আবেদনে কোন ফল হয় নাই। সোসাইটি দ্বিতীয়বার আবেদন পাঠান ১৮০৪ সনের ৪ঠা জুলাই তারিখে। এবারকার আবেদনে স্পষ্টই বলা হইল যে, পার্ক ষ্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর সংযোগস্থলে যে সরকারী ভূমিখণ্ড আছে তাহাই যেন ইহাকে দেওয়া হয়। এই স্থানে পূর্বে একটি 'Riding School' বা অশ্বারোহণ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। ক্রমে স্থানটি সরকারের হাতে আসে। এবার সরকার আবেদন মঞ্জুর করিলেন (১৮০৫)। তবে পশ্চিম দিকের খানিকটা জায়গা এই বলিয়া তাঁহারা নিজ হেফাজতে রাখিয়া দিলেন যে, এখানে পুলিশের ফাঁড়ি ও দমকল থাকিবে। ১৮৪৯ সনে থানা উঠিয়া যায়। তখন এ জায়গাও সোসাইটিকে

দেওয়া হইল। প্রায় সাড়ে তিন বিঘা জমির মালিক হইলেন এশিয়াটিক সোসাইটি।

সরকার-প্রদত্ত ভূমির উপর গৃহ-নির্মাণের আয়োজন সত্বর সুরু হইল। ১৮০৫ সন নাগাদ সোসাইটির হস্তে আশানুরূপ অর্থ মজুত হইয়াছিল। ইঞ্জিনীয়ার ক্যাপ্টেন লক্ প্রথমে বাড়ীর নক্সা করিয়া দেন। সে সময় জীন জ্যাক পিসোঁ (Jean Jack Pichon) নামে এক খ্যাতনামা ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার কলিকাতায় গৃহ নির্মাণ ব্যবসায়ে রত ছিলেন। সোসাইটির গৃহ-নির্মাণের ভার অর্পিত হইল তাঁহার উপর। পূর্বোক্ত নক্সার কিঞ্চিৎ অদল বদল করিয়া তিনি গৃহ তৈরী করিতে আরম্ভ করেন। ১৮০৮ সনে নির্মাণ কার্য শেষ হইল। সোসাইটি এই বৎসরই নূতন গৃহে প্রবেশ করেন। সোসাইটি-ভবন নির্মাণে খরচ পড়িয়াছিল ত্রিশ হাজার টাকা। কিছুকাল অন্তর বাড়ীর নানারূপ সংস্কার করিতে হইয়াছে। ১৮৩৯ সনে দশ হাজার টাকা ব্যয়ে দুই দিকে ঘর বাড়ানো হয়। সোসাইটি গৃহের নিম্নতলে নয়খানি প্রকোষ্ঠ, দ্বিতলে পাঁচ খানি, দ্বিতলের হল-ঘরটিও প্রশস্ত

এই ভবনটি ধীরে ধীরে প্রাচ্য-বিদ্যার আলোচনা ও গবেষণার কেন্দ্র হইয়া উঠিল। সোসাইটির পুঁথি ও পুস্তক এবং পুরাতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের যাবতীয় সংগ্রহ এখানে স্থানান্তরিত হইল। শেষোক্ত সংগ্রহ হইতে কিরূপে কলিকাতাস্থ 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম' বা যাদু-ঘরের উৎপত্তি হইল পরে তাহা বিশদভাব বলিব। সোসাইটি জ্ঞান এবং বিজ্ঞান দুইয়েরই আলোচনা-ক্ষেত্র। শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের অন্যতম পাদ্রী জন ম্যাক ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সোসাইটি গৃহে রসায়ন সম্বন্ধে দুই প্রস্থ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এখানকার ও শ্রীরামপুর কলেজের বক্তৃতাবলীকে ভিত্তি করিয়া "কিমিয়া বিদ্যার সার" নামে তিনি একখানি রসায়ন-পুস্তক প্রণয়ন করেন (১৮৩৪)। বাঙলা

ভাষায় এই প্রথম রসায়ন শাস্ত্রের বই। কলিকাতাস্থিত ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ ১৮২৩ সনের মার্চ মাসে 'ক্যালকাটা মেডিক্যাল এণ্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি' এই বাড়ীতেই প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবৎ এই সোসাইটি এখানেই অধিষ্ঠিত থাকিয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

প্রতিষ্ঠাবধি এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যগণ প্রাচ্য-বিদ্যা—ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও পুরাতত্ত্বের আলোচনায় লিপ্ত হন। এ সকল প্রকাশের উপায়স্বরূপ তাঁহারা 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' নামক একখানি সাময়িক পুস্তক ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৮৩৯ সনে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এই সামাজিক পুস্তকের কুড়ি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। হিন্দু দেব, দেবী, পুরাণ, জ্যোতি-বিদ্যা, পুরাতত্ত্ব, ভারতীয় কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ইহাতে স্থানলাভ করে। সোসাইটির প্রথম দিককার সদস্যদের মধ্যেও বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। জোন্স ব্যতীত চার্লস উইলকিন্স, নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড, হেনরি টমাস কোলব্রুক, জন হার্বার্ট হ্যারিংটন, উইলিয়ম কেরী প্রমুখ পণ্ডিতগণের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এশিয়াটিক সোসাইটি যে ক্রমে বিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্রেও পরিণত হয়, একটু পূর্বে তাহার আভাস আমরা পাইয়াছি। পূর্বোক্ত 'ক্যালকাটা মেডিক্যাল এণ্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি'র মুখপত্রস্বরূপ একখানি 'জার্নাল' বা সাময়িক পুস্তকও বাহির হইত। ইহার প্রকাশ বন্ধ হইলে, জরীপ বিভাগের ক্যাপ্টেন জেমস ডি. হার্বার্ট ১৮২৯ সনে 'গ্লীনিংস ইন সায়ান্স' নামে একখানি বিজ্ঞান-বিষয়ক মাসিকপত্র বাহির করেন। কিন্তু পর বৎসরেই তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে হয়। এই পত্রিকা-খানির পরিচালনা ও সম্পাদনা ভার তখন রসায়নশাস্ত্রে সুপণ্ডিত

পুরাতত্ত্ববিশারদ জেমস প্রিন্সেপ গ্রহণ করিলেন। তিনি ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া ১৮৩২ সনের মার্চ মাস হইতে নাম রাখিলেন 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'। এশিয়াটিক সোসাইটির আনুকূল্যে এখানি প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৩৯ সনে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' বন্ধ হইয়া গেলে এই পত্রিকাখানি সোসাইটির মুখপত্ররূপে গণ্য হইল। ইহা প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্বও সোসাইটি গ্রহণ করিলেন।

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি ব্যতীত ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ও প্রাচীন লিপিসমূহের আলোচনাও প্রিন্সেপ এই পত্রিকাখানিতে বিশেষভাবে করিতে থাকেন। কিন্তু আর একটি কারণেও ইহার গুরুত্ব অত্যধিক। বিভিন্ন দেশের এমন কি ব্রিটেনের এশিয়াটিক সোসাইটি অপেক্ষাও কলিকাতার সোসাইটি প্রাচীনতম। ব্রিটেনের এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত (১৮২৩) হইবার পর ইহার কর্তৃপক্ষ তখন কলিকাতার সোসাইটিকে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' নামে অভিহিত করিতে অনুরোধ জানান। তাঁহারা নিজেদের সোসাইটির নাম দিয়াছিলেন—'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড আয়ার্লণ্ড'। কলিকাতাস্থ সোসাইটি কিন্তু তখন্ নাম পরিবর্তন করিতে সম্মত হন নাই। ইহার পরেও মাঝে মাঝে তাঁহাদের নিকট হইতে এরূপ অনুরোধ আসিয়াছিল। ইতিমধ্যে প্রিন্সেপের 'জার্নাল' কিন্তু উক্ত নামে বাহির হইতে থাকে। এখানি প্রথমে সোসাইটির আনুগত্যে এবং পরে পুরাপুরি সোসাইটির দায়িত্বে প্রকাশিত হওয়ায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি' ক্রমশঃ সাধারণের নিকট 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' নামে পরিচিত হয়। সোসাইটি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে অগত্যা এই নামই গ্রহণ করিলেন। এইরূপে 'পত্রিকা'র নামানুসারে ইহার নাম পরিবর্তন করিতে হইল। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। পরে এই নামের আগে 'রয়্যাল' কথাটি যুক্ত করা হইয়াছিল।

এখন সোসাইটির সংগ্রহের কথা বলিব। সংগ্রহ প্রধানতঃ দুই প্রকারের—(১) পুস্তক ও পুঁথি এবং (২) পুরাতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নিদর্শনসমূহ। প্রথমটি সম্বন্ধে আগে বলি। পুস্তক সংখ্যার বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র আবাসস্থলের প্রয়োজনের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সোসাইটির সভ্যগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিবিধ বিদ্যার ও ভাষার নানাপ্রকার হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিতে থাকেন। মুদ্রিত পুস্তকের সংগ্রহও অনেকে এখানে দান করিলেন। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, হিন্দুস্থানি, নেপালি এবং ভারতের বাহির হইতে তিব্বতী, চীনা, বর্মী ভাষায় লিখিত নানারকমের চিত্র-বিচিত্র পুঁথিপত্রও সংগৃহীত হইল। টিপু সুলতানের পতনের পর ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তম হইতে তাঁহার আরবি ফারসি পুঁথি সম্বলিত অমূল্য গ্রন্থাগারটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে আনীত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পরে ইহা এশিয়াটিক সোসাইটিকে অর্পণ করেন। এই কলেজ উঠিয়া গেলে(১৮৫৪)ইহার গ্রন্থাগারটির অধিকাংশ পুস্তকও এখানে প্রদত্ত হয়। সরকার-পোষিত শিক্ষা-সমাজ ১৮৩৫ সনে সংস্কৃত ও আরবি-ফারসি পুস্তক প্রকাশ বন্ধ করিলে, এই সকল ভাষার বহু পুস্তকও সোসাইটির হাতে আসে। এইসব ভাষায় মূল্যবান পুস্তকসমূহ প্রকাশ করিতে সোসাইটি মনস্থ করিলেন। বিলাতস্থ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর-সভা এই উদ্দেশ্যে সোসাইটিকে মাসিক পাঁচশত টাকা সাহায্যদানে স্বীকৃত হন (১৮৩৮)। এই মাসিক সাহায্য বাড়িয়া ১৮৫৮ সন নাগাদ সাড়ে সাত শত টাকায় দাঁড়ায়। এই অর্থ দ্বারা সোসাইটিতে সংগৃহীত বহু মূল্যবান ও তথ্যপূর্ণ সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, পালি ও হিন্দী পুঁথি ক্রমশঃ মুদ্রিত হয়, কতকগুলির অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থমালার নাম দেওয়া হইয়াছে "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা"। প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি-দের দ্বারা এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত পুস্তকগুলি সম্পাদিত হইয়াছে।

সরকার ১৮৭০ সনে সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ, নকল ও শ্রেণীবিভাগের জন্য সোসাইটিকে আলাদা করিয়া বাৎসরিক বত্রিশ শত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। এই কার্যে দুইজন বাঙালী পণ্ডিতাগ্রগণ্য পর পর নিয়োজিত হন। প্রথমজনের নাম ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি বহু পুঁথির সংক্ষিপ্ত সার শ্রেণীবিভাগ করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত করেন। তাঁহারই নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত পরবর্তীকালের মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার মৃত্যুর পর (১৮৯১) এই কার্যে নিযুক্ত হন। তিনি উত্তর ভারতের বহু অঞ্চল পুঁথিসংগ্রহ ব্যপদেশে পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার সম্পাদনায় বহু খণ্ড পুঁথির বিবরণ সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পুঁথি সংগ্রহকল্পে তিনি নেপালে গিয়া বৌদ্ধ গান ও 'দোঁহা' নামীয় পুঁথির সন্ধান পান। ইহা হাজার বৎসর পূর্বেকার বাঙলা ভাষার একখানি আদি গ্রন্থ। তাঁহার এই আবিষ্কার বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। পুঁথিখানির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় এখানি প্রকাশিত করেন। সোসাইটিতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় হস্তলিখিত পুঁথির প্রাচীন লিপি দৃষ্টে এদেশের বিভিন্ন ধরনের অক্ষরমালার উৎপত্তি সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান বাড়িয়া গিয়াছে।

এইবার দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে বলিতেছি। এ সংগ্রহকে আমরা আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। একটি হইল পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক, অন্যটি বিজ্ঞান-বিষয়ক। পুরাতত্ত্ব বলিতে ভারতে প্রাচীন মুদ্রা, মূর্তি, চিত্র, অনুশাসন, বিভিন্ন অক্ষরের খোদিত লিপি, মুদ্রার উপরে রাজারাজড়ার পরিচয়-কাহিনী ইত্যাদি আমরা বুঝিয়া থাকি। এই সকল লিপির মর্মার্থ উদ্ধার করিতে নানা সময়ে বহু পণ্ডিত নিয়োজিত হইয়াছেন। পুরাতন লিপিপাঠও একটি বিশেষ বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে। ইংরেজীতে ইহাকে বলে "Paeleography"। এই

বিদ্যার পথপ্রদর্শক জেম্‌স প্রিন্সেপ। তিনি পণ্ডিত কমলাকান্ত শর্মার সহায়তায় সর্বপ্রথম প্রাচীন লিপিসমূহের মর্মোদ্ঘাটনে সমর্থ হন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মালমশলা এইসকল পুরাদ্রব্য ও লিপির মধ্যে নিহিত ছিল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যথাযথভাবে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস রচনা সম্ভব হইয়াছে এই সমুদয় সংগ্রহ হইতে। আর এ বিষয়ের কৃতিত্বের মূলে রহিয়াছেন কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের নানা উপকরণ ক্রমশঃ সংগৃহীত হইতে থাকে। সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য যে প্রাচ্যের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের অনুসন্ধান ও গবেষণা তাহা আমরা জানিয়াছি। ইহার মুখপত্র 'জার্ন্যাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এর মূল দুইটি ভাগের একটিতে থাকিত বিজ্ঞানবিষয়ের আলোচনা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদতত্ত্বের নিদর্শন এবং প্রাচীন যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সভ্যগণ সংগ্রহ করিয়া এখানে পাঠাইতেন। পুরাদ্রব্যাদির ন্যায় এ সকলেও সোসাইটিভবন ক্রমশঃ পূর্ণ হইতে লাগিল। এ সব জিনিস দিয়া সোসাইটির একটি 'মিউজিয়ম' বা যাদুঘর গঠনের কথা প্রথম মাথায় আসে সে যুগের বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানী ডেনিশ জাতীয় ডক্টর নাথানিয়েল ওয়ালিশের। তিনি এই উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনাও রচনা করেন। সোসাইটি তাঁহার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া পুরাদ্রব্য ও বিজ্ঞানের নিদর্শনসমূহ এবং যন্ত্রপাতী লইয়া একটি মিউজিয়ম গঠন করিলেন। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের আলোচনা-গবেষণায় সোসাইটি সর্বপ্রথম উৎসাহ প্রদান করেন। বর্তমানকালে ইণ্ডিয়ান সায়ান্স কংগ্রেসের সর্বপ্রথম আয়োজন ও অধিবেশন হয় কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিরই আনুকূল্যে ও অনুপ্রাণনায়। সোসাইটিভবনে ইহার আপিসও রহিয়াছে।

ক্রমে উভয়বিধ সংগ্রহ এত বাড়িয়া গেল যে, সোসাইটিতে স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব হইল। সোসাইটির কর্তৃপক্ষ ১৮৬৫ সনে মিউজিয়মটি সরকারের হস্তে দিবার প্রস্তাব করিলেন। তবে প্রস্তাবের সঙ্গে এই সর্ত জুড়িয়া দিলেন যে, মিউজিয়মের জন্য আলাদা গৃহ নির্মিত হইলে তাহাতে সোসাইটিকেও স্থান করিয়া দিতে হইবে। সরকার এই সর্তে রাজি হইলেন এবং ১৮৬৬ সনের ১৭শ আইন বিধিবদ্ধ করিয়া মিউজিয়ম স্থাপনের উদ্যোগ করিলেন। ইহাই 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম' নামে পরিচিত। জনৈক লেখক সত্যই বলিয়াছেন যে, এশিয়াটিক সোসাইটিই বর্তমান মিউজিয়মের জনক। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের বাড়ীতে সোসাইটির আর যাওয়া আবশ্যক হয় নাই। সোসাইটিভবন জোন্স, কোলব্রুক, উইলসন, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদগণের চিত্র ও আবক্ষ মূর্তিতে সুসজ্জিত হইয়াছে। অন্যান্য দৃশ্য-চিত্র ও মূর্তিও এখানে আছে। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত সোসাইটির নিষ্ঠাবান কর্মী-প্রধানের তৈলচিত্র বা আবক্ষ-মূর্তি এখানকার চিত্র-সজ্জার মধ্যে স্থান পাইলে বড়ই ভাল হয়।

বস্তুতঃ আধুনিক যুগের ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির স্থান সুনির্দিষ্ট।

ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন

আমরা সাধারণতঃ যাহাকে বোটানিক্যাল গার্ডেন বলিয়া থাকি, তাহার প্রকৃত নাম বর্তমানে ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন। গত ১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী 'সাধারণতন্ত্র দিবসে' ইহা এই নাম ধারণ করিয়াছে। পূর্বে ইহার নাম ছিল রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসন-ভার গ্রহণের পর হইতেই ইহার এইরূপ নাম হইয়া থাকিবে। দীর্ঘকাল যাবৎ কিন্তু সাধারণের মুখে এবং কাগজ-পত্রে ইহার নাম ছিল 'কোম্পানির বাগান'।

'কৃষি-সমাজ' নিবন্ধে এই 'বাগান'টির কথাও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিব। বোটানিক গার্ডেন বহু পুরাণো, ইহার ইতিহাসও বিচিত্র। কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর পরে ইহা স্থাপিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাকাল জুলাই, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু এই সময়ের প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব হইতেই এ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়। বোটানিক গার্ডেনের কথা সর্বপ্রথম মাথায় আসে রবার্ট কীড নামক একজন সেনানীর। তিনি কোম্পানির পদাতিক বিভাগে লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল হইয়াছিলেন।

স্থানীয় সরকার এবং রবার্ট কীডের মধ্যে লিখিত পত্র কিছুকাল পূর্বে বাঙ্গলার লাট কেসী সাহেব এশিয়াটিক সোসাইটীকে অর্পণ করেন। বোটানিক গার্ডেনের অধ্যক্ষ ডাঃ কালীপদ বিশ্বাসের সম্পাদনায় এই পত্রগুলির পরিচয় সোসাইটীর একখানি পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীর প্রথমখানি হইতে

জানা যায় কীড সাহেব বাঙ্গলার খাদ্যাভাব মিটাইবার জন্য মালয় উপদ্বীপ হইতে সাগুর বীজ বা চারাগাছ আনাইয়া এখানে প্রতি গ্রামে চাষ-আবাদের পরামর্শ দেন। বর্তমান খাদ্যাভাবের দিনে এ পরামর্শ গ্রহণযোগ্য নহে কি ? কীড এ পত্রখানি, কলিকাতাস্থ কোম্পানির কর্তৃপক্ষ বোর্ডকে লেখেন ১৭৮৬, ১৫ই এপ্রিল তারিখে।

কীড দ্বিতীয় পত্রে (১লা জুন, ১৭৮৬) একটি সম্পূর্ণ নূতন প্রস্তাব করিলেন। তিনি এই মর্মে লিখিলেন, 'ভারতবর্ষের বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলসমূহে অনুসন্ধান করিলে এমন সব গাছপালা, লতা-গুল্মের সন্ধান পাওয়া যাইবে, যাহার জন্য আমরা অহরহ বিদেশীর শরণাপন্ন হই। ওলন্দাজদের অধীন সিংহলে দারুচিনি গাছ জন্মে। দশ বৎসর পূর্বে আমি যখন আসামের তেজগাঁও যাই, তখন সেখানে এমন গাছের সন্ধান পাই, যাহার বাকল ঠিক সিংহলের দারুচিনির মতই স্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত। অনুসন্ধান করিলে এদেশেই এইরূপ বহু বস্তুর খোঁজ পাওয়া যাইবে, যাহার চাষাবাদ ও ব্যবসা দ্বারা গ্রেট বৃটেনের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের অধিবাসীরাও উপকৃত হইবে।' এইরূপ ভূমিকা করিয়া শেষে কীড সাহেব একটি পরীক্ষামূলক বাগান স্থাপনের পরামর্শ দেন। তাঁহার কথায়—"But I take this opportunity of suggesting to the Board the propriety of establishing a Botanical Garden not for the purpose of collecting rare plants (although they have their use) as things of mere curiosity or furnishing articles for the gratification of Luxury, but for establishing a stock for the disseminating such articles as may prove beneficial to the inhabitants, as well as the natives of Great Britain and ultimately may tend to the extension of national Commerce and Riches; and this I conceive

can best be effected by Government procuring from the different parts of India and establishing a Nursery Stock from which private individuals may be supplied gratis, who may think themselves qualified to adventure on a general cultivation of the innumerable articles which our possessions will furnish the means of raising with success............" (Royal Asiatic Society of Bengal. Monograph Series. Vol. IX. P.8).

প্রস্তাবিত বাগানে পরীক্ষামুলকভাবে কি কি জিনিসের চাষাবাদ চলিতে পারিবে, কীড তাহারও একটি ফিরিস্তি দেন এইপত্রে। তিনি বলেন, ঢাকাই তুলা, নীল, চেরা, তামাক, চন্দন, লাক্ষা, সেগুন গাছ, লঙ্কা, দারুচিনি, এলাচ, চা, পেঁপে প্রভৃতির বিস্তর গাছপালা এখানে উৎপন্ন হইবে।

তখন ওয়ারেন হেষ্টিংস বিলাতে চলিয়া গিয়াছেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশেরও আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব ছিল। এই সময় অস্থায়ী বড়লাট পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন জন ম্যাকফার্সন। তিনি কীডের প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন। স্থানীয় বোর্ডও তাঁহার সঙ্গে একমত হইলেন। বিলাতে ডিরেক্টর-সভার নিকট কীডের প্রস্তাব এবং তাঁহাদের সম্মতির বিষয় জ্ঞাপন করা হইল। সভা লণ্ডনের সরকারী বোটানিক বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কসের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। ব্যাঙ্কস এরূপ সাধু প্রস্তাব গ্রহণের সপক্ষে মত দিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, কলিকাতায় এরূপ একটি গার্ডেন বা বাগান স্থাপিত হইলে উভয় দেশের গাছ-গাছড়া-বিনিময় দ্বারা উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের পরিপুষ্টি সাধন সম্ভবপর হইবে।

ডিরেক্টর-সভার সম্মতিসূচক পত্র লণ্ডন হইতে প্রেরিত হয় ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে। স্থানীয় সরকার কিন্তু

তাঁহাদের অনুমতি সাপেক্ষে কীডের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ইহার পূর্বেই গঙ্গাতীরে বর্তমান বোটানিক গার্ডেনস্থ ভূমি আয়ত্ত করিতে লাগিয়া যান। তাঁহারা অধিবাসীদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু কিছু অর্থ দিয়া বিস্তর জমি হস্তগত করেন। বলা বাহুল্য কীডের পরামর্শ মতই এরূপ করা হয়। কীড সাহেব এই বাগানের প্রথম অধ্যক্ষ বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন (১৮ই মে, ১৭৮৭)। ভূমি পরিষ্কার করিয়া বাগানের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে আরও কিছু সময় লাগিল। বর্ধমানের মহারাজার নিকট হইতেও কিছু জমি ক্রয় করা হইল। জমির মোট পরিমাণ হইল তিনশত একরের কিছু উপর। বর্তমানে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে দুইশত তেহাত্তর একর।

রবার্ট কীড অবৈতনিক অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৭৯৩ সনের ২৬শে মে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি কোন বিদ্যালয়ে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব আলোচনার সুযোগ পান নাই। মাত্র স্বাভাবিক উদ্ভিদ্-প্রীতিবশতঃই যে তিনি বোটানিক গার্ডেনের প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাও উপরের উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যায় না। তথাপি তিনি এই গার্ডেনের প্রতিষ্ঠা দ্বারা উদ্ভিদ্-বিদ্যার অনুশীলনের যে উপায় করিয়া যান, সেজন্য তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে বিজ্ঞানীরা এই ক্ষেত্রটিকে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা ও আলোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। শুধু ভারতবর্ষের কেন, সমগ্র জগতের উদ্ভিদ্-বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনে ইহার দান অফুরন্ত ; এদিক দিয়া ইহা সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া সর্বত্র গণ্য হইয়া আসিতেছে।

কীডের মৃত্যুর পরে, ১৭৯৩ সনের নবেম্বর মাসে বোটানিক গার্ডেনের অধ্যক্ষ হইয়া আসেন ডাঃ উইলিয়াম রক্সবার্গ। তিনিই এই পদে প্রথম বেতনভোগী কর্মচারী। রক্সবার্গ আসলে কিন্তু

চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন এবং কোম্পানির চিকিৎসক হিসাবে মাদ্রাজে স্থিত হন। কিন্তু উদ্ভিদ্‌-বিদ্যার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ হেতু ইহার চর্চায়ই তিনি অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। ১৭৮১-৯৩ সন পর্যন্ত মাদ্রাজের কোকনদস্থ বোটানিক গার্ডেনের তত্ত্বাবধায়কের কার্যে লিপ্ত থাকিবার পর ১৭৯৩ সনে কলিকাতায় আসিয়া উক্ত পদ গ্রহণ করেন। তিনি বাগানের মধ্যেই ১৭৯৫ সনে গৃহ নির্মাণ করাইয়া সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এই গৃহ অধ্যক্ষের বাসস্থানরূপে এখনও ব্যবহৃত হইতেছে। তিনি ১৮১৫ সন পর্যন্ত অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই বৎসরে পাদ্রী উইলিয়াম কেরী তাঁহার স্থলে কিছুকাল অস্থায়ী অধ্যক্ষের কাজ করেন।

রক্সবার্গের সঙ্গে কেরীর কিরূপ গভীর প্রীতির সম্বন্ধ ছিল, আমরা পরে তাহা কিছু কিছু জানিতে পারিব। 'হর্টাস বেঙ্গলেন্সিস' এবং 'ফ্লোরা ইণ্ডিকা' পুস্তক দুইখানি উদ্ভিদ্‌-বিদ্যায় রক্সবার্গের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। তাঁহার মৃত্যুর বহু বৎসর পরে কেরী শ্রীরাম-পুর হইতে এই পুস্তক দুইখানি প্রকাশিত করেন। কেরীর নামে তিনি এক বিশেষ শ্রেণীর শালবৃক্ষের নাম রাখিয়াছিলেন 'কেরিয়া শালিয়া'। রক্সবার্গ বাঙালী শিল্পীদের দ্বারা ২,৫৮২টি তরু-গুল্মের রঙীন চিত্র, পঁয়ত্রিশ খণ্ড ফলিওতে আঁকাইয়াছিলেন। যেটির যেরূপ স্বাভাবিক রং তাহাতেই এগুলি আঁকা। দেখিলে চোখ জুড়ায়। আমিও এগুলি দেখিয়া কম বিস্মিত হই নাই। এই চিত্র-পুস্তকগুলি বোটানিক গার্ডেনের গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে। এগুলি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। উদ্ভিদ্‌-বিদ্যাবিষয়ক তাঁহার অন্যান্য পুস্তকও বিজ্ঞান-জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া-ছিল। তাঁহার সময়ে রোপিত বট বৃক্ষটি সেদিন পর্যন্তও বোটানিক গার্ডেনের একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল। দেশ-বিদেশে তিনি অপরিসীম খ্যাতি অর্জন করেন। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য

পদেও তিনি বৃত হন। 'ফাদার অব ইণ্ডিয়ান বোটানি' বা 'ভারতীয় উদ্ভিদ্-বিদ্যার জনক'রূপে রক্সবার্গ আজ সর্বত্র পরিচিত।

তাঁহার পরে বোটানিক গার্ডেনের উল্লেখযোগ্য অধ্যক্ষের নাম ডাঃ নাথানিয়েল ওয়ালিচ। তিনি প্রথমে অস্থায়ীভাবে কার্য করিয়া ১৮১৭ সনে অধ্যক্ষ পদে স্থায়ী হন। এই পদে ১৮৪৫ সন পর্যন্ত কার্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবন সম্বন্ধে আলোচনার এখানে অবকাশ নাই। তিনিও প্রথমে চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু ক্রমে উদ্ভিদ্-বিদ্যার আলোচনায় লিপ্ত হন। তাঁহার অধ্যক্ষতা-কালে এক দিকে বোটানিক গার্ডেনের যেমন উন্নতি হয়, অন্য দিকে উদ্ভিদ্ তত্ত্বের আলোচনায় ভারতবর্ষের অবদান সর্বত্র স্বীকৃত হইতে থাকে। তিনি 'প্ল্যাণ্ট এশিয়াটিক রেরিওরেস' নামক তিনখণ্ড পুস্তকে এশিয়ার দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়ার পরিচয় প্রদান করেন। তিনিও লণ্ডনস্থ রয়্যাল সোসাইটির সভ্য পদে বৃত হইয়াছিলেন। কলিকাতা মেডি-ক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ওয়ালিচ উদ্ভিদ্-বিদ্যার অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। আসামের চা আবিষ্কার তাঁহার অন্যতম প্রধান কীর্তি। এই বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন উইলিয়ম গ্রিফিথ ও ম্যাক-ক্লেল্যাণ্ড। ইঁহারাও উদ্ভিদ্-বিদ্যায় পারঙ্গম ছিলেন। গ্রিফিথ কিছুকাল বোটানিক গার্ডেনের অস্থায়ী অধ্যক্ষের পদেও কার্য করেন।

ওয়ালিচের পরে বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ হিউ ফকনার, এম ডি, এফ আর এস, বোটানিক গার্ডেনের অধ্যক্ষ-পদ লাভ করেন। তাঁহার কার্যকাল ১৮৪৫-৫৫। ফকনারের পরবর্তী অধ্যক্ষের নাম ডাঃ টমাস টমসন। তিনিও সেযুগের একজন কৃতী বিজ্ঞানী। তিনি ১৮৫৯-৬০ সনে কৃষি-সমাজের সভাপতি হন। তিনি বিখ্যাত উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী স্যার জোসেফ হুকারের সহযোগে 'ফ্লোরা ইণ্ডিকা' নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। টমসনের পরে অধ্যক্ষ হইয়া

আসেন ডাঃ টমাস এণ্ডারসন (১৮৬১-৭০)। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষে সিনকোনা চাষ প্রবর্তিত হয়। সিকিম অঞ্চলে ইহার চাষ সম্ভব কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি ১৮৭০ সনে তথায় যান। এইখানে থাকিতেই তিনি একটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং তাহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হয়। বোটানিক গার্ডেনের অধ্যক্ষ ব্যতীত মেডিক্যাল কলেজেও তিনি অধ্যাপকের কার্য করেন। সরকার কর্তৃক বঙ্গের বনবিভাগের কনজারভেটর এবং ভারতবর্ষে সিনকোনা চাষ প্রবর্তনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীও ছিলেন তিনি।

বোটানিক গার্ডেনের সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রদান এখানে সম্ভব নয়। তবে একথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, উদ্ভিদ্-বিদ্যার আলোচনা-গবেষণার ক্ষেত্ররূপে ইহা ভারতবর্ষে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। কৃষি-সমাজ প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল এখানে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। কতকগুলি বিষয়ে বোটানিক গার্ডেন পথ-প্রদর্শক হইয়াছে। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাঙ্গলারও একটি প্রকৃষ্ট প্রতীক এই বোটানিক গার্ডেন। ভারতবর্ষে সিনকোনা চাষ এইখানেই সুরু হয়। সিনকোনা ব্যতীত অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় গাছগাছড়া, যেমন, পাট, চা, আলু, কফি, বিভিন্ন মশলা, ইক্ষু, শন, শিশল, তামাক, কোকো, রবার, নীল, বিবিধ পশুখাদ্য, তৃণ এবং এই প্রকার বহু জিনিসের চাষ-আবাদ এখান হইতে সর্বত্র চালু হয়। নৈসর্গিক বিপৎপাতেও গার্ডেন মাঝে মাঝে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ১৮৬৪ এবং ১৮৬৭ সনের ঝড়ে ইহার বিস্তর বৃক্ষরাজি সমূলে উৎপাটিত হয়।

বোটানিক গার্ডেনের অন্যতম অধ্যক্ষ স্যার জর্জ কিঙের আমলে (১৮৭১—৯৭) বোটানিক গার্ডেনের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। কিঙের সময়ে বোটানিক গার্ডেনের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়। তিনি ভিতরকার জমি সমান করাইয়া বিভিন্ন দিকে কতকগুলি রাস্তা নির্মাণ

করান। পার্শ্বে সারিবদ্ধভাবে গাছের চারা রোপিত হয়। কৃত্রিম হ্রদ-গুলি পরস্পরের সঙ্গে নল দ্বারা যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। শুকনো গাছপালার নিদর্শনমূলক অমূল্য সংগ্রহটির জন্য কিঙের তত্ত্বাবধানে একটি সুদৃশ্য ভবনও নির্মিত হইয়াছিল। তিনি আরও নানাভাবে বোটানিক গার্ডেনের উন্নতি করিতে প্রয়াস পান।

১৮৭৮ সনে ছোটলাট স্যার এশলি ইডেনের সহায়তায় ইহার একটি শাখা দার্জিলিঙে প্রতিষ্ঠিত হয়। পার্বত্য অঞ্চলের তরুলতা এখানে সংরক্ষিত হইতেছে।

কিঙ ভারতীয় উদ্ভিদতত্ত্বের গবেষণায় আত্মনিয়োগ কারয়া ছিলেন—"Annals of the royal Botanic Graden, Calcutta" শীর্ষক একখানি সাময়িক পুস্তক তিনি প্রকাশিত করেন। এখানি উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ প্রশংসিত হয়। তিনি ১৮৯০ সনে 'বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া' নামক একটি বিভাগ স্থাপন করিতে ভারত সরকারকে অনুরোধ জানান। ইহার পর এই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহার প্রথম গ্রন্থ (record of the Botanical Survey of India) প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ সনে। বোটানিক গার্ডেনের 'হার্বোরিয়াম'টিতে সংরক্ষিত এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে সজ্জিত কাগজে আঁটা তরুলতার শুষ্ক নিদর্শনগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সময়ে বহু-বিখ্যাত বিজ্ঞানী ইহার কিউরেটর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরে বোটানিক গার্ডেনের অধ্যক্ষ পদও লাভ করিয়াছিলেন। এখানকার গ্রন্থাগার বিদগ্ধজনের অবশ্য দ্রষ্টব্য বিষয়। প্রতিষ্ঠা অবধি দেশ-বিদেশের তরুলতা ও উদ্ভিদ্-বিদ্যার পুস্তক সংগ্রহ এখানকার উল্লেখযোগ্য কার্য। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী ও উদ্ভিদ্-বিদ্যা শিক্ষার্থীর পক্ষে এ দুইটি অপরিহার্য। উদ্ভিদ্-বিদ্যার আলোচনা-গবেষণার পক্ষে ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন আজ শুধু ভারতবর্ষে কেন, সমগ্র জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

টাউন হল

কলিকাতার টাউন হল প্রায় দেড়শত বৎসরের একটি পুরাতন গৃহ। ইহার পরিচয় যুগে যুগে নানা পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। একটি দ্রষ্টব্য বস্তু হিসাবেও ইহা নবাগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ভবনটির ইতিহাস বড়ই বিচিত্র।

কলিকাতা-প্রবাসী ইংরেজদের একটি মিলন-কেন্দ্র ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ওল্ড্ কোর্ট হাউস। এই নামে এখনও যে রাস্তা আছে, তাহার উত্তর সীমায় লালদীঘির সন্নিকটে এই বাড়ীটি অবস্থিত ছিল। এখানে সেযুগের শ্বেতাঙ্গেরা মিলিত হইয়া চিত্ত-বিনোদন করিতেন। এই বাড়ীতে মেয়রস্ কোর্টও বসিত। কলিকাতাবাসী ইংরেজদের দেওয়ানী ফৌজদারী ও ধর্মবিষয়ক কলহের মীমাংসা হইত এই আদালতে। এই বাড়ীটি তৈরী হয় ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে, বহু বৎসর পরে, ১৭৯১ সালে ইহার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া ওঠে এবং পর বৎসর ইহা একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। প্রায় এই স্থলেই পরে সেণ্ট এণ্ড্রুজ্ চার্চ নির্মিত হইয়াছে।

ওল্ড্ কোর্ট হাউস প্রথম টাউন হল নামে অভিহিত ছিল। এই ভবনটি বিলুপ্ত হওয়ায় কর্মক্লান্ত লোকদের অবসর-যাপনের একটি কেন্দ্রের বিশেষ অভাব অনুভূত হইতে লাগিল। এ দিকে সাধারণের অর্থে লর্ড কর্ণওয়ালিশের একটি মূর্তি-নির্মাণের প্রস্তাব হয় ৫ই নবেম্বর ১৭৯৩ তারিখে। কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলীরও একটি মূর্তি-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু উন্মুক্ত স্থানে রাখিলে জল ও রৌদ্রে এগুলির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। তাঁহারা যখন এমন একটি ভবনের অভাব বিশেষরূপে অনুভব

করিতেছিলেন, যেখানে এই সকল মূর্তি রাখা যায়, আবার অবসর-বিনোদনের জন্য সাধারণে মিলিতও হইতে পারে তখন এইরূপ মনোভাব হইতেই বর্তমান টাউন হলের উৎপত্তি।

কলিকাতার ইউরোপীয় অধিবাসীরা ঐ প্রকার উদ্দেশ্য লইয়াই ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী একটি সভায় মিলিত হন এবং স্থির করেন যে, এখানে একটি টাউন হল নির্মাণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার অর্থ পাওয়া যাইবে কিরূপে? আজকাল 'লটারী' কথাটির সঙ্গে কম-বেশী প্রায় সকলেই পরিচিত। পরে সরকারীভাবে ইহা পরিচালনা করা রীতিবিরুদ্ধ হয়। কিন্তু সেকালে দেড় শত কি শোয়া শত বৎসর আগে সরকারই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নানা হিতকর কাজে সাধারণকে লটারীর আশ্রয় লইতে উৎসাহিত করিতেন। কলিকাতার বহু রাস্তাঘাট, পার্ক-পুষ্করিণী সরকার-পোষিত এই লটারীর টাকায় হইয়াছে। লটারী-পরিচালনার জন্য লটারী কমিটি হইল। প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ (১৮০৬-১৮৩৬) এই কমিটিই উক্ত কার্যসমূহ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

টাউন হল নির্মাণের প্রস্তাব হইতেই প্রকৃতপক্ষে লটারী কমিটির সৃষ্টি। উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী টাউন হল নির্মাণের জন্য অনুষ্ঠিত সভায় একটি কমিটি গঠিত হইল। তখন ইহাও স্থির হইল যে, লটারী করিয়া যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহার দ্বারাই এই ভবন নির্মিত হইবে। কিন্তু ইহাতে সরকারের অনুমোদন আবশ্যক। কমিটি সরকারের অনুমোদন চাহিয়া পত্র লিখিলেন ১৮০৬ সালের ১৫ই জুলাই। টাউন হলের নিমিত্ত সরকারকে নিজে হইতে তো আর এক কপর্দকও ব্যয় করিতে হইবে না, তাই কমিটিকে লটারী করিয়া টাকা তুলিবার অনুমতি দিতে দ্বিরুক্তি করিলেন না। লটারীর উদ্বৃত্ত টাকা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা পড়িল। কমিটির সভ্যগণ এই টাকা দিয়া জমি কিনিতে উদ্যোগী হইলেন।

দুই খণ্ড জমিও তখন এ অঞ্চলে ক্রয়ের জন্য পাওয়া যায়,—লালদীঘির সমীপবর্তী 'ওল্ড কোর্ট হাউসের' সংলগ্ন একখণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড এসপ্লানেডের উপরে। কোন খণ্ড ক্রয় করা হইবে তাহা লইয়া কমিটিতে আলোচনা হয়। শেষে এ সম্পর্কে ভোট লওয়া হইল। দুইটি ভোটাধিক্যে স্থির হয় যে এসপ্লানেডের উপরিস্থিত ভূমিখণ্ডই ক্রয় করা হইবে। কমিটির অনুরোধে সরকার নিজ এটর্ণীর দ্বারা ভূমি-হস্তান্তর-কার্য সম্পন্ন করিলেন। বলা বাহুল্য, ভূমির মূল্য দিলেন লটারী কমিটি। টাউন হল এই ভূমির উপরই নির্মিত হয়। ইহার নক্সা করিয়া দেন কর্ণেল গ্যারিসন এবং ক্যাপ্টেন অব্রে। টাউন হল নির্মাণের ভার অর্পিত হয় ইঞ্জিনিয়ার গার্ষ্টিনের উপর। বর্তমান 'গার্ষ্টিন প্লেস' নামটি এই গার্ষ্টিনেরই স্মৃতি বহন করিতেছে।

টাউন হল নির্মাণে সাত বৎসরেরও অধিক সময় লাগিয়াছিল। লর্ড ওয়েলেসলীর আমলে ইহার পরিকল্পনা, আর লর্ড মিণ্টোর শাসনকালের শেষ বৎসর ১৮১৩ সালে সমাপ্তি। প্রায় সাত লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল এই ভবনটির নির্মাণকার্যে। ভবনটি 'ডোরিক' স্থাপত্য-রীতি-অনুসারে নির্মিত। উত্তরে ও দক্ষিণে প্রশস্ত দীর্ঘ সিঁড়ি। বাড়িটি দোতলা। দ্বিতলটি ত্রিশ ফুট উঁচু। উভয় তলেরই বড় হল ঘর ১৬২ ফুট দীর্ঘ ও ৬৫ ফুট প্রশস্ত। উত্তর দিকে সিঁড়ির দুই পার্শ্বে ২১×২০ ফুট এবং দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির দুই দিকে ৪৩×২১ ফুট আয়তনের দুইটি কক্ষ। পোর্টিকোর ঠিক নিম্নে মধ্যস্থলের প্রকোষ্ঠ ৮২ ফুট লম্বা ও ৩০ ফুট চওড়া। ইহা ছাড়া মিউজিক গ্যালারী ইত্যাদিও ছিল। হলঘরে অন্ততঃ হাজার লোকের উপবেশনের স্থান।

টাউন হল রক্ষণাবেক্ষণের ভারও প্রথমে লটারী কমিটির উপর ন্যস্ত ছিল। এই কমিটি সরকার-পোষিত, পূর্বেই বলিয়াছি। ১৮৬৩

সনে কমিটি উঠিয়া গেলে সরকার ইহার কার্য ভার গ্রহণ করেন। ১৮৬৪ সনে তাঁহারা যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামসহ টাউন হল বর্তমান কর্পোরেশনের পূর্বজ 'জষ্টিসেস্ অফ্ দি পীস্' (১৮৬৩—৭৬)-এর হস্তে দিয়াছিলেন। ১৮৬৭ সনের নবম আইনের বিংশতি উপবিধি দ্বারা এই হস্তান্তর ব্যাপারটিকে আইনসঙ্গত করা হয়। তদবধি কর্পোরেশনই ইহার মালিক। ইহার সংস্কার ও সাজ-সজ্জা ব্যাপারে বিস্তর অর্থও তাঁহারা ব্যয় করিয়াছেন। ১৯১১ সনে ইহাকে আবার সরকারের হাতে লওয়ার কথা হয়। কিন্তু রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় ইহা কিছু কালের জন্য কার্যে পরিণত হয় নাই।

টাউন হল প্রায় দেড়শত বৎসরের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রথমে এই ভবনটি অবসর বিনোদনের জন্য নির্মিত হইলেও, কলিকাতা তথা সারা বাঙ্গলার সংস্কৃতিমূলক বহু প্রচেষ্টার আদি স্থানরূপে ইহা পরিকীর্তিত হইবার যোগ্য। সরকারের অনুকূলে ও প্রতিকূলে বিভিন্ন জনসভারও অধিবেশন হয় এখানে। ১৮৩৩ সনের সনন্দের প্রতিবাদে এখানে দেশী-বিদেশী প্রধানদের নেতৃত্বে একটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। নব্যবঙ্গের অন্যতম নেতা রসিককৃষ্ণ মল্লিক এই সভায় যে বক্তৃতা দেন, তাহা জাতীয় ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আবার অস্থায়ী বড়লাট স্যার চার্লস থিওফিলাস মেটকাফের সংবাদ-পত্রকে শৃঙ্খলমুক্ত করার প্রস্তাবের সমর্থনেও এখানে বৃহৎ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা প্রদানহেতু মেটকাফের নাম স্মরণীয় করার জন্য যে মেটকাফ হল ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার আয়োজন কয়েক বৎসর ধরিয়া চলে, তাহারও সূচনা হয় এই টাউন-হলের সভায় (২০শে আগষ্ট, ১৮৩৫)। বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পূর্বজ কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীরও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় এই

হলটিতে (৩১শে আগষ্ট, ১৮৩৮)। চতুর্থ দশকেও এখানে দেশী-বিদেশীদের সম্মিলিত নানা সভা-সমিতির অধিবেশন হইল।

ইহার পরেই শ্বেতকায় ও অ-শ্বেতকায়দের মধ্যে জাতি-বৈরিতা প্রবল হইয়া উঠে। তাহারও সূচনা দেখি এই টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভায়। দেশী-বিদেশীদের মধ্যে বিচার-বৈষম্য দূর করার জন্য প্রথম চেষ্টা করেন প্রথম আইন সচিব মেকলে। দেওয়ানী মোকদ্দমায় ইংরেজ-ভারতবাসী নির্বিশেষে সকলের বিচারই মফঃস্বলের আদালতে হইতে পারিবে, এই মর্মে ১৮৩৬ সনে একটি আইন তিনি বিধিবদ্ধ করেন। তখন এদেশবাসী ইংরেজরা ইহার ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ করে, আর এই আইনটির নাম দেয় 'কালো আইন' (Black Act)! টাউন হলের সভায় তাহাদের এইরূপ বিরুদ্ধ মনোভাব প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ইহার তের বৎসর পরে বেথুন সাহেবও এই মর্মে কতকগুলি আইনের খসড়া প্রচার করায় উহারা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠে! তখন টাউন হলে তাহাদের সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৫৭ সনে পুনরায় বিচারে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার প্রয়াসী হন। তখন কিন্তু ভারতবাসীরাও কতকটা আত্মসচেতন হইয়াছে। টাউন হলে ঐ সনের প্রথমে ইউরোপীয়ান-দের সভা হইবার পর ভারতবাসীরা সরকারী প্রস্তাবের সমর্থনে এক বিরাট সভার আয়োজন করেন। মানবহিতৈষী জর্জ টমসন এই সময় পুনরায় ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। উক্ত জনসভায় উপস্থিত হইয়া ভারতীয়দের সমর্থনে তিনি এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। ইলবার্ট বিল আন্দোলনকালেও (১৮৮৩) ইউরোপীয়েরা টাউন হল ব্যবহারে ক্ষান্ত হয় নাই।

কিন্তু একদিকে যেমন জাতিবৈরিতার নগ্ন রূপ প্রকাশ পায় এখানে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতে আবার অন্যদিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে মৈত্রীর বাণীও বিঘোষিত হয় এখান হইতেই। ব্রহ্মানন্দ

কেশবচন্দ্র সেন গত শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে এই হলে কতক-গুলি বিখ্যাত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বড়লাট হইতে বহু পদস্থ ইংরেজ ও মান্যগণ্য বাঙালী এই সকল সভায় উপস্থিত থাকিতেন। সপ্তম দশকে (১১ই মাঘ) মাঘোৎসবের দিনে টাউন হলে ধর্ম ও মৈত্রীবিষয়ক বক্তৃতা প্রদান একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, এ সময়েও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য বিস্তর পদস্থ ইংরেজ ও ভারতবাসী সম্মিলিত হইতেন। সমাজোন্নতিবিষয়ক নানা বক্তৃতাও এখানকার সভাসমিতিতে প্রদত্ত হইত। টাউন হলে বাঙালীদের সামরিক শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন হিন্দু মেলার প্রধানতম উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বর্তমান কলিকাতা ইউনি-ভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের পূর্বগামী 'সোসাইটি ফর দি হায়ার ট্রেণিং অফ ইয়ং মেন' নামে বাঙ্গালার যুবসমাজের উচ্চ শিক্ষার সহায়তার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। যে সভায় ইহা স্থাপিত হয়, তাহার স্থানও এই টাউন হল (৩১শে আগষ্ট, ১৮৯১)। ঠিক ছাপ্পান্ন বৎসর পূর্বে এই তারিখে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীও যে এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেকথা আগেই বলিয়াছি। বর্তমান শতাব্দীতে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয় এই ভবনে। ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট তারিখে মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভাতেই 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক উত্থাপিত বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে বিলাতি-বর্জন প্রস্তাব বাঙালী জাতি এখানে গ্রহণ করিয়াছিল। স্বদেশী-যুগে জাতীয় শিক্ষার মুখ্য প্রতীক স্বরূপ বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয়। এইখানে একটি বিরাট সভা করিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। এমনকি, পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর

পূর্বেও এখানে সরকারের প্রতিকূলে বহু সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে।

এই দেড়শত বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে টাউন হলকে সরকারী প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। সুপ্রীম কোর্টের পুরাতন বাড়ী ভাঙ্গিয়া সেস্থানে ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি বাড়ীসমেত যখন বিরাট আকারে নূতন হাইকোর্ট ভবন নির্মিত হয় (মার্চ, ১৮৬৩—মে, ১৮৭২) সেই সময় টাউন হলের দ্বিতলে হাইকোর্ট বসিত। এইখানেই দক্ষিণ দিকের সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় বিচারপতি জন প্যাক্সটন নর্ম্যান জনৈক মুসলমান আততায়ীর হস্তে আহত হন (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭১) এবং এই দিনই ঐ আঘাতের ফলে মারা যান। কর্পোরেশনের কোন কোন আপিস—যেমন মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আপিস, এখানে দীর্ঘকাল ছিল। ডায়ার্কির আমলে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন, নূতন 'কাউন্সিল হাউস' নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত (১৯৩১), এখানে হইত। তদুপযোগী করিয়া তখন ইহার কিছু কিছু সংস্কারও সাধিত হয়। দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যে ১৯৪৩ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে সরকার কর্পোরেশনের নিকট হইতে ভাড়া লইয়া এখানে সাময়িকভাবে রেশন আপিস করিয়াছিলেন।

শিল্প-সজ্জায়ও টাউন হল বিশেষ সমৃদ্ধ। কলিকাতার বহু ইংরেজ বাঙালী প্রধানের চিত্র ও মূর্তিতে ইহার উভয় তল সজ্জিত করা হয়। এদেশীয়দের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল, আবদুল লতিফ, আমীর আলী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তৈলচিত্র; রাধাকান্ত দেব, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের আবক্ষ মূর্তি এবং মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের পূর্ণাবয়ব মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া বহু বিখ্যাত ইউরোপীয়ের চিত্র, আবক্ষ ও পূর্ণাবয়ব মূর্তিও এখানকার

শিল্প-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সকল চিত্রাদির সংস্কার সাধনেও কলিকাতা কর্পোরেশন সময়ে সময়ে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেন। টাউন হল রেশন আপিসে পরিণত হওয়ার পর এই সমস্তই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে স্থানলাভ করে।

পূর্বেই বলিয়াছি, কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র হিসাবে টাউন হলের নিজস্ব কোন কৃতিত্ব না থাকিলেও বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সূচনা এখানে হয়। আবার যে সকল কারণে বাঙালীদের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আত্মচেতনার উন্মেষ হয়, তাহার মূলও এখানকার সভা-সমিতির মধ্যে লক্ষ্য করি।

———

হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ

কলিকাতার গোলদীঘির উত্তর পার্শ্বে গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ অবস্থিত। এই বাড়ীটি কলিকাতায় নবাগত ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া যায় না। ইহা তৈয়ারি হয় কিছু-অধিক সোয়া শ' বৎসর আগে। তখন এদেশে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব। তাঁহারা নানা কারণে ইংরেজীর পরিবর্তে এদেশের প্রচলিত আরবি-ফারসি ও সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে আগ্রহশীল ছিলেন। কলিকাতায় উক্ত উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় বহু পূর্বে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে। ইহার চল্লিশ বৎসর পরে, ১৮২১ সনের ২১শে আগষ্ট সরকার কলিকাতায় সংস্কৃত শিক্ষার জন্য একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। ইহারও তিন বৎসর পরে তাঁহারা এজন্য একটি গৃহ নির্মাণে অগ্রসর হন। গৃহ নির্মাণ আরম্ভের পূর্বেই, ১৮২৪ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে বৌবাজারের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজের কার্য সুরু হইল।

ইহার সাত বৎসর আগে, ১৮১৭, ২০শে জানুয়ারী প্রধানতঃ ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। প্রথম দিকে ইহা একটি স্কুল মাত্র ছিল। তখনকার দিনে স্কুলকেও 'কলেজ' এই গালভরা নামে আখ্যাত করা হইত। ক্রমে ইহার দুইটি বিভাগ হয়—জুনিয়র ও সিনিয়র। প্রথম বিভাগটিকে স্কুল ও দ্বিতীয় বিভাগটিকে কলেজের পর্যায়ে ফেলা যায়। হিন্দু কলেজের আরো দুইটি নাম ছিল—এংলো-ইণ্ডিয়ান কলেজ ও মহাবিদ্যালয়। বস্তুতঃ গভর্ণমেণ্ট হিন্দু কলেজকে প্রায়ই এই দুইটি নামে অভিহিত

করিতেন। সংস্কৃত কলেজের নামই তাঁহারা দিয়াছিলেন 'হিন্দু কলেজ'! মূল হিন্দু কলেজকে তাঁহারা কখনও কখনও 'নেটিভ হিন্দু কলেজ' বলিতেন অবশ্য।

এই কলেজটির ইতিহাস বড়ই বিস্ময়কর। হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া এই বিদ্যায়তনটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার যাবতীয় ব্যয় তাঁহারাই বহন করিতেন। কোম্পানী প্রথম সাত বৎসরে ইহাকে একটি কাণাকড়ি দিয়াও সাহায্য করেন নাই। তবে ইহার প্রতিষ্ঠায় কোন কোন ইংরেজের বিশেষ সহায়তা ছিল। এই প্রসঙ্গে সকলের আগে নাম করিতে হয় প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ারের। তাঁহার পরেই উল্লেখযোগ্য সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এড্ওয়ার্ড হাইড্ ঈষ্ট। তাঁহার ভবনেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রথম ও দ্বিতীয় সভার অধিবেশন হয় যথাক্রমে ১৪ই মে ও ২১শে মে ১৮১৬ দিবসে। পরেও বহু বার এখানে অধিবেশন হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় ইংরেজী শিক্ষার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি তখন প্রচলিত হিন্দুয়ানীর বিরুদ্ধে বেদান্ত প্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদের প্রচারে লিপ্ত। রক্ষণশীল হিন্দুগণের আপত্তি থাকায় কলেজ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে অতঃপর তাঁহার সাহায্য আর লওয়া হয় নাই।

হিন্দু-প্রধানেরা নিজ ব্যয়ে একাদিক্রমে সাত বৎসর হিন্দু কলেজ পরিচালনা করিয়াছিলেন। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জে এইচ হেরিংটন বড়ই উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তিনি ১৮২১ সালে বিলাতে যান। সেখানকার বৃটিশ এণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটিকে বলিয়া-কহিয়া হিন্দু কলেজকে এক প্রস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দানে স্বীকৃত করান। এ সকল পাঠাইবার ব্যয় বহন করিতেও তাঁহারা রাজি হন। হেরিংটন কলেজের অধ্যক্ষ-সভাকে একথা জানাইলেন। তখন কলেজের

আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। সমুদয় যন্ত্রপাতি কোথায় রাখা যাইবে, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অধ্যাপকের বেতনই বা কিরূপে যোগান হইবে? কলেজের কর্তৃপক্ষ অগত্যা সরকারের দ্বারস্থ হইলেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন, সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ এক জায়গায় স্থিত হইলে উভয় কলেজের ছাত্রদের বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধা হয়।

সরকার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ একই স্থলে আনয়নের ইহাই সূচনা। সংস্কৃত কলেজের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৮২৩ সনের শেষ ভাগে গোলদীঘির উত্তর দিকে দুই বিঘা পরিমিত একখণ্ড ভূমি ইতিপূর্বেই ক্রয় করিয়াছিলেন। ভূমি-ক্রয় ও গৃহ-নির্মাণের জন্য সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় ধার্য হয়। কিন্তু হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষগণের উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সরকার উহার দুই পার্শ্বের জমিতে উহারই সংলগ্ন দুইটি গৃহ নির্মাণে কৃতসংকল্প হইলেন। দুই পার্শ্বের ভূমিখণ্ডের পরিমাণ ছিল তিন বিঘা সাত কাঠা এবং উভয়েরই মালিক ছিলেন স্বনামধন্য ডেভিড হেয়ার। তখন জমির দাম খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। যাহা হউক প্রতি কাঠা ৫০০্ টাকা হিসাবে ৩:,৫০০্ টাকায় উক্ত পরিমাণ জমি সরকার হিন্দু কলেজের জন্য হেয়ার সাহেবের নিকট হইতে কিনিয়া লন। দুই পার্শ্বের গৃহ নির্মাণের ব্যয় ধার্য হয় ১৫,৯৮৮্ টাকা। কাজেই মূল ও দুই পার্শ্বস্থিত গৃহের জন্য মোট ব্যয় নির্ণীত হইল ১১৯,৪৬১্ টাকা। সরকারী স্থপতি ক্যাপ্টেন বাক্সটনের নক্সা অনুসারে বার্ণ কোম্পানীর উপর এই গৃহ নির্মাণের ভার অর্পিত হয়। তাঁহারা বাইশ মাসের মধ্যে নির্মাণকার্য শেষ করিবেন বলিয়া কথা দেন।

হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে অস্বচ্ছলতা হেতু সরকারের নিকট অর্থ সাহায্যও চাহিয়াছিলেন। সাময়িকভাবে বৌবাজারে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সন্নিকটে একটি ভাড়াটিয়া

বাড়ীতে হিন্দু কলেজ উঠিয়া যায়। বাড়ী ভাড়া এবং প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-অধ্যাপকের ব্যয় দুই-ই সরকার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। ১৮২৪ সনের জানুয়ারী মাস হইতেই তাঁহারা ইহার বাড়ী ভাড়া বাবদে প্রতি মাসে দুইশত টাকা দিতে আরম্ভ করেন।

ভূমি-ক্রয়, নক্সা রচনা প্রভৃতি প্রারম্ভিক কার্যাদি সমাধা করিবার পর এই নূতন বাড়ীর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হইল পরবর্তী ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৮২৪ দিবসে। তখনকার দিনে ভিত্তি বা বাস্তু-প্রস্তর স্থাপন উৎসব সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইত। সংস্কৃত তথা হিন্দু কলেজের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনেও ইহা যথারীতি প্রতিপালিত হয়। এই দিন কি সমারোহ! সাহেবপাড়া হইতে নিজ বিচিত্র পোষাকে 'ফ্রিমেসন'গণ বাদ্যসহ মিছিল করিয়া যখন গোলদীঘির দিকে অগ্রসর হয় তখন কাতারে কাতারে রাস্তার দুইদিকে লোক দাঁড়াইয়াছিল। জনসাধারণ এই কার্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করে। কলিকাতার গণ্যমান্য দেশী-বিদেশী ব্যক্তিগণ এবং শিক্ষা-সমাজের সভাপতি ও সদস্যগণের সম্মুখে জন পাস্কাল লার্কিন্স কলেজ-গৃহের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিলেন।

গৃহ নির্মাণ শেষ হইতে দুই বৎসর দুই মাস সময় লাগিয়াছিল। ১৮২৬ সনের ১লা মে সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ নূতন গৃহের নিজ নিজ অংশে প্রবেশ করিল। এই গৃহটি কতকগুলি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হইয়াছিল তাহার একটি বিবরণ সে যুগের নথিপত্রে মিলিতেছে। গৃহের মূল অংশ অর্থাৎ মধ্যভাগ দ্বিতল করা হয়। নিম্নতল এবং দ্বিতলের মধ্যস্থলে ৫০ × ২৫ ফুট পরিমিত দুইটি হল-ঘর। উভয় তলেই উহার পার্শ্ববর্তী সাতটি করিয়া প্রকোষ্ঠ। মূলগৃহ-সংলগ্ন পূর্ব ও পশ্চিম দুই অংশই একতলা। প্রত্যেকটিতে ৬৪ × ২২ ফুট করিয়া দুইটি হল-ঘর এবং পাঁচটি মাঝারি রকমের কক্ষ। পূর্ব ও পশ্চিম অংশের একতলা গৃহে হিন্দু কলেজের

জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগ যথাক্রমে বসিত। মূলগৃহের দ্বিতলের হল-ঘরটি সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের সিনিয়র ছাত্রেরা একসঙ্গে বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য ব্যবহার করিতেন। দ্বিতীয় তলের অন্য তিনটি ঘরও হিন্দু কলেজের সিনিয়র ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ১৮৩৯-৪০ সনে পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের একতলা গৃহের প্রত্যেকটির সন্নিকটে একটি করিয়া নূতন ঘর নির্মিত হইল। তিনটি গৃহের প্রত্যেকটির জন্যই একটি করিয়া দ্বারবানের ঘরও এই সময়ে তৈরী হইয়াছিল। ১৮৪১ সনে সরকার সম্পূর্ণ বাড়িটির যথোচিত সংস্কার সাধন করেন।

পশ্চিম দিকের প্রশস্ত ঘর বা প্রকোষ্ঠটি বিশেষ কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই প্রকোষ্ঠটিতে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন সিনিয়র বিভাগের ছাত্রগণকে ইংরেজী সাহিত্য পড়াইতেন। দ্বিতলের নির্দিষ্ট কক্ষ তখন এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত না। এই প্রকোষ্ঠে বসিয়া রিচার্ডসনের নিকট পাঠ লইতেন স্বনামধন্য মনীষি রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কবিবর মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে এই প্রকোষ্ঠেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যুব-ইতালির স্বাধীনতা আন্দোলন, ম্যাটসিনী-গ্যারিবল্ডী-কাভুর প্রভৃতি বিষয়ক বক্তৃতা দ্বারা সে যুগের যুব-সমাজকে স্বদেশের মুক্তি-সাধনায় সবিশেষ অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘর এখন সরকার ভাঙ্গিয়া দিয়া ইহার উপরে এক বিরাট ইমারৎ তৈরী করিয়াছেন।

মুখ্যতঃ ইংরেজী শিক্ষা তথা পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের জন্য হিন্দু কলেজ এবং সংস্কৃত তথা প্রাচ্য বিদ্যা অনুশীলনার্থ সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথমটি বেসরকারী ও দ্বিতীয়টি সরকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু একই হাতার মধ্যে একই বাড়ির বিভিন্ন অংশে স্থিত হওয়ায় ক্রমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনের প্রতীক

হইয়া উঠিল এই দুইটি বিদ্যায়তন। আবার ক্রমশঃ হিন্দু কলেজের উপরও সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। শেষে দুইটিই সরকারী বিদ্যায়তনে পরিণত হয়। হিন্দু কলেজ কার্যতঃ ১৮৫৪ সনের ১৫ই জুন হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজ (সিনিয়র বিভাগ) ও হিন্দু স্কুল (জুনিয়র বিভাগ) রূপ লাভ করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চায় ভারতবাসী যে নবজীবন প্রাপ্ত হয় তাহার মূল আমরা এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দেখিতে পাই।

নব্যশিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে সংস্কৃতি ও রাজনীতিমূলক সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসাদিরও সূচনা হয়—এই কলেজগৃহকে কেন্দ্র করিয়া। একাডেমিক এসোসিয়েশন ও সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার অধিবেশনসমূহ এখানকার বিভিন্ন হল-ঘরে হইতে থাকে। ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, রিচার্ডসন ও বহু সরকারী বেসরকারী গণ্যমান্য লোক ইহাদের কোন কোনটির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া বা একান্তভাবে যোগদান করিয়া যুবকর্মীদের উৎসাহ দিতেন। আবার পরবর্তী যুগে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিও যুব-চিত্তকে স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের পূর্বজ 'সোসাইটি ফর দি হাইয়ার ট্রেণিং অফ্ ইয়ং মেন' প্রতিষ্ঠার (৩১শে আগষ্ট, ১৮৯১) কিছুকাল পরে ১৮৯৩ সনের প্রারম্ভ হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত হিন্দু স্কুলের পূর্বাংশের হল ঘরে উহার কার্যাদি চলিত।

এখানে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে আরও কিছু বলা আবশ্যক। নূতন গৃহে স্থানান্তরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে হেন্‌রি লুই ভিবিয়ান্ ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক হইয়া আসেন। অল্প বয়স্ক হইলেও তিনি ইংরেজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার শিক্ষার গুণে যুব ছাত্রদল সমাজ সেবায় ও দেশহিতে বিশেষ অনুপ্রাণিত হন। তাঁহারা পরবর্তী কালে

শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, শিল্প বাণিজ্য এবং সর্ববিধ সামাজিক সমুন্নতিকল্পে যত্নপর হইয়াছিলেন। এই ছাত্রদলের মধ্যে রাম-গোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ সিকদার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে যে নূতন ধারা প্রবর্তিত হয় তাহারও মূলে ছিলেন এই ডিরোজিও শিষ্যবর্গ।

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল যেমন প্রাচ্য বিদ্যার চর্চা, সংস্কৃত গ্রন্থাদি প্রকাশ, তদ্রূপ সংস্কৃতের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যারও পরিবেশন। সংস্কৃত কলেজের প্রথম দিকে এই সকল দিকেই কার্য সুরু হয়। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা, যেমন, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রেম-চাঁদ তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি এখানে ছাত্রদের অধ্যাপনা কার্যে লিপ্ত ছিলেন। বিভিন্ন কাব্য ও শাস্ত্র গ্রন্থ সুযোগ্য পণ্ডিতদের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই যুগের ছাত্ররাও সংস্কৃত বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া স্বদেশের বিভিন্ন উন্নতিকর্মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সাহিত্য সাধনায় এবং সমাজের বিবিধপ্রকার উন্নতিতে সবিশেষ তৎপর হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া ইহার দ্বার ভদ্র শ্রেণীর হিন্দু-ছাত্রেরই নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেন এবং ইহার ফলে এদেশে সংস্কৃত বিদ্যার বহুল প্রচার সম্ভব হয়।

সংস্কৃত কলেজকে কেন্দ্র করিয়া এদেশে বাঙলা শিক্ষার নূতন ধারা প্রবর্তিত হয়। এই কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর সরকার বাঙলা শিক্ষা বিস্তারের ভার অর্পণ করেন। বাঙলা শিক্ষকদের শিক্ষণ-বিদ্যা শিখাইবার জন্য এখানে ১৮৫৫ সনের জুলাই মাসে একটি নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের সুপারিশে সে যুগের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই বিদ্যালয়টি প্রাতঃকালে বসিত।

এই কলেজ আর একটি বিষয়েও অগ্রণী হইয়াছিল। ১৮৩৫ সনে শিক্ষার বাহন ইংরেজী ধার্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মূল ইংরেজী হইতে কোন কোন গ্রন্থ সংস্কৃতে অনুবাদিত হইয়া সরকারী খরচে এখান হইতে প্রকাশিত হইত। ঐ সনের পরে ইহার সে কার্য রহিত হয়। বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার ও ইহাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপনের জন্য ১৮৮১ সনে সংস্কৃত এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। ১৮৮৭ সন হইতে উক্ত সভা কর্তৃক সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের 'তীর্থ' পরীক্ষা গৃহীত হইতে থাকে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলন ও সংঘাতের প্রতীকস্বরূপ এই ভবনটি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানে দীর্ঘকাল সংস্কৃত কলেজ, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল এবং হিন্দু স্কুল অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে হিন্দু স্কুল পার্শ্ববর্ত্তী নূতন গৃহে উঠিয়া গিয়াছে। হিন্দু কলেজ নবরূপায়নের পর প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয়। ইহার প্রায় ১৮ বৎসর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ বর্তমান ভবনে চলিয়া আসে। প্রেসিডেন্সি কলেজ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বলা হইবে।

———

কৃষি সমাজ

সে যুগে ইংরজী 'সোসাইটি' 'কমিটি' বা 'এসোসিয়েশন' কথার বাংলা করা হইত 'সমাজ'। যেমন—গৌড়ীয় 'সমাজ' শিক্ষা 'সমাজ', অনুবাদক 'সমাজ' প্রভৃতি। আমি এখানে যে 'সোসাইটি' বা প্রতিষ্ঠানটির বিষয় বলিতে যাইতেছি তাহার বাঙ্গলা সে-যুগের পত্র-পত্রিকায় দেখিতেছি 'কৃষি-সমাজ' বা 'কৃষি বিষয়ক সমাজ।' 'ইংরেজী নামটী বড়ই দীর্ঘ—এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটীর সে যুগের দেওয়া বাঙ্গলা নাম 'কৃষি-সমাজ' বলিয়াই এখানে উল্লেখ করিব। তবে উক্ত নামটির মানে শুধু 'কৃষি-সমাজ' করিলেও সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায় না। 'কৃষি ও উদ্যান-রচনা বিষয়ক সমাজ' এতখানি বলিলে তবে ঠিক হয়। আলোচনার সুবিধার জন্য ঐ সংক্ষিপ্ত নামই এখানে ব্যবহার করিব।

পাদ্রী উইলিয়াম কেরীর বিষয় আমরা অল্প-বিস্তর অনেকেই শুনিয়াছি। বঙ্গীয় সংস্কৃতিক্ষেত্রে তিনি চিরস্মরণীয়। তিনি শুধু ভাষা-সাহিত্যের আলোচনায়ই ব্যাপৃত থাকিতেন না, বিজ্ঞানের আলোচনা-গবেষণায়ও তাঁহার অনেক সময় যাপিত হইত। তিনি যে সে-যুগের একজন বিখ্যাত উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী ছিলেন একথা হয়ত আমরা অনেকেই জানি না। শ্রীরামপুরে তাঁহার নিজের একটি বাগান ছিল। সেখানে তিনি দেশ-বিদেশের গাছ-গাছড়ার চাষাবাদ ও প্রতিপালন করিতেন। মা যেমন সন্তানকে পালন করেন ঠিক তেমনি। তাঁহার এক পুত্র যবদ্বীপে পাদ্রীর কার্য লইয়া যান।

কিভাবে সেখান হইতে গাছপালা জাহাজে করিয়া জীবিতাবস্থায় পাঠাইতে হয় তাহার নির্দেশপূর্ণ কেরীর লেখা একখানি চিঠি আমি পড়িয়াছি। দেশ-বিদেশের তরুলতা সম্বন্ধে এমন অনুসন্ধিৎসা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। শ্রীরামপুরের এই সুন্দর উদ্যানটি ১৮১৪ সনের প্লাবনে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কেরী শুধু নিজের বাগানে উদ্ভিদ্ পরীক্ষণকার্যেই ব্যাপৃত থাকিতেন না, দশজনের মধ্যে উদ্ভিদ্-প্রীতি অনুক্রামিত করিতেও প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা দেশ কৃষি-প্রধান। কেরী জীবিকার জন্য প্রথমে মালদহের মদনাবতীতে নীলকুঠীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা স্থানীয় অধ্যক্ষ হইয়া যান। তিনি তখন এদেশজাত কৃষি-দ্রব্যাদির আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। বঙ্গদেশের কৃষিদ্রব্য, চাষের লাঙ্গল, আবহাওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যমূলক প্রবন্ধ এশিয়াটিক সোসাইটীর মুখপত্র 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'এ ছাপাইয়াছিলেন। আবার কলিকাতা-শিবপুরের বোটানিক গার্ডেনের অধ্যক্ষ বিখ্যাত উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিদ্ ডাঃ রক্সবার্গের সঙ্গে তাঁহার খুব ভাব ছিল। দেশ-বিদেশ হইতে আনীত বহু গাছপালা কেরী এই সরকারী উদ্যানে দান করেন। রক্সবার্গের মৃত্যুর পর তাঁহার সংগৃহীত তিন হাজারের উপর বৃক্ষের পরিচয় সহ এক অতিকায় পুস্তক কেরী তিন খণ্ডে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত করেন পূর্বে বলিয়াছি। রক্সবার্গের পরবর্তী অধ্যক্ষ ডাঃ নাথানিয়েল ওয়ালিচের সঙ্গেও কেরী সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন।

কৃষি-প্রধান বাঙ্গলা দেশের সর্বত্র যাহাতে উন্নত ধরণের চাষ আবাদ সুরু হয় কেরীর ছিল তাহাই আন্তরিক বাসনা। তিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বা শুধু গবেষণাকার্যে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না, জনসাধারণের মধ্যেও এই উদ্ভিদ্-প্রীতি তথা কৃষি-জ্ঞান সঞ্চারিত করিবার মানসে তিনি কুড়িটি প্রশ্ন সম্বলিত একখানি অনুষ্ঠানপত্র

তৎকালীন দেশী-বিদেশী নেতৃবৃন্দের নিকট প্রেরণ করেন। কোন্ কোন্ অঞ্চলে কি ধরণের শস্য উৎপন্ন হয়, চাষের যন্ত্রপাতি কি কি, ভূমিতে সার দেওয়ার কিরূপ ব্যবস্থা, একই জমিতে একাধিক ফসলের ব্যবস্থা করা যায় কিনা—এইরূপ নানা বিষয় সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হয়।

বত্রিশজন প্রধান ব্যক্তির নিকট হইতে আশ্বাস পাইয়া কেরী কলিকাতা টাউন হলে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে সভায় উপস্থিত হইলেন মাত্র সাতজন। কিন্তু ইহাতে তিনি হতোদ্যম না হইয়া এই সাতজনের মধ্যেই একজনকে সভাপতি করিয়া কৃষি-সমাজের পত্তন করিলেন। নিজে হইলেন অস্থায়ী সম্পাদক। বঙ্গদেশে কৃষির উন্নতি করিতে হইলে এদেশীয় প্রধানদের, বিশেষতঃ, ভূম্যধিকারীদের সাহায্য ও সহানুভূতি একান্ত আবশ্যক। কেরী প্রথম হইতেই এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। বহু নেতৃস্থানীয় বাঙ্গালী ঐ বত্রিশজনের মধ্যে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। আবার প্রথম দিনের সভায় উপস্থিত সাতজনের মধ্যেও ছিলেন দুইজন বাঙ্গালী—রাজা বৈদ্যনাথ রায় ও রামকমল সেন। কেরীর আগ্রহাতিশয়ে রামকমল অন্যতর সম্পাদকও নিযুক্ত হইলেন। তৎকালীন বড়লাট লর্ড হেষ্টিংস ও বড়লাট-পত্নী এই সমাজের 'পেট্রন' বা পৃষ্ঠপোষক হন। কেরীর অন্যতম সহকর্মী জসুয়া মার্শম্যান প্রথম হইতেই সমাজের সভ্য হইয়াছিলেন।

কৃষি-সমাজের দ্বিতীয় অধিবেশন হইল ২রা অক্টোবর, ১৮২০ তারিখে। এদিনে তেরজন সভ্য লইয়া একটি পরিচালক-সভা গঠিত হয়। সদস্যদের মধ্যে জন পামার, জেমস্ কিড্ এবং জসুয়া মার্শ-ম্যান, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, হরিমোহন ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর প্রভৃতি ছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই ধনে মানে জ্ঞানে গুণে তখনকার দিনের বিশিষ্ট ব্যক্তি।

১৮২২, ৭ই জানুয়ারীর সভায় রামকমল সেনের প্রস্তাবে রাধাকান্ত দেবকে সমাজের সদস্য করা হয়—সমাজের হস্তলিখিত কার্য-বিবরণীতে এইরূপ পাইতেছি। তিনি হয়ত প্রতিষ্ঠার পরে প্রথমে কিছুকাল মাত্র ইহার সংস্রবে ছিলেন। উক্ত দ্বিতীয় দিনের সভায় ডাঃ ওয়ালিচ্ যাহাতে সমাজের স্থায়ী সম্পাদক হন, কেরী এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ওয়ালিচ্ তখন ছিলেন নেপালে। ১৮২২, ২২শে মে তারিখের সভায় কেরীর প্রস্তাবে তাঁহাকে স্থায়ী সম্পাদক পদে বৃত করা হইল। এই সনেই, ১১ই সেপ্টেম্বরের কার্য-বিবরণে দৃষ্ট হয়, সমাজ ব্যারাকপুর গভর্ণমেণ্ট উদ্যানের সংলগ্ন টিটাগড়ে খানিকটা জায়গা লইয়া সেখানে চলিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী ১৩ই নবেম্বর (১৮২২) সেখানেই সভা হয়—এইরূপ উল্লেখ পাই। সমাজের ইতিহাসকার বলেন, ইহার নাম প্রথমে ছিল মাত্র 'এগ্রিকালচারাল সোসাইটি', পরে 'হর্টিকালচারাল' কথাটিও কর্তৃপক্ষ ইহাতে সন্নিবেশিত করেন। নাথানিয়েল ওয়ালিচ্ ও রামকমল সেন সম্পাদক হইলেও, কেরীর উৎসাহ কোনক্রমে হ্রাস পায় নাই। ইহার উন্নতি ও প্রসারকল্পে তাঁহার উদ্যম ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। কেরী ১৮২৯, ২১শে আগষ্টের একখানি পত্রে কৃষি-সমাজের সভাপতিপদ গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করেন, দেখিতে পাই।

কৃষি-সমাজের কার্য প্রথমাবধি কিরূপে আরম্ভ হয় সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব। টিটাগড়ের নিজস্ব উদ্যানে সমাজ নূতন নূতন গাছপালা ও ফল-মূলের চাষাবাদ সুরু করিয়া ইহাকে একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করেন। প্রথমদিকে সোসাইটির দ্বিতীয় কার্য হইল—দেশজ কৃষি প্রণালী ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি অনুসন্ধান ও আলোচনা। কৃষি-সমাজের পক্ষ হইতে সাময়িক পুস্তক প্রকাশ আরম্ভ হয় ১৮৩৮ সন হইতে। ইহাতে দেখিতেছি, প্রায় প্রতিষ্ঠাবধি এই সব সম্পর্কে পত্র, প্রবন্ধ, বক্তৃতা মারফত যে

সমুদয় আলোচনা হইয়াছে তাহা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। গমের চাষ, বীজ সংরক্ষণ, বিভিন্ন জেলার কৃষির অবস্থা, ধান, বাজরা, মটর ও ইক্ষু চাষ সার হিসাবে চূণের ব্যবহার, উন্নত লাঙ্গল, আবহাওয়া, পূর্ণিয়া জেলার কৃষি-বিষয়ক শব্দসমূহ (ইংরেজী মানে সমেত)—এইরকম নানা বিষয়ই উহার মধ্যে আছে। রাধাকান্ত দেব শ্রীহট্ট, রাজসাহী, দিনাজপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলার কৃষির অবস্থা সম্বন্ধেও নিজ অনুসন্ধানের ফলাফল পত্রাকারে ইহাতে প্রকাশিত করেন। প্রথম খণ্ড সাময়িক পুস্তক হইতেই কৃষি-সমাজের কর্ম-ব্যাপ্তির একটি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ১৮৪২ সনের আগষ্ট মাস হইতে কৃষি-সমাজের মুখপত্র 'মন্থলি জার্ন্যাল' প্রকাশ আরম্ভ হয়।

প্রথম সাত বৎসর সমাজের উদ্যান ছিল টিটাগড়ে। ইহার পরে সরকার আলীপুরে বজবজ রোডের আরম্ভ-মুখে এক খণ্ড ভূমি সমাজকে দান করিলে এখানে উঠিয়া আসে। পরীক্ষামূলকভাবে ইক্ষু, রেশম, তামাক, তুলা ইত্যাদি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য আক্রায় জমিও দেওয়া হইল। কৃষি-সমাজ ইতিপূর্বেই নিজস্ব বাগানে এবং অন্যত্র উৎপাদিত কৃষি-দ্রব্যের বাৎসরিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন কৃষিদ্রব্যের বীজ চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিতে আরম্ভ করেন। চাষীরা এই সকল বীজ হইতে জাত ফলমূলও প্রদর্শনীতে আনিয়া হাজির করিত। ১৮২৮ সনে একশত নয়জন মালীকে উৎকৃষ্ট ফলমূল উৎপাদনের নিমিত্ত পদকাদি পুরস্কার দেওয়া হইল জলসেচের যন্ত্র নির্মাণে কৃতিত্ব দেখাইলে এক ব্যক্তি সমাজ হইতে সাহায্য পায়। কৃষি-সমাজের এতাদৃশ ফলদায়ক কর্মপদ্ধতি শীঘ্রই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই প্রতিষ্ঠানের কার্য যাহাতে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয় তদুদ্দেশ্যে বিলাতের ডিরেক্টর-সভা সমাজকে এককালীন বহু সহস্র টাকা দান

করেন। দশ সহস্র টাকা বাৎসরিক সাহায্য দানেও তাঁহারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হন।

কিন্তু শীঘ্রই কৃষি-সমাজের দুর্দিন ঘনাইয়া আসিল। সমাজের যাবতীয় অর্থ গচ্ছিত ছিল আলেকজাণ্ডার কোম্পানী নামক একটি এজেন্সী হৌসে। সেযুগে এই এজেন্সী হৌসগুলিতেই আধুনিক ব্যাঙ্কের মত কাজকারবার চলিত। ১৮৩৩ সনের ১২ই ডিসেম্বর এই বিখ্যাত হৌসটি ফেল হইলে কৃষি-সমাজের সমুদয় অর্থই নষ্ট হইয়া যায়। সমাজ স্বতঃই সঙ্কটের সম্মুখীন হন। আলিপুর ও আক্রার জমি ছাড়িয়া দিতে হইল। যাহা হউক, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবপুর বোটানিক গার্ডেনের অভ্যন্তরে সমাজ দুই একর পরিমিত ভূমি প্রাপ্ত হন। সমাজের কর্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া কর্তৃপক্ষ ক্রমে এই ভূমি পঁচিশ একর পর্যন্ত বাড়াইয়া দেন। এইখানে প্রায় চল্লিশ বৎসর অবস্থানের পর বর্তমান ১নং আলিপুরের জমিতে কৃষি সমাজ চলিয়া আসেন। এই জমিরও একটু ইতিহাস আছে। এ অংশটি বেলভেডিয়ার লাটভবনের সংলগ্ন হইলেও পতিত অবস্থায় ছিল। ইহার আয়তন তেষট্টি বিঘা। ১৮৭২ সনে ভারত সরকার কৃষি-সমাজকে এই পতিত ভূমিখণ্ড অর্পণ করেন এই সর্তে যে, যতদিন এখানে সমাজের বাগান থাকিবে ততদিন সমাজ ইহা ভোগ করিতে পাইবেন। কৃষিদ্রব্যাদি উৎপাদনের উপযোগী করিয়া লইতে অবশ্য কয়েক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। বোটানিক গার্ডেন হইতে যথাসময়ে কৃষি-উদ্যান এখানে স্থানান্তরিত হইল।

তবে ১৯০০ সন পর্যন্ত কৃষি-সমাজের আপিস মিউজিয়ম ও গ্রন্থাগার ছিল অন্যত্র—হেয়ার ষ্ট্রীট ও ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে অবস্থিত মেট্‌কাফ হলে। 'মেট্‌কাফ হল' প্রসঙ্গে এ বিষয় কিছু বলিব। গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যভাগ হইতে সমাজের কার্য পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হয়। স্থানীয় দেশী-বিদেশী বহু পদস্থ ব্যক্তি

ইহার সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। সদস্যদের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রুস্তমজী কাওয়াসজী, রাধাকান্ত দেব, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত তিনজন ইহার সহঃ সভাপতিও হন। বাঙ্গলা দেশের ভিতরে বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলীতে এবং বাহিরে লক্ষ্ণৌ, মীরাট, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, দানাপুর, এমন কি সুদূর সিঙ্গাপুরে পর্যন্ত শাখা-সমাজ স্থাপিত হইল। কৃষি-সমাজ এই সকল স্থানে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা দেশে উন্নত কৃষি প্রচলনের জন্য বিভিন্ন দ্রব্যের বীজ আমদানীর ব্যবস্থা করেন। মরিসস্ ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে ইক্ষু এবং আমেরিকা হইতে তুলার বীজ আনয়ন করা হইল। দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম আফ্রিকা, চীন ও ম্যানিলা হইতে শস্যবীজ ক্রয়ের জন্য হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয় ১৮৩৮ সনে। ১৮৩১ সন হইতে কৃষি-সমাজ উন্নত ধরণের তুলা উৎপাদনের জন্য বিদেশ হইতে বীজ আমদানীর কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে বীজ আনাইয়া পাটনায় ফুলকফির চাষ প্রবর্তিত হয়। বিলাত হইতে আনীত বীজ দ্বারাই এদেশে নৈনীতাল ও শিলং আলু জন্মানো সুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্র হইতে যব ও ক্যারোলিন এবং নিউ গ্রানাডা হইতে রকমারি ধান্যের বীজও আনানো হইয়াছিল। এই সকল বিভিন্ন খাদ্যশস্যের বীজ সমাজ স্বয়ং এবং শাখা-সমাজ মারফত দেশ মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। আর একটি বিষয়েও কৃষি-সমাজ পথপ্রদর্শক। ১৮৫২ সনে এদেশে ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক কুইনাইনের জন্য সিনকোনা গাছ উৎপাদনের দিকে সমাজ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৬১ সন হইতে বোটানিক গার্ডেনে সিনকোনা-চাষ আরম্ভ হয়।

তৃতীয় দশক হইতে কৃষি-সমাজের কার্যকলাপের প্রতি স্থানীয়

কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিও বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ লর্ড মেয়োর আমলে, ১৮৭১ সনে ভারত-সরকার কর্তৃক কৃষি-বিভাগ প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত এই সমাজই কৃষি বিষয়ক আলোচনায় সরকারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। অস্থায়ী বড়লাট চার্লস থিওফিলাস মেট্‌কাফ (১৮৩৫-৩৬) কৃষি-সমাজের কার্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন। ভারতবাসীদের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যাহাতে প্রসারলাভ ঘটে সে বিষয়ে তিনি বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। তৎকৃত সংবাদপত্রের শৃঙ্খল মোচনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় দেশী-বিদেশী প্রধানেরা বহু সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করেন। কলিকাতায় সংস্কৃতি-কেন্দ্র স্বরূপ তাঁহার নামাঙ্কিত একটি ভবন বা 'হল' নির্মাণের আয়োজন হইতে থাকে। কয়েক বৎসরের মধ্যে সরকার প্রদত্ত ভূমির উপর বিভিন্ন সোসাইটির অর্থে মেট্‌কাফ হল নির্মিত হইল। কৃষি-সমাজও এই ভবনটি নির্মাণের ব্যয়ভার আংশিক বহন করেন। পূর্ব ব্যবস্থা মত এই ভবন নির্মাণের পর ১৮৪৪ সন হইতে ইহার নিম্নতল কৃষি-সমাজের অধিকারে আসে। উপরিতলে স্থিত হয় কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরী—বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরী বা জাতীয় গ্রন্থাগারের পূর্বজ।

সরকারী কৃষি-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষি-সমাজ সরকারের নিকট হইতে পূর্বের ন্যায় সাহায্য ও সহানুভূতি প্রত্যাশা করিতে পারিলেন না। সমাজের চাঁদা হইতে এবং কৃষি-উদ্যানের উপস্বত্ব হইতে যাহা আয় হইত তাহার মধ্যেই ব্যয় বেশীর ভাগ নিবদ্ধ রাখিতে হইত। এ কারণ ইহার কার্যকলাপও সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ইহার উপর আসিল বড়লাট কার্জনের প্রস্তাব। তিনি মেট্‌কাফ হলস্থিত কৃষি-সমাজ ও কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরীর তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে যে বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা দিয়াছেন, কটন-কৃত

'ক্যালকাটা ওল্ড এণ্ড নিউ' পুস্তকের পাঠক তাহা অবগত আছেন। ১৯০০ সনে 'মেট্‌কাফ হল'কে একটি পুরাপুরি সরকারী গ্রন্থাগারে পরিণত করার ব্যবস্থা হইল। তখন কৃষি-সমাজকে কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে আলিপুর রোডের উদ্যানেই চলিয়া আসিতে হয়। ১৯০২ সনে মেট্‌কাফ হল সম্পর্কে সরকার একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন। তাহার হেতুবাদ হইতে কৃষি-সমাজ সম্পর্কীয় অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল:

"And whereas at general meetings of the said Society (Agricultural and Horticultural Society of India) duly convened and held in accordance with the bye-laws and regulations of the fourteenth day of March one thousand and the twentyseventh day of April one thousand and nine hundred the following resolution was passed namely that the conditional offer made by the President to and accepted by the Govt. of Bengal for the transfer to the Govt. of India of the right title and iterest of this Society in the Metcalfe Hall property in consideration of a permanent annuity of Rs. 6,000/- unfettered by any conditions affecting its enjoyment ond a sum of Rs. 25,000/- in cash be and is hereby adopted and confirmed and that the President be and is hereby authorised to carry such transfer in to effect."—Imperial Library (Indentures Validation. Act. 1902.)

ইহা হইতে জানা যায়, কৃষি-সমাজ নিম্নের সর্তে মেট্‌কাফ হলের যাবতীয় স্বত্ব ত্যাগ করেন—(১) সরকার সমাজকে এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা দিলেন এবং (২) প্রতি বৎসর ছয় হাজার টাকা সাহায্য দিতে সরকার আবদ্ধ রহিলেন। কৃষি-সমাজের কার্য পূর্বেই সঙ্কুচিত হইয়াছিল, বলিয়াছি। নিজ উদ্যানে

স্থানান্তরিত হইলে সমাজের মূল উদ্দেশ্য কৃষি-উন্নয়ন কার্য বর্জিত হইল। কৃষিকার্যের প্রসারে এবং উন্নত কৃষির প্রচলনে সুদীর্ঘকাল যাবৎ কৃষি-সমাজ যে প্রয়াস পাইতেছিলেন এবং তাহা দ্বারা উন্নত আঁশের তুলা, গোল আলু, কফি, ইক্ষু, তামাক, সিনকোনা প্রভৃতির চাষে কি সরকার কি দেশবাসী সকলে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, এবম্বিধ কার্য-সংকোচে তাহা হইতে দেশ বঞ্চিত হয়। উহার পর হইতে সমাজের প্রধান কার্য হইয়াছে উদ্যান-রচনা, পুষ্পাদির বীজ সদস্যদের মধ্যে বিতরণ এবং এখানে যথাসাধ্য পুষ্পাদি উৎপাদন। আধুনিক রূপ দেখিয়া পুরাতন কৃষি-সমাজের কল্পনা করাও আজ দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। 'কৃষি-সমাজে'র বর্তমান কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় সরকার একযোগে কার্য করিলে ইহার পূর্ব গৌরব কতকটা ফিরাইয়া আনা যাইতে পারে। এখন কৃষির উন্নতির দিকে যেরূপ নজর পড়িয়াছে তাহাতে এরূপ প্রয়াস মোটেই অযৌক্তিক নয়। ১৯৩৫ সন হইতে কৃষি-সমাজের গালভরা নাম হয়—'রয়্যাল এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া'।*

---

* কৃষি-সমাজের এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী শ্রীযুত মিহিরকুমার দত্ত সোসাইটি সংক্রান্ত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত কাগজপত্রাদি দেখিতে দিয়া সহায়তা করিয়াছেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতেও বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

মাধ্যমিক পাঠশালা

হেদুয়া, বর্তমান আজাদ হিন্দ বাগের পূর্ব পার্শ্বে, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি পুরাতন বাড়ী আছে। এটি এখন ফ্রি চার্চের সম্পত্তি। এখানে মহিলাদের বি-টি ক্লাস বসে।

বাহির হইতে ইহার প্রাচীনত্ব তেমন বুঝা যায় না। ফটক দিয়া ঢুকিয়া পোর্টিকো পর্যন্ত গেলেই বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়, অনেককালের একটি পুরাতন গৃহে প্রবেশ করিতেছি। নিম্নতলে বারান্দার পরেই সম্মুখে ঘরের দেওয়ালের লেখা দেখিয়া যে-কেহ আমার উক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবেন। এখানে ইংরেজী ও বাংলা তুইটি হরফেই একটি লিপি আছে। বাংলা অংশ পংক্তিক্রমে এই :

"এই
মাধ্যমিক পাঠশালা
এতদ্দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার্থে
সম্ভ্রান্ত খ্রীষ্টান স্ত্রী-সমূহের এক অমাত্য কর্তৃক
স্থাপিত হইল
তন্নিমিত্তে
শ্রীমান্ রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর
অতি স্বচ্ছন্দরূপে বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান দ্বারা
বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন এবং ইহার প্রয়োজন
সকলের তদতিরিক্ত সাধন ও অর্থের আহরণ
শ্রীল শ্রীযুক্ত চার্লস্ নৌল্স রবিনসন সাহেব কর্তৃক হয়
যিনি এই গৃহের পাণ্ডুলিপি, পরে তদনুসারে গৃহ নির্মাণ করেন
১৮২৮"
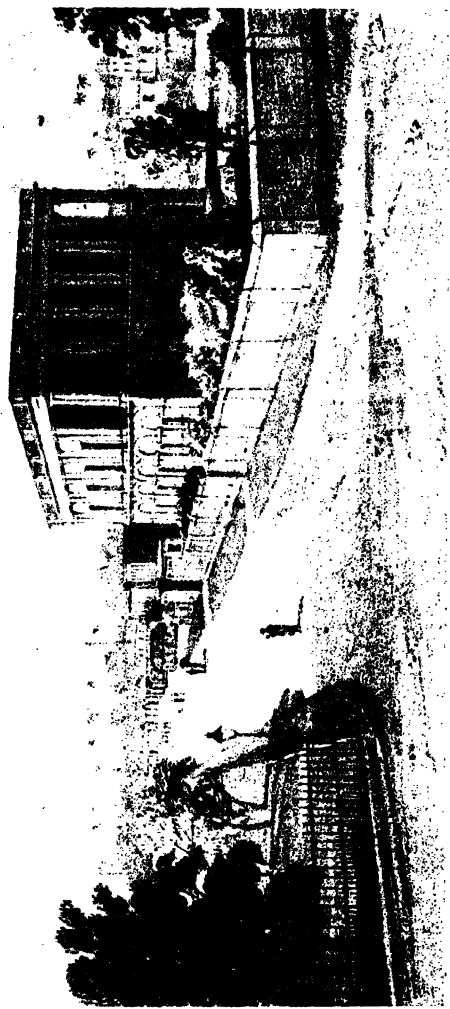
মাধ্যমিক পাঠশালা
প্রিশিলা চ্যাপমান প্রণীত "হিন্দু ফিমেল এডুকেশন"
(১৮৩৯) শীর্ষক ইংরেজী পুস্তক হইতে
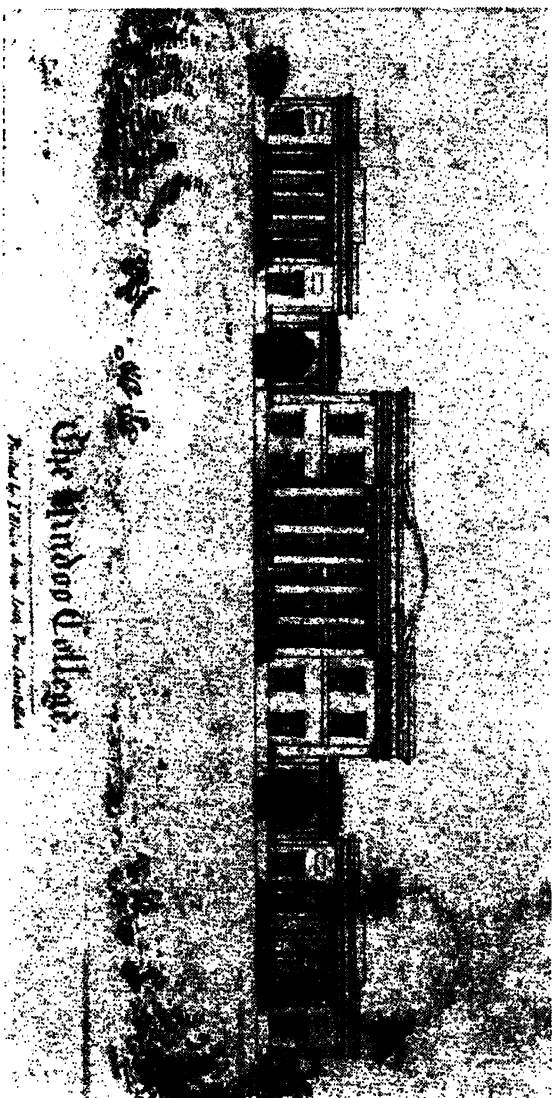
হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ

১৮৩২ খৃঃ একটি লিথোপ্রেসে মুদ্রিত চিত্র হইতে

'মাধ্যমিক' কথাটা আজকাল 'Secondary'—উচ্চ ও নিম্নের মধ্যবর্তী—এই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। এ কারণ কেহ যেন মনে না করেন, এ পাঠশালাটিও আধুনিক ধরণের একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়টির ইংরেজী নাম 'Central School' অথবা 'Central Female School'। সে যুগে কেন্দ্রে বা মধ্যস্থলে অবস্থিত এই অর্থে উহার বাংলা করা হইয়াছে 'মাধ্যমিক পাঠশালা'। এই পাঠশালাটির ইতিহাসও বড়ই বিচিত্র। আর বাঙালী মেয়েদের মধ্যে বেথুন-পূর্ব যুগে একটি আদর্শ বিদ্যালয় ছিল বলিয়া ইহার গুরুত্বও সমধিক। 'মাধ্যমিক' পাঠশালাটির গৃহনির্মাণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত উপরের লিপি হইতে আমরা কতকটা জানিয়া লইয়াছি। শহরের মধ্যস্থলে এরূপ একটি গৃহে আদর্শ পাঠশালা স্থাপনের প্রয়োজন কিরূপে অনুভূত হয় সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা আবশ্যক। কুমারী মেরী এ্যান কুক নাম্নী এক ইংরেজ মহিলাকে এদেশে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বিলাতের ব্রিটিশ এণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি প্রেরণ করেন। তিনি শ্রীরামপুর মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম ওয়ার্ডের সঙ্গে একই জাহাজে ১৮২১ সনের নবেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছেন। প্রথমে কথা ছিল, কলিকাতার স্কুল সোসাইটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। কিন্তু তৎকালে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রকাশ্য স্থলে নিজ নিজ কন্যাদের পাঠাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এ কারণ সোসাইটির পক্ষে রাজা রাধাকান্ত দেবের পরামর্শ অনুসারে কলিকাতার চার্চ মিশনারী সোসাইটি স্বীয় বালিকা বিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধানের জন্য কুক মহোদয়াকে নিযুক্ত করেন।

পাঠশালা-সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া গেল। আর শহরের বিভিন্ন স্থলে এগুলি প্রতিষ্ঠিত। কুমারী কুকের পক্ষে প্রত্যহ প্রতিটি পাঠশালায় উপস্থিত হইয়া ছাত্রীদের পাঠ দিতে বড়ই পরিশ্রম হইত। উক্ত

সোসাইটির তরফে আর্কডিকন করী ১৮২৩ সনের ৬ই মার্চ তারিখে কলিকাতার মধ্যস্থলে একটি প্রথম শ্রেণীর বালিকা বিত্তালয় স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করিয়া ও অর্থ চাহিয়া সাধারণের নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রচার করিলেন। ইহার ঠিক এক বৎসর পরে ১৮২৪, ২৫শে মার্চ তারিখে চার্চ মিশনারী সোসাইটির আনুকূল্যে মিশনারীদের স্ত্রীগণ ও অন্যান্য ইউরোপীয় মহিলাদের লইয়া কলিকাতায় 'লেডিজ সোসাইটি' নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। সোসাইটির বালিকা বিত্তালয়গুলির পরিচালনা-ভার এই সমিতি লইলেন, সঙ্গে সঙ্গে করীর প্রস্তাবটিকে ত্বরান্বিত করিবার জন্যও সচেষ্ট হইলেন।

কলিকাতায়, বোম্বাইয়ে ও লণ্ডনে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চলিল। রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কলিকাতার বিত্তোৎসাহী হিন্দু প্রধানগণ নারীজাতির শিক্ষার প্রতি মনোযোগী ছিলেন। তাঁহারা মিশনারীদের, বিশেষতঃ এই সকল ইউরোপীয় মহিলার প্রচেষ্টা সমর্থন করিতেন। পাঠশালার ছাত্রীবৃন্দের বাৎসরিক পরীক্ষায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের উৎসাহ দিতেন। রাজা বৈত্তনাথ রায়ও অত্যন্ত বিত্তোৎসাহী ছিলেন। তিনি ১৮২৫ সনে 'মাধ্যমিক' পাঠশালার গৃহ-নির্মাণের জন্য যে কুড়ি হাজার টাকা দেন তাহার উল্লেখ আমরা প্রথমেই করিয়াছি। কুমারী কুক ইতিপূর্বে পাদরি আইজাক উইলসনের সঙ্গে বিবাহিত হইয়া মিসেস মেরী এ্যান উইলসন নামে পরিচিত হন। তিনি লেডিজ সোসাইটির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। আবার রাজা বৈত্তনাথ রায়ের সহধর্মিণীর গৃহশিক্ষকও ছিলেন। ১৮২৫ সনে লেডিজ এসোসিয়েশন নামে আর একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। মিসেস উইলসন ইহার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। এই সমিতিরও অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল—'মাধ্যমিক' পাঠশালার জন্য অর্থ-সংগ্রহ। বস্তুতঃ এই সমিতি এক বৎসরের মধ্যে

পাঠশালার ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা তুলিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এইরূপে বিস্তর টাকা আদায় হইল। প্রতিশ্রুতিও নানা স্থান হইতে পাওয়া গেল। লেডিজ সোসাইটি এইবার করা-প্রস্তাবিত 'মাধ্যমিক' পাঠশালার গৃহনির্মাণে অগ্রসর হইলেন। হেদুয়ার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে পূর্বোল্লিখিত স্থলে ১৮২৬ সনের ১৮ই মে ভোর সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় বড়লাট-পত্নী লেডী আমহার্ষ্ট দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ইউরোপীয় মহিলাগণের সম্মুখে উহার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বহু শিশুকেও এই উৎসব দর্শনের জন্য আনা হয়। সংস্কৃত কলেজ ভবনের মত এখানেও বিশেষ সমারোহে এই উৎসব সম্পন্ন হইল। রাজা বৈদ্যনাথ রায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া দোভাষীর মাধ্যমে এই শুভকার্য সম্পাদনের জন্য বড়লাট-পত্নীকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ইহার পর মিসেস উইলসন বালিকা বিদ্যালয়গুলির উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রীদের উক্ত স্থলের সন্নিকটে একটি বাড়ীতে জড় করিয়া পড়াইতে সুরু করিলেন। পাঠশালা গৃহের নির্মাণকার্য সমাধা হইলে ১৮২৮ সনের ১লা এপ্রিল হইতে এখানে পঠন-পাঠন আরম্ভ হইল। এই বিদ্যালয়ের বহিরঙ্গের এবং শিক্ষকগণের মহিলাদের শিক্ষাদানের দুইটি চিত্র প্রিশিলা চ্যাপমান তাঁহার Hindu Female Education পুস্তকে দিয়াছেন। দ্বিতীয় চিত্রখানির ছাত্রীগণ বয়স্কা। ইহার কারণও ছিল। মিশনরীরা পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এ সমুদায়কে খৃষ্টানীর কেন্দ্র করিতেও চাহিয়াছিলেন। এজন্য হিন্দুগণ ক্রমশঃ ইহাকে সাহায্য করিতে বিরত হন। নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু মেয়ে এবং দেশীয় খৃষ্টানীদের কন্যারা ব্যতীত আর কেহ এখানে পড়িতে আসিতে চাহিত না। ইহাদের মধ্যে বয়স্কা মহিলারাও ছিলেন। এই মাধ্যমিক পাঠশালাটি ক্রমে একটি

শিক্ষয়িত্রী-শিক্ষণ কেন্দ্রেও পরিণত হয়। মিসেস উইলসন অনাথ শিশুদের জন্যে একটি শিশু-বিদ্যালয়ও এখানে খুলিয়াছিলেন।

তখনকার দিনে শিমলা অঞ্চলটিকে 'Athens of Calcutta' বলা হইত। জাতির উন্নতির দ্যোতক যত কিছু আয়োজন তাহার প্রায় প্রত্যেকটিরই সূচনা হয় এই অঞ্চলটিতে। রাজা রামমোহন রায়ের এ্যাংলো-হিন্দু স্কুলও হেদুয়ার দক্ষিণ কোণে 'মাধ্যমিক' পাঠশালার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। অবশ্য এটি উহার চেয়েও পুরাতন। রামমোহন রায় বিলাত যাইবার সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক পূর্ণ মিত্রের উপর ইহার পরিচালনার ভার দিয়া যান। কি জানি কেন, তিনি ইহার নাম পাল্টাইয়া ১৮৩৪ সনে 'ইণ্ডিয়ান একাডেমি' নাম দেন। এখানে ভূদেব মুখোপাধ্যায় পড়িতেন। তিনি এই স্কুলে পড়িবার সময় ইংরেজীর পাঠ লইতেন মিসেস উইলসনের নিকট।

চার্চ মিশনারী সোসাইটির অনুকূলে আগড়পাড়ায় ১৮৩৬ সনের ২১শে অক্টোবর একটি অনাথাশ্রম খোলা হয়। মিসেস উইলসন ইহার ভার লইয়া সেখানে যান। তাঁহার স্থলে 'মাধ্যমিক' পাঠশালার তত্ত্বাবধায়িকা হন কুমারী টমসন ও হোয়াইট-পত্নী। ১৮৫২ সনেও দেখিতেছি, পাঠশালাটির দুইটি বিভাগ—শিক্ষয়িত্রী-শিক্ষণ ও বালিকাদের শিক্ষাদান সমানে চলিয়াছে। এটি তখন বোর্ডিং-স্কুল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তবে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খ্রীষ্টানসন্তানগণই ছিল এখানকার ছাত্রী। ১৮৫১ সনে খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রীদের জন্য একটি ট্রেণিং স্কুল সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়। নামটি বড় লম্বা—Normal School for the Training of Christian Female Teachers। ১৮৫৭ সনে এই বিদ্যালয়টি 'মাধ্যমিক' পাঠশালার সঙ্গে মিলিয়া গিয়া একটি পুরাদস্তুর নর্ম্যাল স্কুলে পরিণত

হয়। তবে এখানে অল্পবয়স্কা ছাত্রীদেরও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল।

বিদ্যালয়টি ক্রমে ফ্রি চার্চ নর্ম্যাল স্কুল নামে অভিহিত হয়। বেথুন স্কুল হইতে ছাত্রী কাদম্বিনী বসু (পরে গাঙ্গুলী) প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন ১৮৭৮ সনে। আর ফ্রি চার্চ নর্ম্যাল স্কুল হইতে এলেন ডি' আব্রু নাম্নী একটি এংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্রী উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন পর বৎসর, ১৮৭৯ সনে। ১৮৮২ সনে যেমন বেথুন স্কুলের কলেজ-বিভাগ হইতে কাদম্বিনী এফ্-এ পরীক্ষা দেন, এই বৎসর ফ্রি চার্চ নর্ম্যাল স্কুল হইতে চন্দ্রমুখী বসুও তেমনি এই পরীক্ষায় উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য, উভয়েই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কয়েক বৎসর যাবৎ ছাত্রীগণ এই দুইটি বিদ্যালয় হইতেই প্রবেশিকা ও এফ্-এ পরীক্ষা দিতে থাকে। এখনও, শোয়া শ' বৎসর পরেও যে (যে আকারেই হউক) 'মাধ্যমিক' পাঠশালাটি বাঁচিয়া আছে তাহা ইহার বিভিন্ন সময়ের পরিচালক-বর্গের কৃতিত্ব ও দূরদর্শিতারই পরিচায়ক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ

কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজের কথা রাঢ়ে বঙ্গে কে না শুনিয়াছেন? রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের নাম পরিবর্তন হইতে হইতে শেষে এই নাম পরিগ্রহ করে। প্রথমে সাধারণের নিকট ইহা 'ব্রহ্মসভা' নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু 'ব্রাহ্ম-সমাজ' নামটিও প্রায় প্রথম হইতেই প্রদত্ত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালনা-ভার গ্রহণের (১৮৪২) পর মফঃস্বলে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইতে থাকে। একারণ ইহা ক্রমে 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' নাম ধারণ করে। ইহার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণ 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' (১১ই নবেম্বর, ১৮৬৬) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৯ সনে এই সমাজের জন্য আলাদা মন্দির বা উপাসনা হল নির্মিত হয়। ইহার কিছু পূর্ব হইতেই, 'আদি' বলিয়া 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' উক্ত নামে আখ্যাত হইতে আরম্ভ হয়। নাম-বিবর্তনের মধ্যে কিরূপে পুরাতন ইতিহাস লুক্কায়িত থাকে, 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' তাহার একটি দৃষ্টান্ত।

এই সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা কিরূপে রাজা রামমোহন রায়ের মনে উদিত হয় তাহার বিবরণ হয়ত অনেকেই কমবেশী অবগত আছেন। রামমোহন 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য হিন্দুধর্ম' পুনঃ সংস্থাপনের জন্য প্রথমে 'আত্মীয়-সভা' গঠন করেন। এই সভায় সে-যুগের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগ দিয়া একেশ্বরবাদের আলোচনায় লিপ্ত

হইতেন। একেশ্বরবাদী উইলিয়াম এডাম রামমোহনের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত প্রার্থনা-সভায় রামমোহন উপস্থিত থাকিতেন। একদিন এখান হইতে ফিরিবার সময় তাঁহার দুইজন সঙ্গী—চন্দ্রশেখর দেব ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী তাঁহাকে বলেন যে ঈশ্বর উপাসনার জন্য তাঁহাদের নিজস্ব আলয় থাকা উচিত। এই কথাটি রামমোহনের মনে লাগিল। কালীনাথ রায় চৌধুরী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হাওড়ানিবাসী মথুরানাথ মল্লিক—এই কয়জন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে তিনি পরামর্শ করিলেন, যাহাতে তাঁহাদের একটি স্বতন্ত্র প্রার্থনা-গৃহ সত্বর স্থাপিত হইতে পারে। তখন তখনই তো আর বাটি ক্রয় বা নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তাঁহারা জোড়াসাঁকো-চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাটি ভাড়া করিয়া ১৮২৮ সনের ২০শে আগষ্ট, (১২৩৫, ৬ই ভাদ্র) হইতে প্রতি সপ্তাহে শনিবার উপাসনা কার্য আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মসভা তথা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

ফিরিঙ্গি কমল বসুর এই বাড়িটি এক হিসাবে অত্যন্ত বিখ্যাত। এই বাটিতে হিন্দু কলেজ ১৮১৯ সনে উঠিয়া আসে এবং কিছুকাল স্থিত থাকে। কমল বসুর পুরানাম কমললোচন বসু। তিনি কিন্তু ফিরিঙ্গীও ছিলেন না, খৃষ্টানও নন। পর্তুগীজ সওদাগরের অধীনে চাকরী করিতেন বলিয়া তাহার নাম হয় 'ফিরিঙ্গি কমল বসু'। এই গৃহে পাদ্রি আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৯৩০-১৩ই জুলাই তারিখে প্রথম স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ভাড়াটিয়া বাড়ীতে সমাজকে বেশীদিন থাকিতে হয় নাই। অনুসন্ধানের পর ঐ অঞ্চলে ক্রয়ার্থ চারি কাঠা দুই ছটাক জমি পাওয়া গেল। ইহার মালিক সুতানুটি নিবাসী কালী-প্রসাদ রায় ১৮২৯ সনের ৬ই জুন কবালা রেজিষ্টারী করিয়া দ্বারকা-নাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়চৌধুরী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মথুরানাথ

মল্লিক ও রামমোহন রায়কে বিক্রয় করেন। এখানে গৃহনির্মাণকার্যও শীঘ্রই সুরু হইল। ইহা শেষ হইতে ছয় মাস সময় লাগে।

১৮৩০ সনের ২৩শে জানুয়ারী (১২৩৬, ১১ই মাঘ) ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনার সূত্রপাত হয়। এই দিবস সাড়ম্বরে একটি বিশেষ উৎসব প্রতিপালিত হইয়াছিল। প্রায় পাঁচশত হিন্দু ভদ্রলোক এই উৎসবে যোগদান করেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকেও যথেষ্ট অর্থ দক্ষিণা দিয়া 'বিদায়' দেওয়া হয়। উৎসবে মণ্টগোমারি মার্টিন নামে একজন ইংরেজ উপস্থিত ছিলেন। তিনি রামমোহনের অনুরক্ত ও 'বেঙ্গল হেরাল্ডে'র সম্পাদক ছিলেন। ইহার পনের দিন পূর্বে ১৮৩০, ৮ই জানুয়ারী দিবসে রামমোহন রায়, কালীনাথ রায়চৌধুরী, দ্বারকানাথ ঠাকুর,প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একটি ট্রাষ্ট ডীড্ প্রস্তুত করিয়া বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী, রাধাপ্রসাদ রায় রমানাথ ঠাকুরকে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ট্রাষ্টী নিযুক্ত করেন। ইহার পরিচালনার ভার এই তিনজনের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮২৮ সনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইতে তারাচাঁদ চক্রবর্তী সমাজের সম্পাদক ছিলেন এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এখানে প্রতি শনিবার উপাসনা-কার্য সম্পন্ন করিতেন। সমাজ প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর হইতে রামমোহনের সঙ্গীদের সুবিধার নিমিত্ত শনিবারের পরিবর্তে বুধবার উপাসনার দিন ধার্য হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪২ সনে যখন ব্রাহ্মসমাজের ভার লয়েন, তখনও এই দিনই এখানে উপাসনা হইত। রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের পর হইতে প্রধানতঃ দ্বারকানাথের অর্থেই সমাজের কার্য নির্বাহিত হয়।

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ কিরূপে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে, তাহাই এখন বলিব। বঙ্গদেশে বেদের চর্চা প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছিল। এখানে নিয়মিত বেদ

পাঠ সুরু হইল। দুইজন তেলুগু ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিতেন। উপনিষদ্ পাঠ করিতেন উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ। বৈদিক শ্লোকসমূহ ব্যাখ্যার ভার ছিল রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপর। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাধারণের অদৃশ্য স্থানে বসিয়া ব্রাহ্মণগণ বেদ পাঠ করিতেন। উপাসনার দিনে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে 'বিদায়' দিবারও ব্যবস্থা ছিল।

ব্রাহ্মসমাজ এদেশে নূতন ধরণের ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনা ও গানে অগ্রণী হন। বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী নামক প্রসিদ্ধ গায়ক সমাজপ্রতিষ্ঠাবধি একাদিক্রমে সাতষট্টি বৎসর কাল গায়কের কাজ করেন। বিষ্ণুচন্দ্রের সঙ্গীতের জন্য ব্রাহ্মসমাজের নাম চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। বিষ্ণুচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্রহ্ম-সঙ্গীত' পুস্তকের ষষ্ঠভাগ পর্যন্ত প্রায় সকল গানেরই সুর বসাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি ১৯০০ সনের ৪ঠা মে ছিয়ানব্বই বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

রামমোহন যে ট্রাষ্ট্র-ডীড করিয়া যান, তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ব্রাহ্মসমাজে নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা স্থিরীকৃত হয়। ইহাতে কোন পুত্তলি বা চিত্র থাকিতে পাইবে না। কোন সম্প্রদায়বিশেষের জন্য এ মন্দির নির্মিত নয়। এখানে সকল জাতির ও সকল শ্রেণীর প্রবেশাধিকার ও উপাসনায় যোগদান স্বীকৃত। বেদান্ত প্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদের উপাসনা হইলেও অন্য কোন ধর্মের বা ধর্মসম্প্রদায়ের গ্লানিসূচক কথা বা উক্তি করা হইবে না,—নিয়ম করা হয়। এইরূপে প্রতিষ্ঠাবধি ব্রাহ্মসমাজ মন্দির জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ধর্মের ও সকল শ্রেণীর মিলনক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইল। এই ট্রাষ্ট-ডীড তথা ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠার মধ্যে ভারতবাসীদের ভিতর এক-জাতীয়তাবোধ উন্মেষের একটি কার্যকর উপায় নির্ণীত হয়।

ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে প্রগতিমূলক কোন কোন কার্যের অনুষ্ঠান হইতে থাকে। সতীদাহ নিরোধ আইনের বিরুদ্ধে কলিকাতার

রক্ষণশীল হিন্দু প্রধানেরা বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেন। কিন্তু এই আপীল টিকে নাই। রাজা রামমোহন রায় তখন বিলাতে। এ সংবাদে উক্ত আইনের সমর্থকগণ স্বতঃই উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র প্রদানের জন্য তাঁহারা দ্বারকানাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ১৮৩১, ১০ই নবেম্বর সমাজ-ভবনে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করেন। রামমোহন-সঙ্গী প্রবীণেরা এবং হিন্দু কলেজে নব্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত ডিরোজিওর শিষ্যদল উভয় দলই উপস্থিত ছিলেন। শেষোক্ত দলের অন্যতম নেতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের গুণপনার উল্লেখ করিয়া একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ১৮৪২ সনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগ সাধিত হয় নাই। বস্তুতঃ তখন ইহা একটি উপাসনা-ক্ষেত্র মাত্র ছিল। রামমোহন প্রবর্তিত পদ্ধতিতে এখানে বেদ পাঠ, বেদান্ত ব্যাখ্যা, সঙ্গীতাদি চলিত। দেবেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে তত্ত্ববোধিনী-সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া (১৮৩৯, ৬ই অক্টোবর) সভ্যদের সঙ্গে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মের আলোচনা এবং জাতীয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা পরিচালনায় রত হইয়াছিলেন। ১৮৪২ সনের মাঝামাঝি হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষে তিনি ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। পরবর্তী যুগে যে লিখিত হয়—ব্রাহ্মসমাজের জন্য খৃষ্টানীর স্রোত মন্দীভূত হয়, তাহার মধ্যে অনেকখানি সত্য রহিয়াছে।

নেতিবাচক কার্য দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজ তথা তত্ত্ববোধিনী-সভা নিজ কর্তব্য সমাধা করে নাই। তরুণদের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা প্রসারের যেমন আয়োজন হয়, তেমনি সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ, বিশেষতঃ উপনিষদাদির মূল অনুবাদসহ প্রকাশ ও প্রচারে তাহারা অগ্রণী হয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে শাস্ত্রালোচনা চলিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় উন্নতিমূলক নানা বিষয়েরই চর্চা ইহাতে আরম্ভ হয়। জাতীয় শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা, ব্যায়াম চর্চা, বিধবা বিবাহাদি সমাজ সংস্কার, ভূমিতে প্রজার অধিকার, নীলকরের অত্যাচার, বিজ্ঞান, ধর্ম সম্প্রদায় প্রভৃতি বিবিধ বিষয় বাঙ্গলা ভাষায় সহজবোধ্য করিয়া লিখিত ও আলোচিত হইতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের রচনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠা পূর্ণ হইত। বাঙ্গলা গদ্যের ক্রমোন্নতির যথাযথ ইতিহাস যখন রচিত হইবে তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কৃতিত্ব স্বীকৃত না হইয়া পারিবে না।

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে গঠিত হয় নাই। হিন্দুধর্মের উচ্চতম সার্বজনীন আদর্শ মানব-মনে দৃঢ়বদ্ধ করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে এই আদর্শের ভিত্তিতে এক মণ্ডলী বা সম্প্রদায় গঠন করিতে প্রয়াসী হন গত শতাব্দীর মধ্যভাগে, বিশেষ করিয়া পঞ্চম দশকের শেষ দিকে। তাঁহার পূর্ব সঙ্গিগণের সহায়তার উপরে নির্ভর না করিয়া, নবীন সম্প্রদায়কে এই কার্যে আহ্বান করিলেন। কেশব-চন্দ্র সেনের নেতৃত্বে একদল যুবক তাঁহার এই আহ্বানে সাড়া দিলেন। মোটামুটি ১৮৬০ সন হইতে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল। পশ্চিম হইতে নূতন নূতন ভাবধারা আমা-দিগকে তখন চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। সেই সময় তত্ত্ববোধিনী সভার পরিবর্তে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজকেই যুগোপযোগী রূপ দিয়া দেবেন্দ্রনাথ দেশের ও জাতির কল্যাণ সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। আমরা নূতন করিয়া সাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইবারও তখন অবকাশ পাইলাম।

ব্রাহ্মসমাজ ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের কেন্দ্র; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ইহার বাহন। কিন্তু নূতন শিক্ষা, নব ভাবনাকে কার্যে রূপ দিবারও আয়োজন চলিল সঙ্গে সঙ্গে। তবে সবই হইতে লাগিল ধর্মকে ভিত্তি করিয়া। মানুষ দুঃখে যেমন আপন হয় এমন আর কিছুতেই নয়। জ্বর মহামারী গঙ্গাতীরবর্তী স্বাস্থ্যকর জনপদগুলিকে উজাড় করিয়া দিতেছিল, তাহাদের সেবায় ব্রাহ্মসমাজ অগ্রসর হইল। ১৮৬০—৬১ সনে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। ব্রাহ্মসমাজ সাহায্যের জন্য আয়োজন করিল; আদায়ী অর্থবস্ত্র যথাস্থানে পাঠাইয়া দিল। আর এসব কার্যে প্রধান সহায় হইলেন কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে যুব-কর্মিদল। ১৮৬১ সনের ২৪শে মার্চ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপাসনা অন্তে দুর্ভিক্ষে সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আমাদের জাতীয় সাহিত্যে তাহা একটি বিশিষ্ট অবদান।

শিক্ষার প্রসারকল্পে ১৮৬১ সনের ২রা অক্টোবর 'ব্যবস্থাদর্পণ' প্রণেতা শ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকারের সভাপতিত্বে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে এক জনসভা হইল। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কেশব-চন্দ্র সেন। শিক্ষার সংস্কার ও প্রসার সাধন এবং নারী জাতির মধ্যেও যাহাতে শিক্ষা বিস্তার লাভ করে, এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। তাঁহারা সভা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। নূতন আদর্শের অনুরূপ 'ক্যালকাটা কলেজ' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। পুরনারীদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারোদ্দেশ্যে 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ, বিভিন্ন গৃহে তালিকা প্রেরণ, পুস্তকাদি রচনা ও সরবরাহ, পারিতোষিক দান— এই সকল কার্য ইহার অঙ্গীভূত ছিল। ধর্মবিষয়ক আলোচনার জন্য 'সঙ্গত সভা' ব্রাহ্মবন্ধু সভা স্থাপিত হইল। এ সব স্থানে দ্বিজেন্দ্র-

নাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণের প্রদত্ত বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। একটি ব্রাহ্ম সম্প্রদায় গঠনের জন্য বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে যে সব সামাজিক সংস্কার সাধিত হয় তাহা এখানে আলোচ্য নহে।

নূতন জাতীয়তামূলক ভাবধারার আদর্শে সংবাদপত্র ও সাময়িক-পত্র প্রকাশও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করিয়া সুরু হয় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর, জাতীয় ভাবাদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে, ১৮৬১, ১লা আগষ্ট হইতে মনোমোহন ঘোষের সম্পাদনায় 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক একখানা পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল। কেশবচন্দ্র সেন ইহার বৈষয়িক দিক দেখিতেন। তিনি ও নব্য দলের কেহ কেহ ইহাতে প্রবন্ধাদিও লিখিতেন। ক্রমে এখানি সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পে একদল ব্রাহ্ম যুবক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রথমে বামাবোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারই দ্বারা উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় ১৮৬৩ সনের আগষ্ট (১২৭০, ভাদ্র) মাস হইতে সুপ্রসিদ্ধ "বামাবোধিনী পত্রিকা" নামক মাসিক পত্র প্রকাশ আরম্ভ হইল।

ইতিপূর্বেই কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে 'কলিকাতা' নামটি যুক্ত করা হয়। এই সকলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং কতকটা স্বাধীনভাবে ধর্মকথা আলোচনার জন্য কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজেরই অন্তর্গত থাকিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অনুরূপ ১৭৮৬ শকের কার্তিক (১৮৬৪) মাস হইতে মাসিক আকারে 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা বাহির হয়। এ পত্রিকাখানি প্রকাশে নব্য দলের নেতা কেশবচন্দ্রই অগ্রণী ছিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে কেশবচন্দ্র অল্পদিন পরেই অনুবর্তীদের সহ আলাদা হইয়া যান। তিনি নিজে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পরিচালনা করিতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথের অর্থে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আদর্শানুগ 'নেশানাল পেপার' নামীয় সাপ্তাহিক

নবগোপাল মিত্রের সম্পাদকত্বে ১৮৬৫, ৭ই আগষ্ট হইতে প্রকাশিত হইল। হিন্দু মেলার ভিতর দিয়া জাতীয় ভাব প্রকাশের ইহাই সূচনা। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পরও কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রপন্থীদের সঙ্গে কিছুকাল একযোগে কার্য করিয়াছিলেন। ১৮৬৬, ১লা ডিসেম্বর কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের শিক্ষায়ত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সমর্থন-কল্পে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যে সভা হয় তাহাতে উভয় দলের লোকই একমত হইয়া কার্য করেন।

দেখিতেছি, ১৭৯০ শকের মাঘ সংখ্যা (১৮৬৯, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ 'কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ' নাম ধারণ করিয়াছে! পরবর্তী চৈত্র সংখ্যায় ইহার 'কলিকাতা' অংশ বর্জিত হয়। তদবধি মূল সমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হইতে থাকে। পত্রিকা এবং সংস্কৃত বাঙ্গলা ধর্ম-গ্রন্থাদি প্রকাশ সঙ্গীত-চর্চা, মুদ্রাযন্ত্র পরিচালনা প্রভৃতি ইহার কার্য ছিল। হিন্দু মেলার কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্মসমাজ জাতীয় আদর্শে অনুবর্তী হইয়া ইহার বিশেষ পোষকতা করিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ প্রচারের জন্য ১৭৯৩ শকের (১৮৭২) মাঘ মাসে রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে 'ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনারায়ণ তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সভা-পতি। এই নূতন সভার সম্পাদক ছিলেন নবগোপাল মিত্র ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রাহ্মসমাজ যে হিন্দুধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত, আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক বক্তৃতায় তাহা বিশেষভাবে ব্যক্ত করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদকত্ব কালে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাসে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ নিজেদিগকে 'হিন্দু' বলিয়া লিখাইয়া লন।

বাঙ্গলাদেশে আধুনিকতার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া হিন্দু সংস্কৃতি প্রচারে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ যেরূপ উদ্যোগী হইয়াছিলেন,

এরূপ কমই দেখা যায়। এই কার্যে তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষাকেই বাহন করিয়া লইয়াছিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্যও যে এইরূপে কত-খানি সমৃদ্ধ হইয়াছে এক-কথায় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী

কলিকাতার চিৎপুর রোড বহু পুরাতন সড়ক। এই রাস্তা দিয়া উত্তর অঞ্চল হইতে হিন্দুগণ কাতারে কাতারে কালীদর্শনের জন্য কালীঘাট যাইতেন। সে যুগের পুস্তকাদিতে এরূপ বিবরণ আছে। ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে বর্ধিষ্ণু পরিবারেরা এই রাস্তার দুই ধারে প্রাসাদোপম গৃহ নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতেন। ঐ সময়কার শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিও এই অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছিল। হিন্দু কলেজ, ব্রাহ্মসমাজ, ডাফ স্কুল এই রাস্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকলের কোন কোনটি এখন স্থানান্তরিত, কোনটি বা জীর্ণ দশায় উপনীত। কিন্তু ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী এখনও ইহার নবনির্মিত সুদৃশ্য ভবনে এ রাস্তার উপরেই অবস্থিত আছে।

সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসাবে এই বিদ্যালয়টির একটি ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বল্পাকারে বিনা আড়ম্বরে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ গৌরমোহন আঢ্য এই স্কুল স্থাপন করেন। তখন এটি একটি পাঠশালা মাত্র ছিল। মাণিক বসুর ঘাটের নিকটে বেঁশোহাটায় বসে। তারপর উঠিয়া আসে বটতলার এক বাটীতে। ইহা তখন চন্দ্র মিত্রের বাটী বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। ইহার কয়েক বৎসর পরে ১৮৩৬ সন নাগাদ বর্তমান স্থলে স্থানান্তরিত হয়। এটি গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ী। হিন্দু কলেজ প্রথমে ১৮১৭ সনে এখানে আরম্ভ হয়। দীর্ঘকাল পরে, ১৮৯৯ সনে পুরানো বাড়ী সমেত এই জায়গা ক্রয় করেন। সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া সমুদয় টাকা সংগৃহীত হয়। এখানে একটি ত্রিতল ভবন ১৯১৪ সনে নির্মিত হইয়াছে। এই বৎসর নবেম্বর মাসে

বাংলার প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল ইহার দ্বার উন্মোচন করেন। ঐ বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণেই পুরাতন বাটীর কিয়দংশ এখনও বর্তমান।

এই বিদ্যালয়টির বিষয় বলিবার পূর্বে ইহার প্রতিষ্ঠাতা গৌর-মোহন আঢ্য সম্পর্কে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। গৌরমোহন আঢ্য উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। একটি সাধারণ স্কুলে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থাও বিশেষ স্বচ্ছল ছিল না কিন্তু স্বদেশবাসীর মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। তাঁহার যখন সাতাশ বৎসর বয়স সেই সময়ে অতি সামান্যভাবে এই বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন করেন। কিন্তু ইহার দ্রুত উন্নতি হয়। ইংরেজীতে অধিক পারদর্শী না হওয়ায় টার্নবুল নামক একজন ইংরেজকে ছেলেদের এই বিদ্যা শিখাইবার জন্য নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়ের এংলোহিন্দু স্কুলে পূর্বে কিছুকাল প্রধান শিক্ষকের কার্য করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ সন নাগাদ দেখিতে পাই, সেমিনারীর পরিচালক গৌরমোহন আঢ্য ও টার্নবুল উভয়েই। টার্নবুলের মৃত্যুর পর আবার গৌরমোহনই ইহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। ইহার পর প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন হেরমান জফ্রয় নামক একজন ব্যারিষ্টার। তিনি অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিলেন, একারণ ওকালতীতে তেমন সুবিধা করিতে পারেন নাই। তবে শিক্ষকতাকালে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হন। তিনি ছয় সাতটি ভাষা জানিতেন। যোগ্য লোক বাছাই করিবার অদ্ভুত শক্তি ছিল গৌরমোহনের। মাসিক একশত টাকা বেতনে তিনি তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। তাঁহার বাসস্থানেরও ভাড়া লাগিত না।

গৌরমোহন নিরহঙ্কার ও অমায়িক লোক ছিলেন। তিনি যে ইংরেজী কম জানেন, একথা ছেলেদের বলিতে তাঁহার কোনরূপ সঙ্কোচ ছিল না। বিদ্যালয়টির যখন খুব সুনাম, তাঁহার যশ

যখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহারই মধ্যে ১৮৪৬ সনের ৩রা মার্চ শ্রীরামপুর হইতে নৌকাযোগে ফিরিবার সময় গৌরমোহন নৌকাডুবি হইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

গৌরমোহনের সুপরিচালনায় বিত্তালয়টি কিরূপে সে যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল এখন তাহা বলিব। ১৮৩১ সনেই এখানকার সুশিক্ষা দানের কথা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। তখন উচ্চশ্রেণীর বেসরকারী বিত্তালয় ছিল না বলিলেই হয়। হিন্দু কলেজ সরকারী সাহায্য গ্রহণ করিত। ইহার পরিচালনায় অধ্যক্ষ-সভার প্রাধান্য থাকিলেও, নানা বিষয়ে ইহাকে সরকারের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হইত। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী এ দায় হইতে মুক্ত। ইহার উপর হিন্দু কলেজের শিক্ষা তখন হিন্দুসমাজে বেশ একটা আলোড়ন উপস্থিত করে। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ছেলেরা ইংরেজ শিক্ষকের নিকটই ইংরেজী শিখিত বটে, কিন্তু তাহারা জাতিধর্ম বিরোধী হইয়া জাতীয় আদর্শচ্যুত হয় নাই। এই সময় বিত্তালয়ের উপরে রচিত একটি কবিতার চারি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করি ঃ

"অতএব নিবেদন করি মহাশয়।
বালককে শিক্ষাইতে বাঞ্ছা যার হয়॥
উচিত তাঁহার ঐ স্থানেতে পাঠান।
রাখিয়া আপন ধর্ম হইবে বিদ্বান॥"

(সমাচার চন্দ্রিকা—১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৩১)

গৌরমোহন স্কুল পরিচালনায় সেযুগের গণ্যমান্য হিন্দুগণের যে আন্তরিক সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন এখানকার জাতীয় আদর্শানুগ শিক্ষাপ্রণালী তাহার একটি বিশেষ হেতু। তবে তিনি শিক্ষানুরাগী বিদেশীয় বিদ্বজ্জনের এবং স্বদেশীয় প্রগতিশীল যুবকদের সহানুভূতি হইতেও বঞ্চিত হন নাই। ডেভিড হেয়ার বাৎসরিক পরীক্ষাকালে

উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের পাঠোৎকর্ষ নিরীক্ষণ করিতেন। দেশী-বিদেশী সংবাদপত্র সম্পাদকগণ ইহাতে যোগ দিতেন। সংবাদপত্রেও পরীক্ষাদির বিবরণ স্থান পাইত। সকলেই এক বাক্যে ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে ছেলেদের ব্যুৎপত্তির প্রশংসা করিতেন। যুগোপযোগী সংস্কারমুক্ত শিক্ষা প্রদানেও গৌরমোহন ক্রটী করিতেন না। ১৮৩৯ সনের ডিসেম্বর মাসে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছেলেদের বাৎসরিক পরীক্ষা টাউন হলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে 'বিবাহ' ও 'স্ত্রীশিক্ষা' শীর্ষক দুইটি ইংরেজী রচনা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরীক্ষকদের নিকট বিবেচিত হয় ও রচয়িতা ছাত্রদ্বয় বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। 'এড্‌ভোকেট' নামক একখানি সংবাদপত্রে এ রচনা দুইটি প্রকাশিত হইয়াছিল। রচয়িতাদের প্রগতিমূলক মনোভাব ইহাতে প্রকটিত হয়।

এই দশকেই সেমিনারীতে দুইটি নূতন বিষয়ের সূচনা হয়। ১৮৩৬ সনে এই গৃহে ডবলিউ, এস, পারকিন্স নামক এক ব্যক্তি একটি প্রাতঃকালীন শিশু-বিদ্যালয় খুলেন। তিন বৎসর হইতে ছয় বৎসরের শিশুরা এখানে বিনা বেতনে ইংরেজী ও বাংলা শিক্ষা পাইতে থাকে; প্রধানতঃ চিত্রের মাধ্যমে আমোদ আহ্লাদের ভিতর দিয়া ছেলেদের সব কিছু শেখানো হইত। বাংলাদেশে, শুধু বাংলাদেশে কেন সমগ্র ভারতেই মনে হয় এইটি প্রথম নার্সারি স্কুল বা শিশু-বিদ্যালয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হইল—সেমিনারীতে বাংলা শিক্ষার আয়োজন। এতদিন ছাত্রদের ইংরেজী শিখাইবারই মাত্র ব্যবস্থা ছিল। ১৮৩৮ সনে পূজাবকাশের পর এখানে একটি বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। উপযুক্ত বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষক দ্বারা এই দুইটি ভাষা এবং অন্যান্য বিষয় বাংলায় শিখাইবারও এ সময় হইতে ব্যবস্থা

হয়। বলা বাহুল্য, শিশুবিভাগ বাদে, অন্য বিভাগদ্বয়ের শিক্ষা বৈতনিক ছিল। তৎসত্ত্বেও প্রায় পাঁচ শত ছাত্র এই দুইটি বিভাগে অধ্যয়ন করিত।

গৌরমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুজ হরেকৃষ্ণ আঢ্য সেমিনারীর কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করিতেন। তাঁহার পরিচালনায় স্কুলটির উন্নতি অব্যাহত ছিল। ১৮৫০ সনের এপ্রিল মাসে মেট্রোপলিটন একাডেমি ক্রয় করিয়া তিনি সেমিনারীর সঙ্গে যুক্ত করেন। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ সেক্সপিয়রবিদ্ ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন একাডেমির ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। উভয় বিদ্যালয় মিলিত হইলে তিনি সেমিনারীতে অধ্যাপকতা করিতে আরম্ভ করেন। এই কার্যে তিনি প্রায় তিন বৎসর বাহাল থাকেন। এই সময় আরো কয়েকজন খ্যাতনামা ইংরেজ শিক্ষক এখানে আসিয়া যুক্ত হন। সেমিনারী তখন একটি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পরিণত হইল। এসময়কার পাঠ্য পুস্তকের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায়, বর্তমানকালের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে যেরূপ বিবিধ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, এখানেও সেইরূপ কিম্বা ততোধিক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। ছাত্রসংখ্যাও দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছিল। কলিকাতা, বেলঘরিয়া ও ভবানীপুরে (১৮৫৪) ক্রমশঃ ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৪ সনের শিক্ষা-বিষয়ক ডেস্‌প্যাচে এই বিদ্যালয়টির শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছিল।

খ্যাতনামা ইংরেজ অধ্যাপক ও শিক্ষকদের দ্বারা সাহিত্য, দর্শন ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলেও ছাত্রদের স্ব-ধর্ম পুরাপুরিই রক্ষিত হইতেছিল। সময়োপযোগী শিক্ষালাভে তাহারা বঞ্চিত হয় নাই, অথচ জাতীয় নীতিধর্ম রক্ষায়ও তাহারা পশ্চাৎপদ ছিল না। এটি এখানকার শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সে

যুগের বহু খ্যাতনামা বনেদি হিন্দু পরিবার নিজ নিজ সন্তানদেরএখানে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিতেন। এখানকার বহু ছাত্র পরবর্তীকালে নানাদিকে যশস্বী হইয়াছিলেন। পঞ্চম দশকে যাঁহারা এখানকার ছাত্র ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল, সাংবাদিক গিরীশচন্দ্র ঘোষ, হাইকোর্টের বিচারপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস্-চ্যান্সেলার স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ, রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রসরাজ অমৃতলাল বসু, সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম সকলেই অবগত আছেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তও এই বিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এখানকার শিক্ষায় ছাত্রগণ জাতীয় আদর্শে কতখানি উদ্বুদ্ধ হইতেন, উল্লিখিত মনীষীদের জীবনকথা পর্যালোচনা করিলে তাহা সম্যক অনুভূত হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও ছেলেবেলায় কিছুকাল এই বিদ্যালয়ে পাঠ লন।

আর একটি বিষয়েও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ভবন প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। এখানকার শিক্ষার সহিত এই ব্যাপারটির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিলনা বটে, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ইহার আদর্শানুরূপই ছিল। গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে এদেশে খ্রীষ্টানীর বিশেষ প্রাবল্য ঘটে। ইহা প্রতিরোধের জন্য বাংলার রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল নেতারা কিরূপে একযোগে কর্মতৎপর হইয়াছিলেন, পূর্বে তাহা আমরা সংক্ষেপে বলিয়াছি। এতদিন এই উদ্দেশ্যে নেতিমূলক প্রয়াসই চলিতেছিল। পঞ্চম দশক হইতে একটি কার্যকর উপায়ও উদ্ভাবিত হইল। ১৮৫১ সনের ২৫শে মে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী গৃহে রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে হিন্দুদের এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতগণ এবং সমাজনেতৃবৃন্দও

ইহাতে যোগদান করেন। যাহারা খ্রীষ্টান বা অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে হিন্দুধর্মে ফিরাইয়া আনার জন্য 'শুদ্ধি'র প্রস্তাব এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আমরা পরবর্তীকালে 'শুদ্ধি' সম্পর্কে নানা কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এ আন্দোলনের সূচনা এই সভাতেই প্রথম দেখা গেল। খ্রীষ্টানীর ঘোর সমর্থক 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' 'শুদ্ধি'র প্রস্তাবে বলিয়াছিলেন যে, এই ব্যাপারটি উনবিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বস্তুতঃ বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এই সভাটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর মত একটি প্রতিষ্ঠান একক ব্যক্তির কর্তৃত্বে অধিকদিন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে নাই। ইহার পক্ষে নানা বিঘ্নও ঐ সময় উপস্থিত হইয়াছিল। পরিচালক হরেকৃষ্ণ ১৮৬৯ সনে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা গঠিত একটি কমিটির উপর সেমিনারীর পরিচালনা-ভার অর্পণ করেন। এই কমিটির আমলেই ইহার জন্য ভূমি ক্রয় ও গৃহ নির্মাণের অর্থ সংগৃহীত হয়। বাংলা সরকারের শিক্ষাবিভাগও বিদ্যালয়টির উন্নতি বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন। সরকারের নিকট হইতে এক কপর্দকও গ্রহণ না করিয়া একটি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয় কিরূপে সুপরিচালিত হইতে পারে, বঙ্গের ছোটলাট স্যার এস্‌লি ইডেন ১৮৭৯ সনে ইহার পুরস্কার বিতরণী সভায় তাহার উল্লেখ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান কলেজ ইহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। ১৯০০ সনে বিদ্যালয়টি ১৮৬১, ২১শ আইন দ্বারা রেজিষ্ট্রীকৃত হয়। আজিও এই বিদ্যালয় সগৌরবে নিজ কার্য করিয়া যাইতেছে। বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর দান অপরিসীম।

হেয়ার স্কুল

কলেজ ষ্ট্রীটের পশ্চিম পার্শ্বে প্রেসিডেন্সী কলেজের হাতার মধ্যে একটি পূর্ণাবয়ব মনুষ্যমূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। পথচারীর দৃষ্টি ইহা কখনও এড়ায় না। পূর্বে প্রতি বৎসর ১লা জুন এই মূর্তির পাদ-দেশে বাংলার মনীষিবৃন্দ সমবেত হইয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেন। আজকাল কি জানি কেন এ রেওয়াজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তথাপি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর মনে এই মূর্তিটি এখনও অত্যন্ত শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

বাঙ্গলাদেশে ডেভিড হেয়ারের নাম কে না শুনিয়াছেন? তাঁহার সমস্ত জীবন ও কর্ম যেন এই মূর্তিটির মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। ইহারই দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার নামে পরিচিত বিদ্যালয়টি বর্তমান। একদিকে যেমন প্রেসিডেন্সী কলেজ, অন্যদিকে তেমনি হেয়ার স্কুল শিক্ষাদান সম্পর্কে এক সময় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। প্রেসিডেন্সী কলেজের পূর্বগামী হিন্দু কলেজের কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। এখন হেয়ার স্কুলের কথা সংক্ষেপে বলি।

এই বিদ্যালয়টির ইতিহাস—এক কথায় বলিতে গেলে বঙ্গের মাধ্যমিক বা সেকেণ্ডারী শিক্ষার অগ্রগতির ইতিহাস। শুধু তাহাই নহে। এখানকার শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে নবযুগের সূচনাও আমরা প্রত্যক্ষ করি। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মাত্র ছয় বৎসর পরে ১৮২৩ সনে এই বিদ্যালয়টির আবির্ভাব। সে-ও এক কাহিনী। কলিকাতা স্কুল সোসাইটি অর্থাভাবে আদর্শ বিদ্যালয়গুলির কর্তৃত্বভার অন্য হস্তে প্রদানে বাধ্য হইলে ইহার নিজস্ব একটি আদর্শ ইংরেজী স্কুলের অভাব অনুভূত হইতে থাকে। তখন সোসাইটির ইউরোপীয়

সম্পাদক ছিলেন ডেভিড হেয়ার। আরপুলিতে, বর্তমান ঠনঠনিয়ার সন্নিকটে তাঁহার একটি নিজস্ব পাঠশালা ছিল, এখানে ইংরেজী, বাঙ্গলা দুইটি বিভাগ ছিল। গোলদীঘির নিকটবর্তী পটলডাঙ্গায় একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ইহার আংশিক ব্যয় বহন করিবেন। সোসাইটি ইহাতে রাজী হইল। এইরূপে হেয়ার স্কুলের জন্ম। তখন ইহা ছিল, সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষাক্ষেত্র। আরপুলি পাঠশালার উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা আসিয়া এখানে ভর্তি হইত এবং ইংরেজী বিশেষভাবে শিক্ষা করিত। নবাগত ছাত্রদের মধ্যে যাহারা বাঙ্গলায় তেমন দক্ষতা লাভ করে নাই বুঝা যাইত, তাহাদিগকে আলাদা করিয়া বাঙ্গলাও পড়ান হইত।

এখান হইতে উৎকৃষ্ট ছাত্রদের শিক্ষা সমাপনান্তে হিন্দু কলেজে পাঠানো হইত। কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ইহার স্কুল সমূহ হইতে কলেজে প্রেরিত ত্রিশজন ছাত্রের বেতন প্রতি মাসেই দিবার ব্যবস্থা ছিল। এ সকল ছাত্রের অধিকাংশই ছিল এই পটল-ডাঙ্গা স্কুলে পড়া। একারণ এ বিদ্যালয়টিকে 'প্রিপেয়ারেটরী স্কুল'ও বলা হইত। তখনও 'স্কুল সোইটির স্কুল' এ নামটিও বেশ প্রচলিত ছিল। হিন্দু কলেজে কলিকাতার ধনী ও সম্পন্ন পরিবারের ছেলেরা পড়িতে আসিত। কিন্তু সোসাইটির স্কুল হইতে প্রেরিত ছাত্রেরাই ছিল পড়াশুনায় সকলের সেরা। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

প্রতিষ্ঠার পর পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যেই বিদ্যালয়টির নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রতি বৎসর এখানকার উৎকৃষ্ট ছাত্রগণ হিন্দু কলেজে প্রেরিত হইতে লাগিল। ১৮২৬ সনের মে মাসে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক হইয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ মেলামেশার সুযোগে ছাত্রেরা যেন এক নূতন আলোর সন্ধান

পাইল। সংস্কারের উপরে যুক্তিকে তাহারা স্থান দিতে লাগিল। আর বিতর্ক সভা স্থাপন, সংবাদপত্র প্রকাশ, ভাল ভাল ইংরেজী বইর বঙ্গানুবাদ—এসব বিষয়েও তাহারা মনোযোগী হইয়া উঠিল। সভা-সমিতিতে এবং পত্রিকাদিতে প্রচলিত রীতির বিরোধী বহু নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হইত। হিন্দু কলেজে এ সকল কার্য পরি-চালনা সম্ভপর হইত না। কারণ অধ্যক্ষগণ অধিকাংশই ছিলেন প্রাচীনপন্থী। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির স্কুলই তাহাদের আলাপ-আলোচনার প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। সোসাইটির অধীন থাকি-লেও এই স্কুলের কর্ণধার তখন ডেভিড হেয়ার। তাঁহার আনুকূল্যে ছাত্রেরা এখানে আসিয়া মিলিত হইত। বিখ্যাত একাডেমিক এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন ডিরোজিও, আর কলেজের ছাত্র-গণ ইহার সভ্য। কিন্তু ডেভিড হেয়ারও তাঁহাদের কম সহায়তা করেন নাই। তিনি নিজে এই সকল বিতর্ক সভায় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের স্বাধীনভাবে সকল বিষয় আলোচনা করিতে উৎসাহ দিতেন। ডিরোজিও কলিকাতার ছাত্রসমাজের নিকট এই বিদ্যালয় ভবনে দর্শন সম্পর্কে এক প্রস্থ বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন। প্রতিদিন দেড়শত হইতে দুইশত ছাত্র ইহাতে উপস্থিত থাকিত।

১৮৩০ সন নাগাদ সোসাইটি প্রেরিত হিন্দু কলেজের ছেলেরা শিক্ষা-দীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করে। এদেশীয়দিগকে উপ-যুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তাঁহাদের দ্বারাই শিক্ষাদান কার্য সম্পন্ন করা সমীচীন—হেয়ার সাহেবের এইরূপ ধারণা ছিল। তিনি সোসা-ইটির স্কুলে প্রধান শিক্ষক হইতে নিম্নতম শিক্ষক পর্যন্ত নব্যশিক্ষিত বাঙালী সন্তানদের নিযুক্ত করিতেন। হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক যৌবনে এই স্কুলের প্রধান ও সহকারী শিক্ষক পদে বৃত হন। শিক্ষা

ও অন্যান্য শুভকর বিষয়সমূহে হেয়ার যুবকদের প্রাণে এক নূতন আশা ও নব প্রেরণার সঞ্চার করেন।

হিন্দু কলেজে বাঙালী যুবকগণ উচ্চতম বিদ্যা অর্জন করিতে লাগিল। কলেজের 'আদিকল্পক' বা 'originator' ছিলেন ডেভিড হেয়ার। তিনি ১৮১৬ সনের গোড়ার দিকে একখানি কাগজে হিন্দু কলেজের পরিকল্পনা রচনা করিয়া খ্যাতনামা হিন্দু প্রধানদের মধ্যে উপস্থাপিত করেন। এই পরিকল্পনা দৃষ্টে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্ট হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় বাঙালীদের সাহায্য করিতে অগ্রণী হন। এ কারণ যখন হেয়ারের পরিবর্তে ঈষ্ট সাহেবকে হিন্দু কলেজের 'আদিকল্পকের সম্মান দিয়া তাঁহার একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের আয়োজন হয়, তখন বাঙ্গলার নব্যশিক্ষিত যুবকগণ এই ত্রুটি স্খালনার্থ কলেজের প্রকৃত 'আদিকল্পক' ডেভিড হেয়ারের একটি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইতে অগ্রসর হইলেন। ইহারই ফল শিল্পী চার্লস পোর্টের আঁকা, বর্তমান হেয়ার স্কুল গৃহে রক্ষিত হেয়ারের তৈলচিত্র। এই স্কুলের ছাত্র সুপ্রসিদ্ধ 'নীলদর্পণ'কার দীনবন্ধু মিত্র 'সুরধুনী কাব্যে' (পৃঃ ১৪৪) চিত্রখানি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"দেয়ালে রয়েছে ওই হেয়ারের ছবি,
তারক দাঁড়ায়ে কাছে জ্ঞানালোক-রবি।"

১৮৩৩ সনে অর্থাভাব হেতু কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কার্যকলাপ খুবই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। হেয়ার আরপুলি পাঠশালা তুলিয়া দিলেন। কিন্তু পটলডাঙ্গাস্থিত ইংরেজী বিদ্যালয়টি নিজের কর্তৃত্বাধীনে রাখিলেন। সোসাইটি সরকারী মাসিক সাহায্য পাঁচশত টাকা এই বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় হইতে থাকে। কিন্তু এই টাকায় সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হইত না। হেয়ার নিজেই অবশিষ্ট অর্থ দিতেন। এই সময় হইতে মৃত্যুকাল (১লা জুন ১৮৪২) পর্যন্ত তিনি বিদ্যালয়টির সম্পূর্ণ দায়িত্বভার নিজে বহন করিতেন। বিদ্যালয়

ঐ সময়ও অবৈতনিক ছিল। নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও হেয়ার কোন বিদেশীয়কে স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত করেন নাই। তৃতীয় দশকের শেষে কিছুকাল দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা, পরবর্তীকালের সুবিখ্যাত ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানকার প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনারায়ণ বসু 'আত্ম-চরিত' এ স্কুলটির এ সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে নানা কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রাবস্থায়ও এখানে বিতর্ক সভা হইত। সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞান পাঠের অধিকতর আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতি সোমবার তাঁহার সম্পাদনায় Club Magazine প্রকাশিত হইত। একান্তভাবে হেয়ারের পরিচালনাধীন থাকায় হেয়ার সাহবের স্কুল বলিয়া ইহা তখন সাধারণের নিকট পরিচিত হয়।

স্কুলের শিক্ষা কতটা উন্নত ধরণের হইত আর একটি বিষয় হইতেও তাহা বুঝা যায়। বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করেন যে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার পূর্বেকার সকল ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া একটি নূতন মেডিক্যাল কলেজ কলিকাতায় অবিলম্বে স্থাপন করা হইবে, আর তাহাতে যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে ইংরেজীর মাধ্যমে। প্রবেশার্থী ছাত্রদের প্রাথমিক পরীক্ষা লওয়া হইল। এই সব ছাত্রের মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুলের বহু ছাত্র ছিল। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যেও তাহারা স্থান পাইল।

হেয়ারের মৃত্যুর পর বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার শিক্ষা-সমাজ গ্রহণ করেন। তখন হইতে ইহা সরকারী আওতায় আসে এবং তিন-চারি বৎসরের মধ্যে একটি পুরাপুরি বৈতনিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বর্তমানে গোলদীঘির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে কর্পোরেশনের ডিস্ট্রিক্ট অফিস স্থাপিত আছে। ঐখানে পূর্বে রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায়ের

একখানি বাড়ী ছিল। এই বাড়ীতে প্রায় কুড়ি বৎসর যাবৎ এই স্কুলটি অবস্থিত ছিল। বেথুন স্কুল-ভবন তৈয়ারীর পূর্বে এই স্থানটিও এখানে কিছুকাল বসিত। পরে এল্ এম্ এস কলেজ এখানে আরম্ভ হয়।

হেয়ার সাহেবের স্কুল—শিক্ষা-সমাজ কর্তৃত্বভার গ্রহণের পর 'হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল' বা শুধু 'ব্রাঞ্চ স্কুল' নামে ক্রমে আখ্যাত হইতে থাকে। ১৮৪৩ সনে রাজা নৃসিংহচন্দ্রের নির্দেশমত কর্তৃপক্ষ স্কুলটি স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হন। ঐ সময় বর্তমান ভবানী দত্ত লেন ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের হাতার মধ্যে 'বাংলা পাঠশালা' নামে হিন্দু কলেজের অধীন একটি বঙ্গবিদ্যালয় ছিল। এখানে সাময়িকভাবে হেযাব সাহেবের স্কুল উঠিয়া আসে, বাংলা পাঠশালা হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের আবাসগৃহের নিম্নতলে স্থানান্তরিত হয়। এই বাড়ীটির মালিক ছিলেন রামকমল সেন। প্রসিদ্ধ এলবার্ট হলটি এই বাড়ীতে অবস্থিত।

বাংলা পাঠশালা এবং ঐ চত্বর তখন হিন্দু কলেজের সম্পত্তি ছিল। কলেজের নিকট হইতে কতক জায়গা লইয়া বাংলা পাঠশালার দক্ষিণ দিকে, বর্তমানে প্রেসিডেন্সী কলেজেব বসায়নাগার যেখানে আছে সেখানে হেয়ার সাহেবের স্কুলের (ব্রাঞ্চ স্কুল) নূতন বাড়ী নির্মিত হয় ও ইহা এখানে উঠিয়া আসে। ১৮৪৭ সনে আবার দুইটি প্রকোষ্ঠ ইহার সংলগ্ন করিয়া নির্মিত হয়। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ এতই বাড়িয়া যায় যে, ইহাতেও স্থান সঙ্কুলান কঠিন হইয়া উঠিল। এই স্থল হইতে বর্তমান ভবনে হেয়ার স্কুল উঠিয়া আসে ১৮৭২ সনে।

হেয়ার স্কুলের নাম পরিবর্তন যে কতবার হইয়াছে তাহার কতকটা পরিচয় আমরা পাইয়াছি। ১৮৫৪ সনে হিন্দু কলেজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু স্কুলের পত্তন হয়।

তদবধি উক্ত স্কুল কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল বলিয়া আখ্যাত হইতে থাকে। এই সময় ১৮৫৪ সনের জুলাই মাসে এই বিদ্যালয়েরই প্রাক্তন শিক্ষক প্যারীচরণ সরকার ইহার প্রধান শিক্ষক হইয়া আসেন। তিনি ১৮৬৭ সন পর্যন্ত ইহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে মধ্যে মধ্যে সাময়িকভাবে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপকেরও কার্য করিতেন। তাঁহার কর্মকালের শেষ বৎসরে, তাঁহারই প্রস্তাব অনুসারে সরকার এই বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করিয়া হেয়ার স্কুল নামকরণ করেন। সেই হইতে ইহা হেয়ার স্কুল নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

এই বিদ্যালয়ে পূর্বে মাত্র হিন্দু ছেলেরাই পড়িতে পাইত। ১৮৫২ সনের নভেম্বর মাস হইতে ইহার দ্বার জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের নিকটই উন্মুক্ত হয়। ইহার পর হইতে স্কুলটি সকল শ্রেণীরই একটি মিলন-ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেশবচন্দ্র সেন প্রথম যৌবনে সমবয়সী বন্ধুদের লইয়া সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করিতেন। এই স্কুলে ১৮৫৮ সন নাগাদ 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে একটি সভা তিনি স্থাপন করেন। সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ে এখানে আলোচনা হইত। তবে ধর্মবিষয়ক আলোচনাও একেবারে বাদ যাইত না। পাদ্রী লং, পাদ্রী ড্যাল, পাদ্রী বার্‌ন্স এই সভায় যোগ দিয়া যুবকদের উৎসাহিত করিতেন। এই সভায় একটি প্রবন্ধ পাঠের কথা ১৮৫৮ সনের ১২ আগষ্ট তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এক পত্রের মধ্যে পাইতেছি। পত্রখানি একটু কৌতুককর বলিয়া দুই-এক কথা এখানে বলি। এখানে পঠিত একটি প্রবন্ধ 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়। পত্রিকা-সম্পাদক ইহা ফেরত দেন। নিজ কাগজে এইরূপ মন্তব্যও করেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট ব্যাকরণের ভ্রমযুক্ত একটি প্রবন্ধ

পাঠাইয়াছেন। ইহার জবাবে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির একজন সভ্য লেখেন, এই উক্তি সর্বৈব মিথ্যা। ঐ বৎসরই (১৮৫৮) সর্বপ্রথম দুইজন মাত্র যুবক গ্র্যাজুয়েট হইয়াছেন, প্রবন্ধলেখক তৃতীয় ব্যক্তি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৮৫৭) পূর্বে এবং পরেও এই স্কুলের বিস্তর ছাত্র সরকারী বৃত্তি লাভ করে। প্রথম সরকারী বৃত্তি পরীক্ষায় ১৮৪১-৪২ সনে প্রথম এখানকারই প্রাক্তন ছাত্র প্যারীচরণ সরকার প্রথম স্থান অধিকার করেন। হেয়ার স্কুল শিক্ষাদান বিষয়ে সবিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিল। বাংলার বহু বিখ্যাত মনীষী এখানে শিক্ষালাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন এবং স্বদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ্, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিক অগণিত। কাহারও কাহারও নাম ইতিপূর্বে আমরা পাইয়াছি। মহেন্দ্রলাল সরকার, শিশিরকুমার ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, সারদাচরণ মিত্র, বিহারীলাল গুপ্ত, কৃষ্ণবিহারী সেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—আর কত জনের নাম করিব? বাংলা তথা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সাধনার ইতিহাসে হেয়ার স্কুলের স্থান অতি উচ্চে।

ডাফ সাহেবের স্কুল ঃ স্কটিশ চার্চ কলেজ

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত কলিকাতার অভ্যন্তরস্থ কতকগুলি শিক্ষালয়ও যে সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, পূর্ববর্তী কোন কোন নিবন্ধ হইতে আমরা তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। এইরূপ আরো কয়েকটি প্রাচীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কথা পর পর বলিব।

এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্কটিশ চার্চ কলেজ প্রাচীনতম। এ কলেজটির নামও বহুবার পরিবর্তিত হইয়াছে। আর এই নাম পরিবর্তনের মধ্যে ইহার সত্যকার ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। বিদ্যালয়টি প্রথম সামান্য ইংরেজী শিক্ষার পাঠশালারূপে স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ্ স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। তিনি তথাকার সেণ্ট এণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র-রূপে উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এখানে খ্রীষ্টতত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি চার্চ অফ্ স্কটল্যাণ্ডের অধীনে মিশনারী পদে বৃত হইয়া ১৮৩০ সনের ২৭শে মে কলিকাতায় পৌঁছলেন। এই মিশনারী প্রতিষ্ঠানটির পুরা নাম 'জেনারেল এসেম্বলী অফ্ দি চার্চ অফ্ স্কটল্যাণ্ড'। ইহা হইতেই ডাফ্-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি প্রায় আরম্ভ হইতেই জেনারেল এসেম্বলিজ্ ইনষ্টিটিউশন নামে অভিহিত হয়। জনসাধারণের নিকট ইহা ডাফ সাহেবের স্কুল বলিয়া পরিচিত হইতে থাকে।

বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার কাহিনীও বড়ই বিচিত্র। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সাধারণ হিন্দু খুবই ভয় করিয়া চলিত, পাছে তাহাদের ছেলেদের উহারা খ্রীষ্টান করিয়া ফেলে। ডাফ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের

বাসনা প্রকাশ করিয়া প্রথমে তেমন সহানুভূতি পাইলেন না, বাড়ী সংগ্রহ করাও তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। অবশেষে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার এই কার্যে সহায় হইলেন। তিনিও এক সময়ে পাদ্রীদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন, কিন্তু প্রথমতঃ ইংরেজী শিক্ষা এবং দ্বিতীয়তঃ বাইবেল পাঠ করিয়া খ্রীষ্টানধর্মের মূল কথাগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া—এ দুইয়েরই প্রয়োজনীয়তা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এ কারণ চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ী —যাহা ব্রহ্ম সভা পূর্বে ভাড়া লইয়াছিলেন, তিনি ডাফ সাহেবের স্কুলের জন্য ঠিক করিয়া দেন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই উক্ত ভবনে বিনা আড়ম্বরে পাঁচজন মাত্র ছাত্র লইয়া বিদ্যালয় খোলা হইল। এটি ছিল প্রথমাবধি অবৈতনিক। রামমোহন এই দিন উপস্থিত থাকিয়া সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ছাত্রগণকে কিছু উপদেশ দিলেন। তিনি বলেন যে, বাইবেল পাঠকে অযথা উপেক্ষা বা ভয় করিলে চলিবে না। ইহাতে কি কি বিষয় লিপিবদ্ধ আছে তাহা আমাদের জানা আবশ্যক। খ্রীষ্টানেরা হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ বা মুসলমানের কোরাণ পাঠে রত আছেন। উদাহরণস্বরূপ ডাঃ হোরেস হেমান উইলসনের নাম তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু তাহাতে তো তাঁহাদের জাতি নষ্ট হয় নাই। বাইবেল পাঠেই বা কেন হিন্দুদের জাতি যাইবে? রামমোহনের উক্তির যাথার্থ উপস্থিত ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করিলেন।

ডাফ সানন্দে শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে ছাত্রদের সামান্য ইংরেজী অক্ষর-জ্ঞান শিখাইতেও পশ্চাৎপদ হইতে পারেন না। দ্রুত অক্ষর ও শব্দ শিক্ষাদানের একটি নূতন উপায় তিনি উদ্ভাবন করিলেন। যেমন 'ox' শব্দটির 'O' এবং 'X' অক্ষর দুইটি পর পর লিখন ও পঠন শিখাইয়া পরে একত্রে উচ্চারণ শিক্ষা দিলেন

এবং আমরা সচরাচর যে জন্তুটি দেখি সেই বৃষ বা বলদই যে ইহার অর্থ, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। ছাত্রগণ সাগ্রহে অক্ষর এবং শব্দ-জ্ঞান অল্প সময়ে লাভ করিতে লাগিল। তাহাদের পাঠোন্নতি এত দ্রুত হইতে লাগিল যে, বিদ্যালয়ের সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, ছাত্র-সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। এক বৎসর পরে পাদ্রী কেরীর সভাপতিত্বে 'ফ্রিমেসন হলে' এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের যে পরীক্ষা গৃহীত হয় তাহাতে তাহাদের পাঠোৎকর্ষ দেখিয়া সকলে অবাক হন। ইংরেজী শব্দ এবং বাক্য পাঠ ও অর্থ করা বাদে ইংরেজী ব্যাকরণ, ভূগোল, গণিত প্রভৃতিও ছাত্রেরা ভাল করিয়া শিখিয়াছিল। ডাফ স্বয়ং বাঙলা ভাষা শিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। বাঙলা পাঠও শিক্ষণীয় বিষয়গুলির অঙ্গীভূত হয়।

পাদ্রী ডাফ এবং ডিয়ালট্রী ১৮৩২ সন নাগাদ হিন্দু যুবকদের নিকট খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়া হিন্দু সমাজের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারে ডাফের সাহায্য গ্রহণে প্রগতিশীল হিন্দুরা কুণ্ঠিত হন নাই। রামমোহন-সঙ্গীরা রায় কালীনাথ চৌধুরী ও রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী ডাফকে দিয়া টাকীতে ১৮৩২ সনের ১৪ই জুন একটি অবৈতনিক ইংরেজী স্কুল খুলিলেন। এখানে ইংরেজী বাদে বাঙলা, সংস্কৃত ও ফার্সী পঠন-পাঠনেরও ব্যবস্থা হয়। ডাফের শিক্ষাদান পদ্ধতিও ক্রমে মফঃস্বলে বিস্তারলাভ করিল।

কলিকাতার মূল বিদ্যালয়টি অনতিবিলম্বে ইংরেজী শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। বর্তমানে যেখানে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী অবস্থিত সেখানে ইহারই হাতার মধ্যে এখনও একটি পুরাতন বাড়ীর অবশেষ বিদ্যমান আছে। ইহার মালিক ছিলেন গোরাচাঁদ বসাক। হিন্দু কলেজ প্রথমে এই বাড়ীতেই স্থিত ছিল। ডাফের স্কুলটিও কিছুকালের জন্য এখানে স্থানান্তরিত হয়। পরে, হেদুয়ার

পূর্ব পার্শ্বে ইহার নিজস্ব স্বতন্ত্র বাটী নির্মিত হইলে ১৮৩৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তথায় চলিয়া যায়। সেই হইতে এই বাটীতেই ইহা অবস্থিত আছে।

এইমাত্র বলিয়াছি, ইংরেজী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়টির নাম বেশ ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৩৪ সনে লর্ড বেণ্টিঙ্ক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এদেশীয়দিগকে চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইবার উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান ও পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সভ্যগণ বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গমন করিয়া সে সব স্কুলের শিক্ষাদান-রীতি পর্যবেক্ষণ করেন। ডাফের বিদ্যালয়—জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশনে তাঁহারা যান এবং সেখানকার ছাত্রদের ইংরেজীতে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হন। ইংরেজীর মাধ্যমে যে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, সভ্যগণ এখানকার শিক্ষোৎকর্ষ দৃষ্টে তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারেন। ডাফ তাঁহাদিগকে ইহার সপক্ষে পরামর্শ দিলেন। বড়লাট বেণ্টিঙ্ক এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। এইভাবে সাধারণ শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজী ভাষা ধার্য হইবার পূর্বেই চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার বাহন ইংরেজী নির্ধারিত হইয়াছিল।

১৮৩৫ সনে ইংরেজী সাধারণ শিক্ষার বাহন ধার্য হইলে জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশন একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইল। মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ছাত্রদলের মধ্যে বহু ছাত্র এই বিদ্যালয় হইতে প্রেরিত হয়। ডাফ ১৮৩৪ সনের জুলাই হইতে '৪০ সন পর্যন্ত এদেশে ছিলেন না। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার যোগ্য সহকর্মীরা বিদ্যালয়টি যথারীতি পরিচালনা করিতেন। ১৮৪১ সনে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় ইহার সঙ্গে যোগ দেন। ১৮৪৩ সনে স্কটল্যাণ্ডে চার্চ অফ্ স্কটল্যাণ্ডের সভ্যদের মধ্যে বিভেদ উপস্থিত হয় এবং একদল আলাদা হইয়া ফ্রি চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ডাফ শেষোক্ত দলভুক্ত হইলেন। কলিকাতাস্থ

এই বিদ্যালয়টির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া তিনি ফ্রি চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড ইন্‌ষ্টিটিউশন নামে আর একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৫৬ সনে নিমতলা ষ্ট্রীটে নিজস্ব বাড়ী তৈরী হইলে ইহা সেখানে উঠিয়া যায়। ডাফের মৃত্যুর পর হইতে ইহা 'ডাফ কলেজ' নামে আখ্যাত হইতে থাকে।

ডাফ সাহেব তৃতীয় দশকেই খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারে অবহিত হইয়াছিলেন বলিয়াছি। স্বদেশ হইতে ফিরিয়া চতুর্থ দশকের প্রথম হইতে তিনি এ কার্যে অধিকতর তৎপর হন। তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে বিশেষ প্ররোচনা দেওয়া হইত। উমেশচন্দ্র সরকার নামক একটি ছাত্রের সস্ত্রীক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ লইয়া সে যুগে হিন্দু সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। আর ইহার ফলে খ্রীষ্টানীর স্রোত অনেকটা প্রশমিত হয়।

কিন্তু পাদ্রী ডাফের শিক্ষা-বিস্তার কার্যও সমানে চলিয়াছিল। তিনি নিজস্ব এই স্বতন্ত্র বিদ্যালয়টিকে পূর্ব বিদ্যালয়ের আদর্শেই পরিচালিত করিতে লাগিলেন এবং কোন কোন স্থলে ইহার শাখাও প্রতিষ্ঠিত হইল। হুগলীর অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামস্থিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ১৯৪৮ সনে উঠিয়া গেলে সেখানে ডাফ একটি শাখা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি পুনরায় বিলাত যান। সেখানে ১৮৫৩ সনে পার্লামেণ্টারী কমিটীর নিকট শিক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য দেন। ১৮৫৪ সনের শিক্ষা বিষয়ক ডেস্‌প্যাচে তাঁহার অনেকগুলি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ব্যাপারেও তাঁহার প্রয়াস স্মরণীয়। ভগ্নস্বাস্থ্য হেতু তিনি ইহার ভাইস্‌-চ্যান্সেলারের গুরু দায়িত্বভার-গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন। কলেজের উচ্চতম বিভাগে শিক্ষণীয় বিষয়াদি স্থিরীকরণেও তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করেন। বেথুন সোসাইটির সভাপতি রূপে (১৮৫৯-৬৩) ভারতবাসীর মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য,

বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যমূলক আলোচনার প্রবর্তনে উদ্যোগী হন। পাদ্রী ডাফ ১৮৬৩ সনে ভারতবর্ষ হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করেন।

ভারত-ত্যাগের পরও তৎ-প্রতিষ্ঠিত দুইটি বিদ্যালয়ই কলিকাতার উচ্চতম শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের আগার হইয়া উঠে। ক্রমে স্কটল্যাণ্ডে দুইটি চার্চের মধ্যে অন্ততঃ শিক্ষা বিষয়ে ভারতবর্ষে একযোগে কাজ করিবার অভিপ্রায় জাগরিত হয়। এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার ফলে, ১৯০৮ সনের ১লা জুন হইতে জেনারেল এসেম্ব্লিজ্ ইন্ষ্টিটিউশন ও ডাফ কলেজ একত্র হইয়া 'স্কটিশ চার্চেস কলেজ' নাম ধারণ করে। এই দুই দল ১৯২৯ সনে এক হইয়া যায়। এ কারণ এই সনেরই অক্টোবর মাসে উক্ত নামের পরিবর্তে 'স্কটিস চার্চ কলেজ' নামকরণ হয়। ইহার পর বৎসর, বিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে মহাসমারোহে উৎসবও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৯০৮ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। এখনও এখানে এম-এ ও এম-এসসি শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি হইতে পারে। মহিলাদের শিক্ষণ-বিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত কলেজের অন্তর্গত একটি বি-টি বিভাগ রহিয়াছে। ইতিপূর্বে 'মাধ্যমিক' পাঠশালা প্রসঙ্গে হেদুয়ার পূর্ব-দক্ষিণ দিকে যে শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা স্কটিশ চার্চ কলেজেরই এই শিক্ষয়িত্রী-শিক্ষণ বিভাগ। এই বিদ্যালয়-গৃহটী এখনও চার্চ অফ্ ইণ্ডিয়া, বার্মা ও সিলোনের সম্পত্তি। বিভিন্ন অধ্যক্ষ ও শিক্ষাব্রতীদের নামে স্কটিশ চার্চ কলেজের যে-সব ছাত্রাবাস আছে তাহা সাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

গত সোয়াশ' বৎসরের মধ্যে এই বিদ্যালয় হইতে বহু সহস্র

ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এখানকার শিক্ষায় অনেকগুলি ছাত্র খৃষ্টধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়া ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমাজসেবায় তাঁহারাও বিশেষ তৎপর হইয়া উঠেন, একথা আজ আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। রেভাঃ লালবিহারী দে জেনারেল এসেম্বলিজ ইনষ্টিটিউশনের প্রথম যুগের ছাত্র, এবং ডাফের শিক্ষাগুণে খৃষ্টধর্মও অবলম্বন করেন, কিন্তু তাঁহার মত সমাজসেবক ক'জন ছিলেন? শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক ও সাহিত্যসেবী হিসাবে স্বদেশের সেবায় তিনি জীবন সমর্পণ করেন। তাঁহার 'ফোক টেল্‌স অফ বেঙ্গল' এবং 'বেঙ্গল পেজ্যাণ্ট লাইফ' এর মত বাঙলার পল্লী-সংস্কৃতি এবং জনসাধারণের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার একটি নিখুঁত চিত্র এখনও কমই মিলে। এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র দ্বারকানাথ বসু লণ্ডনে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থী প্রথম চারিজন ছাত্রের অন্যতম। তাঁহার কৃতিত্বও স্মরণীয়। এতদ্ব্যতীত এই বিদ্যালয়ের আরও বহু ছাত্র অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল কীর্তিমান ছাত্রের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। নরেন্দ্রনাথ দত্ত—এই নামে তিনি জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে এফ-এ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার মত মেধাবী ও নানা গুণান্বিত ছাত্র এখানে ছিল বিরল। তিনি ভারতবাসীর হৃদয়ে যে নব-প্রেরণা আনিয়া দিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে এতটুকুও দ্বিমত নাই। এই বিদ্যালয়ের উদার শিক্ষা তাঁহার মনোজগতে বিস্তর রসদ জোগাইয়াছিল, নিঃসন্দেহ। তাঁহার পরই উল্লেখ করিতে হয় উপাধ্যায় ব্রহ্ম-বান্ধবকে। তিনিও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। 'সন্ধ্যা'র সম্পাদক এবং স্বদেশী আন্দোলনে অগ্রগামী দলের অন্যতম নেতারূপে তাঁহার কীর্তি স্মরণীয় হইয়া আছে। তিনি ছিলেন স্বামীজীর সহপাঠী। স্বামীজীর আর একজন

সতীর্থ ছিলেন দার্শনিক ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে এই কলেজের অন্যতম কীর্তিমান ছাত্র। শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান নানা বিভাগেই এখানকার বহু ছাত্র খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব হইতে এখানে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় বহু নারীও এখানে উচ্চশিক্ষা লাভে সমর্থ হইতেছেন।

বিদ্যালয়ের ত্যাগী শিক্ষাব্রতীদের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। স্কটলণ্ডবাসী উচ্চশিক্ষিত মিশনারীগণ প্রতিষ্ঠাবধি এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীভুক্ত ছিলেন। বহু আদর্শ বাঙালী শিক্ষাব্রতীও এখানে অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত গণিতশাস্ত্রবিদ্ অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে'র নাম এখনও অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। সে যুগের অন্যতম রাষ্ট্রীয় নেতা শিক্ষাবিদ্ বেভাঃ কালী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে অধ্যাপনা করিতেন। ঐতিহাসিক অধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও এখানকার একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই বিদ্যাগারটির দান অপরিমেয়।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ

"প্রকাণ্ড প্রাসাদ উচ্চ ঘর হাঁসপাতাল,
ছাদে উঠে ছোঁয়া যায় আকাশের গাল,
সুদূর সোপান থাম ঘর পরিকর,
নির্মল করেছে যেন ক্ষোদাইয়ে ভূধর।"

যে হাসপাতাল ভবনটিকে লক্ষ্য করিয়া "সুরধুনী কাব্যে" (পরিষৎ সং, পৃঃ ১৩৯) এই উক্তি করা হইয়াছে তাহা আর কিছুই নহে, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের জেনারাল হাসপাতাল। আধুনিককালে কলেজের বিরাট সৌধরাজি এবং চিকিৎসাদির বিপুল আয়োজন এই হাসপাতাল-ভবনটিকেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। যাঁহারা একবার কলেজটির হাতার মধ্যে—অবশ্য দর্শকরূপে ঘুরিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহার বিপুলতা উপলব্ধি করিতে পারেন। ইহা শুধু আকারেই বড় নহে, ইহার খ্যাতিও প্রচুর, দেশ-বিদেশে ইহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাংলা দেশে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যাও চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যান্য শাখা, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান প্রভৃতির অনুশীলন এই কলেজেই প্রথম আরম্ভ হয় বলা চলে। কাজেই আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইহার দান অফুরন্ত। উক্ত জেনারাল হাসপাতাল ভবনটির ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে। নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইতে চারি বৎসর সময় লাগে। ১৮৫২ সনের ১লা ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ইহার দ্বার উন্মোচিত হয়। তবে পূর্ববর্তী ১লা মার্চ হইতেই এখানে

রোগীদের ভর্তি করা হইতে থাকে। তখনকার দিনে 'জ্বর হাসপাতাল' বলিয়া পরিচিত হইলেও, বিভিন্ন রোগাক্রান্ত নরনারীর জন্যই ইহার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। এই হাসপাতাল ভবনটি নির্মাণের কাহিনীও বড় বিচিত্র।

কিন্তু ইহার পূর্বে কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দু-চার কথা বলি। এ কলেজটির নাম প্রতিষ্ঠাবধি 'দি মেডিক্যাল কলেজ অফ্ বেঙ্গল'। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ নামেই আমাদের নিকট পরিচিত। ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা বরাবর প্রচলিত ছিল। অন্য নানা বিষয়ের মত ইহারও অবনতি ঘটে, রাজ্যে অরাজকতার সময়ে। ইংরেজ এদেশে অধিক সংখ্যায় আসিতে আরম্ভ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে বহু চিকিৎসকও আসিতে থাকেন। তখনকার দিনে প্রাচ্য-বিদ্যা ও বিজ্ঞানচর্চায় এই চিকিৎসা ব্যবসায়ীরাই প্রধানতঃ অগ্রণী হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায়শঃ সামরিক, নাবিক ও অন্যান্য সরকারী বিভাগের জন্য বিলাত হইতে কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আসিতেন, কিন্তু ক্রমে এদেশীয়দের পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা বিদ্যা শিখাইবার প্রয়োজন অনুভূত হইল।

কিছুকাল পরে ১৮২৪ সনের অক্টোবর মাসে সরকার কলিকাতায় নেটিভ মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশন নামে একটি বিদ্যালয় খুলেন। এখানকার শিক্ষার মাধ্যম ছিল হিন্দুস্থানী। এই ভাষায় চিকিৎসা-বিদ্যার পুস্তকাদির অনুবাদও প্রয়োজনবশে সুরু হইল। বলাবাহুল্য, তখনকার দিনের ইউরোপীয়েরা প্রাচ্যের পুরাতন ও আধুনিক ভাষাসমূহ যত্ন সহকারে শিখিয়া লইতেন। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ডাঃ জন টাইটলার এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার পর ১৮২৬ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ও কলিকাতা মাদ্রাসায় সংস্কৃত ও আরবি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। শেষোক্ত কলেজে

হিন্দুস্থানী পুস্তকাদিও পড়ানো চলিত। সংস্কৃত কলেজে এই শ্রেণীকে বৈদ্যক শ্রেণী বলা হইত। ১৮৩১ সনের আগষ্ট মাসে ছেলেদের ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য কলেজসংলগ্ন একটি হাসপাতাল খোলা হয়। এই কলেজে ডাঃ জন গ্রাণ্ট ইংরেজীতেও চিকিৎসা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। সুবিখ্যাত মধুসূদন গুপ্ত ছিলেন বৈদ্যক শ্রেণীর অধ্যাপক।

ক্রমে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে যুবকগণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিল। ইংরেজীর মাধ্যমে চিকিৎসা শাস্ত্র বাঙ্গালী সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব কিনা এ কথাও কর্তৃপক্ষের মনে স্বতঃই উদয় হইয়া থাকিবে। বড়লাট বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৩ সনে পাঁচজন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন, উদ্দেশ্য—তৎকালীন চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থার অনুসন্ধান এবং ইহার উন্নতি বিষয়ে মতামত প্রকাশ। এই পাঁচজন সদস্যের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালী ছিলেন দেওয়ান রামকমল সেন। তিনি ধর্ম সম্বন্ধে প্রাচীনপন্থী হইলেও, বিদ্যা বিষয়ে খুব উদার মত পোষণ করিতেন। এই সদস্যগণ ১৮৩৪, ২০শে অক্টোবর চিকিৎসা-বিদ্যার অবস্থা ও উন্নতি সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট দেন। এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ সনের ২৮শে জানুয়ারী একটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ জারি করেন। ইহার মর্ম হইল এই যে, চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার প্রচলিত যাবতীয় ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া এই উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে নূতন করিয়া একটি কলেজ স্থাপিত হইবে এবং ইহার শিক্ষার বাহন হইবে ইংরেজী ভাষা। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন করার সিদ্ধান্ত পরবর্তী ৭ই মার্চ গৃহীত হইলেও পূর্ব হইতেই কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে অনেকটা স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন। ইহাও স্থির হয় যে, সকল সম্প্রদায়ের জন্যই কলেজের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে।

কলেজের সূচনার প্রারম্ভিক আয়োজন অতি দ্রুত সম্পন্ন হইল। কমিটির অন্যতম সদস্য ডাঃ মাউণ্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলি ১৮৩৫,

১লা মার্চ তারিখে প্রস্তাবিত কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (ও পরে প্রিন্সিপ্যাল), ৯ই ফেব্রুয়ারি ডাঃ হেনরি হারি গুডিব ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা ও শল্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং ১৭ই মার্চ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত এই বিষয়ে গুডিবের সহকারী নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর ছাত্র-সংগ্রহের ব্যাপার। এ বিষয়ে ডেভিড হেয়ারের সহায়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৫, ১লা মে দিবসে কলেজে প্রবেশার্থী ছাত্রদের পরীক্ষা গৃহীত হইল। হিন্দু কলেজ, হেয়ার সাহেবের স্কুল, পাদ্রী ডাফের জেনারেল এসেম্বলিজ্ ইনষ্টিটিউশন প্রভৃতি সেযুগের ইংরেজী শিক্ষার কেন্দ্রগুলি হইতে ছাত্ররা আসিল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পঞ্চাশজন ছাত্র লইয়া ১৮৩৫, ১লা জুন হিন্দু তথা সংস্কৃত কলেজের উত্তর দিকে একটি পরিত্যক্ত পুরনো বাড়ীতে মেডিক্যাল কলেজের কার্য আরম্ভ হইল। এইদিনে ডাঃ ব্রাম্‌লি যে বক্তৃতা দেন তাহা শুনিবার জন্য কলিকাতার দেশী-বিদেশী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই বক্তৃতাটি এতই প্রসিদ্ধিলাভ করে যে ইহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়, বাংলায়ও ইহা অনূদিত হইয়াছিল। কলেজ প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরে ডাঃ নাথানিয়েল ওয়ালিচ উদ্ভিদ্ বিদ্যার এবং ডাঃ উইলিয়ম ব্রুক ওয়াগ্‌নেসী রসায়ন ও ভেষজ বিদ্যার অধ্যাপক হইয়া আসেন।

পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি প্রধান অঙ্গ হইল শব-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা। প্রচলিত সংস্কার ছিল ইহার বিরোধী। ১৮৩৬ সনের ৩১শে মার্চ অধ্যক্ষ ব্রামলি একটি বক্তৃতা দ্বারা এই বিষয়ের শিক্ষাদান সুরু করেন। এই দিনে বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া বহু পদস্থ সরকারী ও বেসরকারী ইউরোপীয় এবং এদেশীয় প্রধান ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু শব-ব্যবচ্ছেদ কার্য প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৮৩৬ সনের ২৮শে অক্টোবর দিবসে। ডাঃ গুডিবের নেতৃত্বে উমাচরণ শেঠ, রাজকৃষ্ণ

দে, দ্বারকানাথ গুপ্ত এবং নবীনচন্দ্র মিত্র প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করেন। অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত শবে প্রথম অস্ত্র বসাইয়া ছাত্রদের অনুরূপ কার্য করিতে অনুরোধ জানান। এদেশে 'রেনেসাঁস' বা নবজাগৃতির কথা বলিতে গিয়া ঐতিহাসিকেরা এই দিনটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এ দিনেও বহু গণ্যমান্য দেশী-বিদেশী প্রধানেরা উপস্থিত থাকিয়া শব-ব্যবচ্ছেদ কার্যে ছেলেদের উৎসাহিত করিয়াছিলেন। প্রাচীনপন্থী ভারতবাসীরাও যে নবতম বিদ্যা আয়ত্ত করিতে কখনও পরাঙ্মুখ নন্, এই দিবসে রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির উপস্থিতি হইতে তাহা বুঝা যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৩৬, মার্চ মাসেই বিভিন্ন বিভাগের উৎকৃষ্ট ছাত্রদের পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রতিবৎসর দুই হাজার টাকা করিয়া পর পর তিন বৎসর ছয় হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। রামগোপাল ঘোষ, রুস্তমজী কাওয়াসজী, রামকমল সেন প্রভৃতি দাতাদের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিবার মত।

অধ্যক্ষ ব্রামলির মৃত্যুর (১৯শে জানুয়ারী ১৮৩৭) পর কলেজের অধ্যক্ষদের লইয়া একটি কৌন্সিল বা পরিচালক সভা গঠিত হয় এবং তাঁহার সেক্রেটারী বা সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন ডেভিড হেয়ার। হেয়ার ১৮৪১ সনে এই পদ ত্যাগ করিলে কলেজের নূতন অধ্যাপক ডাঃ এফ, জে, মৌএট এই পদ লাভ করেন। শিক্ষা-সমাজেরও সেক্রেটারীরূপে তিনি এদেশে শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করেন। কলেজের বহুবিধ উন্নতির মূলে তাঁহার হস্ত বিরাজিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পরিকল্পনাও ছিল তাঁহারই। কলেজের প্রথম উপাধি পরীক্ষা আরম্ভ হয় ১৮৩৮ সনের ৩০শে অক্টোবর। সাত দিন ধরিয়া এই পরীক্ষা গৃহীত হয়। একাদিক্রমে সাড়ে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া এগারজন ছাত্র এই পরীক্ষা দেন। তাঁহাদের মধ্যে উপরিলিখিত প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদকারী চারজন ছাত্রই অতি

কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। সরকার তাঁহাদিগকে অবিলম্বে কর্মে নিয়োগ করিলেন।

মেডিক্যাল কলেজে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান প্রচেষ্টা বিশেষ স্মরণীয়, কারণ ইহার জন্য বিজ্ঞানের কঠিন কঠিন বিষয়ের পুস্তক স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা আবশ্যক হইল। ১৮৩৯ সনে কলেজের অন্তর্গত হিন্দুস্থানী বিভাগ এবং ১৮৫২ সনে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল সামরিক কেন্দ্রে—তথা উত্তর ভারতে দেশীয় ডাক্তার দ্বারা দেশীয় সৈন্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আর দ্বিতীয়টি খোলা হইযাছিল বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষতঃ ব্যাধিপ্রধান অঞ্চলে দেশীয় ডাক্তার নিয়োগ। মফঃস্বলের হাসপাতালে যে 'নেটিভ ডাক্তার' থাকিতেন তাঁহারা এই বিভাগ হইতে উত্তীর্ণ। হিন্দুস্থানী এবং বাংলায় চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের ব্যবস্থা হওয়ায় এই দুই ভাষায় রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ভেষজবিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে প্রামাণিক ইংরেজী পুস্তকাদি অনূদিত হইতে লাগিল। বিজ্ঞানের অনুশীলনে বাংলা সাহিত্য গত শতাব্দীর শেষার্ধে যে এত উন্নত হইয়াছিল তাহার মূলে ছিল মেডিক্যাল কলেজের এই বাংলা বিভাগের প্রেরণা।

মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা আর একটি বিষয়ে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর, অধ্যাপক গুডিব ও মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের অর্থে ১৮৪৫ সনে কলেজের চারিজন ছাত্র উচ্চতম চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নার্থ বিলাতে প্রেরিত হন। তাঁহাদের নাম—ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল, দ্বারিকানাথ বসু, ও সূর্যকুমার (গুডিব) চক্রবর্তী। তাঁহারা তিন চারি বৎসরের মধ্যে বিলাতে চিকিৎসাবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা ওখানকার উৎকৃষ্টতম ইংরেজ

ছাত্রদের হারাইয়া দেন। বাঙ্গালী ছাত্রদের প্রশংসা ইংরেজ অধ্যাপক ও পরিক্ষকমণ্ডলীর মুখে আর ধরে না। তখন বাঙ্গালীদের রোখে কে? যখন বিলাতে আই, এম, এস পরীক্ষা ১৮৫৫ সনে প্রথম গৃহীত হয় তখন সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী কর্ম ত্যাগ করিয়া ইহার অন্যতম পরীক্ষার্থী হইয়া যান। উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁহাকে তখন কর্তৃপক্ষ ইউরোপীয়দের মর্যাদা না দিয়া পারিলেন না। ডাঃ চক্রবর্তী পুনরায় মেডিক্যাল কলেজে উচ্চতর পদে নিযুক্ত হইলেন।

প্রথমেই যে জেনারাল হাসপাতাল ভবনটির কথা বলিয়াছি তাহা নির্মাণের টাকা বেশীর ভাগই যোগাইয়াছিলেন বেসরকারী হিন্দু প্রধানেরা। ১৮৩৫ সনে ফিভার হসপিটাল কমিটি গঠিত হয়। সমগ্র কলিকাতার স্বাস্থ্য রক্ষা, কর আদায় প্রভৃতি বিষয়ে বিবেচনার ভার লইলে এই কমিটি সরকার কর্তৃক গ্রাহ্য হয়। সাক্ষ্য গ্রহণান্তর কমিটি তিনবার তিনটি রিপোর্ট সরকারে পেশ করেন। তাহাতে কলিকাতার যাবতীয় সমস্যা আলোচিত হয় কিন্তু সরকার স্বাভাবিক দীর্ঘসূত্রতা-বশতঃ আশু কোনও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন নাই। মেডিক্যাল কলেজের কৌন্সিল ও কমিটির সভাপতি জন পিটার গ্রাণ্টের ভিতর আলাপ আলোচনার পর স্থির হয় যে, কলেজের সংলগ্ন একটি হাসপাতাল ভবন নির্মাণের জন্য সংগৃহীত অর্থ ব্যয়িত হইবে। এই অর্থ এবং নূতন দানের (মোট ২,৩৬,৭৭২৵৬ পাই) দ্বারা এই ভবন নির্মিত হয়, অবিলম্বে বিভিন্ন রোগের ওয়ার্ডও খোলা হইল। এই হাসপাতালের জন্য মতিলাল শীল বার হাজার টাকা মূল্যের ভূমি দান করিয়াছিলেন।

কলেজটি যে ধীরে ধীরে কলিকাতার একটি প্রধান সংস্কৃতি-কেন্দ্রে পরিণত হইতেছিল, ইতিমধ্যে আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। কলেজের উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ নাথানিয়েল

ওয়ালিচ ইহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া দেশ-বিদেশের পণ্ডিতসমাজে খ্যাতিলাভ করেন। রসায়ন ও ভেষজ বিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ ওসাগ্‌নেসি পদার্থবিদ্যার বিদ্যুৎ বিষয়ক গবেষণায় ব্যাপৃত হন। এই বিষয়ে তিনি প্রকাশ্যে যে সব বক্তৃতা করিতেন তাহা শুনিবার জন্যও বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড ও বহু গণ্যমান্য দেশী বিদেশী উপস্থিত থাকিতেন। বিদ্যুৎ সম্বন্ধে তাঁহার বিভিন্ন প্রস্তাব পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইত। অধ্যাপক গুডিবের নেতৃত্বে ধাত্রীবিদ্যাও বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তিনি স্বয়ং এজন্য বৃত্তিদান করিয়াছিলেন। এই বৃত্তি গুডিব বৃত্তি নামে এখনও দেওয়া হইয়া থাকে।

কলেজের প্রধান বক্তৃতাস্থলটি মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটার নামে আখ্যাত। এখানে সংস্কৃতিমূলক বক্তৃতা প্রায়ই হইত। কলেজের অধ্যাপক ও সেক্রেটারী ডাঃ এফ, জে, মৌএটের ঐকান্তিক আগ্রহে এখানে ১৮৫১, ১১ই ডিসেম্বর ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের নামে বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক বক্তৃতাদান ও প্রবন্ধ পাঠ হইত এই সভায়। দেশীয় এবং ইউরোপীয় বিদ্বান ব্যক্তিগণ ইহার সদস্য ছিলেন। পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফের সভাপতিত্বকালে (১৮৫৯-৬৩) সোসাইটির কার্যকলাপ প্রসারিত হয়। সেই সময়ে ইহার বিশেষ উন্নতি ঘটে। কলেজ-থিয়েটারই ছিল এই সভার অধিবেশন-স্থল। তখনকার দিনের খ্যাতনামা সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ববিদ্ অনেকেই এখানে বক্তৃতা দিয়াছেন বা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের "Jesus Christ Europe and Asia" শীর্ষক প্রসিদ্ধ বক্তৃতাটি এই থিয়েটারেই ১৮৬৬, ৫ই মে প্রদত্ত হয়। এইরূপে মেডিক্যাল কলেজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগেরই কেন্দ্র হইয়া উঠিল।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ

মটকাফ হল
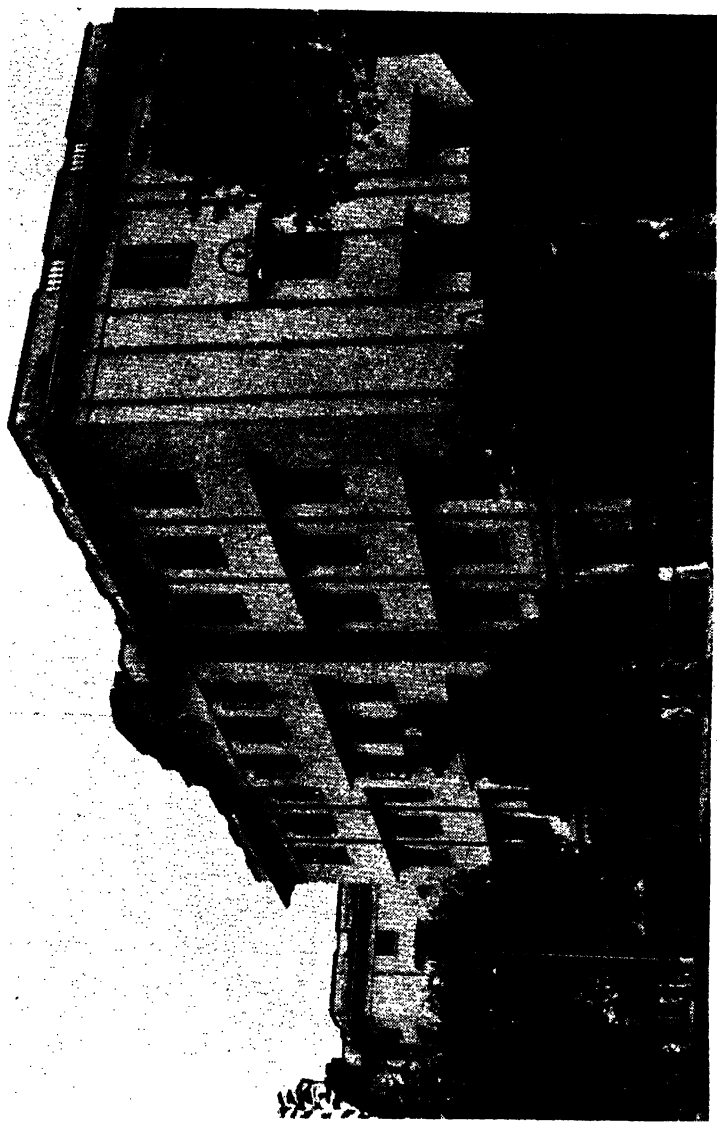
সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ সম্বন্ধে এখন কিছু বলা যাক্। শুধু ছাত্রদের বিভিন্ন বিদ্যা শিক্ষাদান নয়, বিজ্ঞানের গবেষণার একটি প্রকৃষ্ট ক্ষেত্ররূপেও এই বিদ্যালয়টি সে যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বলিতে কি, বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজেই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্য্য আরম্ভ হয়।

খ্রীষ্টানদিগের ভিতর নানা সম্প্রদায়। তন্মধ্যে প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। গত শতাব্দীর তৃতীয় দশক নাগাদ প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। স্থানীয় রোমান ক্যাথলিকরাও ১৮৩৩ সনে পোপের নিকট আবেদন জানান যে, এখানে একটি শিক্ষালয় পরিচালনার জন্য ইংরেজ বা আইরিশ শিক্ষাব্রতীদের যেন তিনি প্রেরণ করেন। তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য হইল। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর ডক্টর রবার্ট সেণ্ট লেজারের নেতৃত্বে কয়েকজন ইংরেজ জেস্যুট মিশনরী উক্ত উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছেন। এই দলে ছিলেন ফ্রান্সিস চ্যাড়ুইক ও রিচার্ড সাম্‌নার। এ দুজনের নাম আমরা পরে আরও পাইব।

জেস্যুট মিশনরীগণের চেষ্টা-যত্নে মুরগীহাটার পর্তুগীজ চার্চ ষ্ট্রীটে একজন ক্যাথলিক বণিকের একটি বাড়ীতে ক্ষুদ্রাকারে ১৮৩৫ সনের ১লা জুন এই বিদ্যালয়টির গোড়া পত্তন হইল। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের সর্বাধ্যক্ষকে বলা হয় 'রেক্টর'। নূতন শিক্ষালয়ের প্রথম

'রেক্টর' হইলেন ফ্রান্সিস চ্যাড্উইক। সাম্‌নার প্রমুখ নবাগত মিশ-নরীগণ শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন। ১৮৩৬ সনের নবেম্বর মাসে একজন ফরাসী জেস্যুট আসেন। তিনি ছাত্রদের ফরাসী শিখাইতে লাগিলেন। ছাত্রসংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল।

মুরগীহাটার অস্বাস্থ্যকর অঞ্চল হইতে বিদ্যালয়টি ৩নং পার্ক স্ট্রীটের বাটীতে উঠিয়া আসে ১৮৩৮ সনের জানুয়ারী মাসে। ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল বহু। ভাষা ও বিজ্ঞান—দুই দিকেই বিশেষ নজর দেওয়া হইত। গ্রীক ও লাটীনের সঙ্গে ইংরেজী এবং ফরাসী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আবার প্রচীন ও আধুনিক দেশীয় ভাষা শিখাইবারও বিশেষ আয়োজন হয়। উচ্চতম শ্রেণীতে এই সকল ভাষা-সাহিত্য এবং রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিরও পাঠ লওয়া হইত। সাত বৎসর বয়সে এখানে ছেলেদের ভর্তি করা নিযম হয়। ১৮৪২ সনের একখানি বার্ষিক পুস্তকে এই সকল বিষয় শিক্ষার কথা পাইতেছি।

ইহার এক বৎসর পূর্বে ১৮৩৯, ১৭ই ডিসেম্বর ছাত্রদের প্রথম প্রকাশ্য বাৎসরিক পরীক্ষা হয়। আমরা দেখিয়াছি, সেযুগে এই ধরণের পরীক্ষা বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রদের প্রথম প্রকাশ্য পরীক্ষায়, তাহারা এখানকার শিক্ষায় কতখানি ব্যুৎপন্ন হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা গেল। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ ওসাগ্‌নেসী অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন। সংবাদপত্রেও ছাত্রদের কৃতিত্বের কথা বিঘোষিত হইল। ইহার পর প্রতি বৎসরই তাহাদের এইরূপ পরীক্ষা গৃহীত হইতে থাকে। এখানকার শিক্ষার উৎকর্ষ দেখিয়া অ-খ্রীষ্টান অভিভাবকগণও অধিক সংখ্যায় নিজ নিজ ছেলেদের এখানে পাঠাইতে লাগিলেন। ৩নং পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ২২নং চৌরঙ্গীর বাটী ক্রয় করিয়া ১৮৪১ সনের

জানুয়ারী মাসে এখানে উঠিয়া আসে। এই বাড়ী পরে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এ স্থানটি এখন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের অঙ্গীভূত হইয়াছে।

প্রায় আট বৎসরকাল কলেজটি সুষ্ঠুভাবে চলিল। ১৮৪৩, সনের গোড়ার দিকে ইহার কর্তৃপক্ষ অন্য একটি বিদ্যালয় পরিচালনার ভার নিজ হাতে লইলেন। আমরা মতিলাল শীলের অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এ বিষয়ের কথা পরে পাইব, মতিলাল ৬০নং কলুটোলা ষ্ট্রীটে স্বীয় ভবনে ১৮৩৪, ১লা মার্চ তারিখে সাড়ম্বরে এই বিদ্যালয়টি খুলিয়াছিলেন। রবার্ট জনসন, রিচার্ড সাম্‌নার প্রমুখ সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের কর্তৃস্থানীয় শিক্ষা-ব্রতিগণ বিনা বেতনে ইহার পরিচালনা তথা শিক্ষাদানকার্যও আরম্ভ করেন। শীলস্‌ কলেজের কার্যে অধিকতর সময় দিতে গিয়া তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে তো যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিলেনই, উপরন্তু নিজেদের কলেজটির দেখাশুনারও কতকটা অসুবিধা ঘটিল। তাহারা এইরূপে দেড় বৎসর কাল স্কুলটির সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া পরে ইহার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হন। কি কারণে এই ব্যাপারটি ঘটিল তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ইতিহাসকার বলেন, মতিলাল শীলের বিদ্যালয় পরিচালনার ভার গ্রহণের পরে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের উন্নতির পক্ষে স্বতঃই বিশেষ হানি ঘটে। উহার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াও এই কলেজের পূর্ব সৌষ্ঠব ফিরাইয়া আনা আর সম্ভব হয় নাই। কলেজটি এতৎসত্ত্বেও দুই বৎসর কোনক্রমে আত্মরক্ষা করে। ১৮৪৬ সনের শেষার্ধে ইংরেজ জেস্যুট মিশনরীগণ ইহা চালাইতে ক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া স্বদেশযাত্রা করিলেন। একটি বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায়, ১৮৪৬ সনের ১লা অক্টোবর হইতে মিশনরীদের পরিবর্তে রোমান ক্যাথলিক

সম্প্রদায়ের অন্যান্য নেতার উপরে এই বিদ্যালয় পরিচালনের ভার অর্পিত হইবে। কিন্তু নানা কারণে এ প্রস্তাবও কার্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

যাহা হউক, আদি বিদ্যালয়টি উঠিয়া যাইবার কয়েক বৎসর পরে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ পুনঃ প্রতিষ্ঠার ভার দেওয়া হইল বেলজিয়ম হইতে আগত জেস্যুট মিশনরীদের উপর। তাঁহারা ১৮৬০ সনের ১৬ই জানুয়ারী মাত্র তিরাশীটি ছাত্র লইয়া কলেজের দ্বার উন্মোচন করিলেন ১০নং পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। এই বাড়ীতেই দীর্ঘকাল যাবৎ বিখ্যাত সাঁ সুচি থিয়েটার অধিষ্ঠিত ছিল। নবকলেবর-প্রাপ্ত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ বা রেক্টর হইলেন এইচ্‌ ডেপেলচিন। কলেজের প্রথম দুই-তিন বৎসর ভীষণ অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে কাটে। তবে মিশনরীদের অদম্য পরিশ্রম ও অপূর্ব ত্যাগস্বীকারে ইহা শীঘ্রই একটি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পরিণত হইল। কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার মঞ্জুরী পাইল ১৮৬২ সনে। এখানকার পাঠোৎকর্ষের কথা সর্বত্র জানাজানি হইল, ছাত্রসংখ্যাও দ্রুত বাড়িয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগস্থাপনের প্রায় পনর বৎসরের মধ্যেই অন্ততঃ তিন বার এখানকার প্রেরিত ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিল। ইংরেজী নাটকের অভিনয় বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভার একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়।

১৮৬৪ সনের ৫ই অক্টোবরের ভীষণ ঝড়ে কলিকাতা ভয়ানক রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিশেষ ক্ষতি হইল। এই ক্ষতিপুরণ হইতে ইহার কিছু সময় লাগে বটে, কিন্তু এই ব্যাপারটি ক্রমে শাপে বর হইল। বাড়ীটির সংস্কার সাধিত হয় এবং নূতন নূতন অংশও সংযোজিত হয়। ১৮৬৫ হইতে ইহার ছাত্র-সংখ্যা বাড়িয়া তিন শতে দাঁড়াইল।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফাদার ইউজিন লাফোঁ কলেজের সঙ্গে যুক্ত হন ১৮৬৬ সন নাগাদ। ভারতবর্ষে ইদানীন্তনকালে "বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্মদাতা" বলিয়া তিনি আখ্যাত হইয়াছেন। তিনি এই বৎসরের প্রথমেই বিজ্ঞানের উপরে এক প্রস্থ বক্তৃতা দিলেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে যে আলোচনা-গবেষণা আরম্ভ হয়, এখানেই তাহার সূচনা। লাফোঁ ১৮৬৬ সন হইতে ১৯০৮ সালে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বিজ্ঞানের গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন।

লাফোঁ সাত বৎসরকাল (১০ই অক্টোবর ১৮৭১—১লা জানুয়ারী ১৮৭৯) কলেজের রেক্টর বা সর্বাধ্যক্ষ পদে বৃত ছিলেন। এই সময়ে কলেজের যথোচিত উন্নতি সাধিত হয়। ইহার পূর্বেকার আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৭ সনের ১লা ও ২রা নবেম্বর নিম্নবঙ্গে আর একটি ভীষণ সাইক্লোন বা ঝড় হয়। বায়ুর গতি নিরূপণের জন্য লাফোঁ হাওয়া অফিসে গেলেন। অফিস-ঘরের ছাদ উড়িয়া গেল। লাফোঁর তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই, তখনও তিনি বায়ুর গতি নিরূপণে রত। এইরূপে বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ণয়ের জন্য জীবন বিপন্ন করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহার পর কলেজেও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তিনি সবিশেষ অবহিত হইয়াছিলেন।

একটু পূর্বেই বলিয়াছি, কলেজের উন্নতির সঙ্গে লাফোঁর নাম বিজড়িত হইয়া আছে। তিনি এখানে পদার্থবিদ্যার গবেষণাগার স্থাপন করিলেন, ১৮৭০ সন হইতে। এবিষয়ে বক্তৃতাদানও সুরু করিলেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ এই সূত্রেই ঘটে। ১৮৭৫ সনে ফাদার লাফোঁর উদ্যোগে কলেজে একটি মানমন্দির স্থাপিত হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজে একুশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। এ সময়

একটি রসায়নাগারও কলেজে স্থাপিত হইল। তৎকালীন ছোট-লাট স্যার রিচার্ড টেম্পল এজন্য দুইহাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। এইসকল পরীক্ষণাগারের স্থান সঙ্কুলানের জন্য কলেজ-ভবন বাড়ানো হইল। এখানে বলা আবশ্যক যে, পার্শ্ববর্তী ১১নং বাড়ীটিও কলেজ কর্তৃপক্ষ ক্রয় করিয়াছিলেন। দেশী-বিদেশী প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের গবেষণাও গত শতাব্দীর সপ্তম দশক হইতে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে সুষ্ঠুরূপে আরম্ভ হইল। আর ফাদার ইউজিন লাফোঁই এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক।

কলেজে দেশী-বিদেশী বহু খ্যাতনামা অধ্যাপক অধ্যাপনা কার্যে রত থাকিয়া ইহাকে একটি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যাগারে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহাদের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু সকলের শীর্ষস্থানে রহিয়াছেন ফাদার লাফোঁ। তাঁহার গবেষণামূলক বক্তৃতা ও আলোচনা কলেজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত না, কলিকাতার বিভিন্ন সংস্কৃতি কেন্দ্রেও তাহা ব্যাপ্তিলাভ করে। ডাঃ সরকারের ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার উল্লেখ আগেই করিয়াছি। স্থাপনের পূর্ব হইতেই লাফোঁ ইহার প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্রলালের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। বিজ্ঞান-সভায় লাফোঁ প্রদত্ত পদার্থবিদ্যার বক্তৃতাবলী পৌরজনকে বিজ্ঞানের আলোচনায় বিশেষ প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। সমাজকল্যাণকর শিক্ষামূলক ছোটখাট প্রতিষ্ঠানও তাঁহার নিকট কখনও তুচ্ছ ছিল না। কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ও বামাহিতৈষিণী সভায়, আর্যনারী সমাজে, বঙ্গ মহিলা সমাজে, এবং ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনেও লাফোঁ বিজ্ঞান বিষয়ে বহু বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। লাফোঁ দ্বিতীয়বার রেক্টর পদে অধিষ্ঠিত হন ১৯০১ সনের ৭ই নবেম্বর। এই পদে তিনি কার্য করেন ১৯০৪, ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

কলেজের প্রধানতঃ তিনটি বিভাগই শিক্ষা-ব্যাপারে সমান কৃতিত্ব

প্রদর্শন করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণাগারগুলিও বিস্তৃততর করা হইয়াছে। লাফোঁ প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরটি বর্তমানে কলেজ-ভবনে উপরিভাগে স্থিত আছে। লাফোঁ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এখনও সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

ছাত্রসম্পদেও এই বিদ্যালয়টি বিশেষ গৌরবের অধিকারী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্কুল-বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। তিনি কিছুকাল কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের সভায় সভাপতিত্বও করেন। বিখ্যাত ভূ-তত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু এবং বৈজ্ঞানিক-প্রবর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুও লাফোঁর অন্যতম ছাত্র। তাঁহার বিজ্ঞানালোচনা ও গবেষণা হইতে আচার্য বসু যৌবনে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। কলেজের অন্যান্য বহু ছাত্রও সমাজের তথা দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই সকল কারণে কলেজটি সত্য সত্যই একটি সংস্কৃতিকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।*

---

* সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ফাদার ফেলন উক্ত কলেজের একখানি জুবিলি পুস্তক (১৮৬০-১৯৩৫) দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধের কতকগুলি তথ্য এই পুস্তক হইতে গৃহীত।

মেটকাফ হল

গঙ্গার ও-পার হইতে হাওড়ার পোল পার হইয়া ষ্ট্রাণ্ড রোড বরাবর দক্ষিণ দিকে কিয়ৎ দূর অগ্রসর হইলে হেয়ার ষ্ট্রীট ও ষ্ট্রাণ্ড রোডের মোড়ে একটি পুরনো ধাঁচের বাড়ী দেখা যাইবে, তাহার দ্বিতলে বাহিরের দিকে বড় বড় হরফে লেখা রহিয়াছে Metculfe Hall (মেটকাফ হল)। এই ভবনটির কথাই এখানে বলিব।

মেটকাফের নামের সঙ্গে সে যুগের বহু স্মৃতি জড়িত আছে। তাঁহার পুরা নাম স্যার চার্লস থিওফিলাস মেটকাফ। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেলে স্থায়ী বড়লাট নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত মেটকাফ অস্থায়িভাবে এই পদে নিযুক্ত হন। তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন পূর্ণ এক বৎসর, মার্চ, ১৮৩৫—ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৬। মেটকাফ সিবিলিয়ান কর্মচারী ছিলেন। এই পদাধিকার বলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের নানা শ্রেণীর অধিবাসীর সঙ্গে তাঁহার মিশিবার সুযোগ ঘটে। ভারতবাসীর সত্যকার উন্নতির উপায় জ্ঞান বিস্তার, একথা তিনি সম্যক বুঝিয়াছিলেন। তাই বড়লাট পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানে অগ্রসর হন। এই কার্যে তাঁহার প্রধান সহায় হন বহু-নিন্দিত আইন-সচিব টমাস বেবিংটন মেকলে (পরে লর্ড মেকলে)। বড়লাট ও তাঁহার কৌন্সিলের সদস্যগণের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর স্থির হয় যে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অবিলম্বে প্রদত্ত হইবে। এই মর্মে আইন বিধিবদ্ধ হইল ১৮৩৫ সনের ৩রা আগষ্ট। এতদ্ অনুযায়ী কার্য সুরু হয় পরবর্তী ১৫ই সেপ্টেম্বর।

কলিকাতায় দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ 'মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা'

আইনে বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে পূর্বে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অপহারক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনও করিয়াছিলেন। বার বৎসর পরে এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করিল। ইহাতে তো আনন্দ হইবার কথাই। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আইন পাস হইবার পর তাঁহারা কলিকাতা টাউন হলে সাধারণ সভার অনুষ্ঠান করিয়া মেটকাফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থায়ী নিদর্শনস্বরূপ 'মেটকাফ লাইব্রেরী বিল্ডিং' নামে একটি গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। আরও স্থির হয় যে, এখানে মেটকাফের একখানা তৈলচিত্র টাঙ্গানো থাকিবে এবং এই গৃহের একটি প্রকাশ্য অংশে লেখা থাকিবে ঃ

"In commemoration of the Freedom of the Indian Press having been recognised by Law under the Government of Sir Charles Theo-philus Metcalfe."

এখন উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য একটি কমিটি স্থাপিত হইল। নাম হইল 'মেটকাফ লাইব্রেরী বিল্ডিং কমিটি'। এই সভার এগার দিন পরে ১৮৫৩, ৩১শে আগষ্ট উক্ত স্থলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার জন পিটার গ্রাণ্টের সভাপতিত্বে দেশী-বিদেশী প্রধানদের আর একটি সভা হইল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল অ-রাজনৈতিক, নিছক জ্ঞান প্রচার। তাঁহারাও মনস্থ করিলেন, কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী নামে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার কলিকাতায় স্থাপিত হইবে। তাঁহারা এই জন্য একটি স্থায়ী কমিটিও গঠন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, পূর্বোক্ত কমিটি এবং এই কমিটি উভয়েতেই অনেকে একই লোক সদস্য ছিলেন। প্রথমে স্বতন্ত্রভাবে কার্য আরম্ভ হইলেও উদ্দেশ্য-সাম্য হেতু পরস্পরের মিলিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। মেটকাফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য

কলিকাতার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিও স্বতন্ত্রভাবে আর একটি সভার অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা যে কমিটি স্থাপন করিলেন, তাহার নাম হইল 'মেটকাফ টেষ্টিমনিয়াল কমিটি।' এই কমিটিও পরে উক্ত কমিটি দ্বয়ের সঙ্গে একযোগে কার্য করেন। এ সকল কথাই ক্রমে জানা যাইবে।

মেটকাফের কলিকাতা ত্যাগের পরই প্রকৃত প্রস্তাবে মেটকাফ লাইব্রেরী বিল্ডিং কমিটির কার্য আরম্ভ হয়। তাঁহারা লালদীঘির উত্তর-পূর্ব কোণের একখণ্ড খালি জমিতে এই ভবন নির্মাণের জন্য সরকারের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। ঐসময়ে 'রাইটার্স বিল্ডিংসে'র এরূপ আকার ছিল না। তখন ইহার মালিকও সরকার ছিলেন না। কমিটির উক্ত প্রস্তাবে রাইটার্স বিল্ডিংসের মালিকের পক্ষে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইল যে, ইহার নিকটে একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্মিত হইলে উহার গুরুত্ব কমিয়া যাইবে। সরকার অগত্যা কমিটির প্রার্থনা না-মঞ্জুর করিলেন। অন্যান্য স্থলে ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করিয়াও কমিটি বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। এই সময় কমিটির সম্পাদক রূপে কার্য করিতে দেখি দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানিকে।' কমিটির নির্মিত গৃহে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীরও স্থান করিয়া দেওয়া হইবে, এইরূপ স্থির হয়। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি ইহাতে সম্মত হইয়াছিলেন।

তিন-চারি বৎসর অবিরত চেষ্টার পর ভবন নির্মাণের নিমিত্ত একটি স্থান পাওয়া গেল। এখন যেখানে মেটকাফ হল দাঁড়াইয়া আছে, সেখানে পূর্বে একটি পোড়ো বাড়ী ছিল। নাবিকদের আবাস-স্থলরূপে এ বাড়ীটি ব্যবহৃত হইত। স্যার ইভান এ, কটনের ভাষায় বলি "A building rapidly falling into decay which has been temporarily appropriated to the 'Sailors' Home" (Calcutta Old and New, p. 788.)

এ বাড়ীটি বাঙ্গালা সরকারের অধিকারে আসে। পূর্ব হইতেই উক্ত কমিটির আগ্রহাতিশয়ে স্থির হয় যে, মেটকাফের প্রিয় দুইটি বিষয়ের আবাসস্থল হইবে প্রস্তাবিত ভবন। ইহার নিম্নতলে 'এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি' বা কৃষিসমাজ থাকিবে, আর দ্বিতল নির্দিষ্ট রহিল কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য। সরকার এই প্রস্তাবে রাজী হইয়া কমিটিকে উক্ত ভূমিখণ্ড দান করেন। তবে তাঁহারা এইরূপ সর্ত জুড়িয়া দিলেন যে, এখানে সুষ্ঠু স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী একটি সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করিতে হইবে।

কিন্তু প্রস্তাবিত ভবনটি নির্মাণের জন্য অর্থ পাওয়া যাইবে কোথা হইতে? প্রথমে হিসাব করা হইল, এরূপ একটি গৃহ নির্মাণে চল্লিশ হাজার টাকার মত ব্যয় পড়িবে। তখন স্থির হয়, মেটকাফ লাইব্রেরী বিল্ডিং কমিটি, মেটকাফ টেষ্টি-মনিয়াল কমিটি, কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী কমিটি এবং এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি সমান অংশে এই অর্থ প্রদান করিবেন। এইরূপ প্রারম্ভিক আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া কমিটি ১৮৪০ সনের ১৯শে ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এই ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন। ইহার নাম যে 'মেটকাফ হল' হইবে, তাহা পূর্ব হইতেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

হিন্দু (তথা সংস্কৃত) কলেজ ও সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মত এবারে 'মেট্কাফ হল' ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন উৎসবও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। সপরিষদ বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড, বিল্ডিং কমিটি, টেষ্টিমনিয়াল কমিটি, পাবলিক লাইব্রেরী কমিটি ও এগ্রি-হর্টিকালচারাল কমিটির সদস্যগণ এবং দেশী-বিদেশী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই উৎসবে যোগদান করেন। আমাদের দেশে ভিৎ পূজা করিয়া গৃহ নির্মাণের আয়োজন

করা হইত; ইউরোপীয় খৃষ্টান-সমাজের মধ্যেও ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া 'মেসন' বা মিস্ত্রিগণ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে গৃহের ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত করিতেন স্মরণাতীত কাল হইতে। এবারেও এই উৎসব যথারীতি প্রতিপালিত হয়। ভিত্তি-প্রস্তরের উপর সুরা ও তৈল প্রদানকালে মেসনগণের পক্ষে তাঁহাদের নেতা ('প্রোভিন্সিয়াল গ্রাণ্ড মাষ্টার') এই কয়টি কথা উল্লেখ করিলেন:

"May all the bounteous Author of nature bless this city with abundance of corn, wine and oil and with all the necessary convenience and comforts of life."

অর্থাৎ, 'দয়াবান নিসর্গ-কর্তা এই নগরীকে প্রচুর শস্য, মদ্য, তৈল এবং জীবনের সকল রকমের স্বাচ্ছন্দ্য দান করুন।' ইহার পর তিনি একটি বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতা হইতে জানা যায়, গৃহের উত্তর-পূর্ব কোণে এই প্রস্তর স্থাপন করাই প্রশস্ত। তাঁহার বক্তৃতার পর মেট্‌কাফ বিল্ডিং কমিটির পক্ষে ইহার সম্পাদক লঙ্গেভিল ক্লার্ক একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। ইহার পর উৎসব শেষ হয়।

'মেটকাফ হল' নির্মাণ সম্পূর্ণ হইতে সাড়ে তিন বৎসর সময় লাগিয়াছিল। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী ১৮৪৪ সনের জুন মাসে এই স্থায়ী আবাসে চলিয়া আসিল। কৃষি-সমাজও নিম্নতলে এই সময় হইতে নিজ স্থান করিয়া লন। এই গৃহ নির্মাণে মোট ব্যয় হয় প্রায় ৬৮,০০০৲ টাকা। ইহার এক চতুর্থাংশ পূর্ব ব্যবস্থা মত কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী অর্পণ করেন। এই অর্থ সংগ্রহে লাইব্রেরীর প্রথম ভারতীয় গ্রন্থাগারিক, তখন ডেপুটী লাইব্রেরীয়ান প্যারীচাঁদ মিত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। 'মেটকাফ হল' সম্পর্কে এখনও কাহারও কাহারও ভুল ধারণা লক্ষিত হয়। ইহার ভূমি প্রদান করেন, বাঙ্গলা সরকার, আর ইহা

নির্মাণের ব্যয় পূর্বোক্ত চারিটি কমিটি সমভাবে বহন করেন। একমাত্র কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী ইহার ব্যয় বহন করেন নাই।

প্রতিষ্ঠাবধি 'মেটকাফ হল' কলিকাতার একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র হইয়া উঠিল। দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান-মূলক নূতন ও পুরাতন পুস্তকের আগারটি পণ্ডিত, মনীষী ও শিক্ষার্থীদের সমাবেশে ক্রমশঃ মুখর হইতে থাকে। এখান হইতে কৃষি বিদ্যার আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং দেশ-বিদেশের উন্নত শস্যবীজও চারিদিকে প্রেরিত ও বিতরিত হইত। দেহের ও মনের খোরাক মিটাইবার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল, এই মেটকাফ হল। ইহা পরবর্তীকালের বিখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, দার্শনিক ও ধর্মনেতাদের শিক্ষালয়ে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে হরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কৃষ্ণদাস পাল, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই ভবনটি সাংস্কৃতিক ও সংস্কৃতির পরিপোষক বিভিন্ন প্রচেষ্টারও কেন্দ্র হইয়া উঠে। বাঙ্গলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন আজ যে এতটা দানা বাঁধিয়াছে তাহারও মূলে রহিয়াছে এখানকার গ্রন্থাগারটির কর্তৃপক্ষের মঙ্গল হস্ত। দাতব্য, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানগুলির স্থায়িত্বদানকল্পে ১৮৬০ সনের ২১শ আইন ভারত সরকার বিধিবদ্ধ করেন। উক্ত গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের প্রায় দ্বাদশ বর্ষব্যাপী চেষ্টার ফলে এমনটি সম্ভব হইয়াছিল।

মেটকাফ হল তথা কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী আর একটি কারণেও বিদগ্ধ জনের আকর্ষণীয় বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। গ্রন্থাগারিক প্যারীচাঁদ মিত্রের অমায়িক ব্যবহার, সাহিত্য প্রীতি ও বন্ধুবাৎসল্য সে যুগে প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি নিজেই ছিলেন একটি 'প্রতিষ্ঠান'। সর্ব বিষয়ে এরূপ উদার দৃষ্টি একক

ব্যক্তির মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়। শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায় এই ভবনটি। একটিমাত্র উদাহরণ দিতেছি। ১৮৬৭ সনের ২২শে জানুয়ারী 'Bengal Social Science Association' বা বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান-সভা এইখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যারীচাঁদ এই সভার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। স্বতন্ত্র আবাসস্থল না থাকায় এখানে প্রায়ই ইহার অধিবেশন হইত।

কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী ও কৃষি-সমাজের কর্তৃপক্ষের মতামত লইয়া সরকার ১৯০২ সনে Imperial Library (Indentures Validation Act. 1902) বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন বলে লাইব্রেরীর অংশীদারের প্রত্যেকে পাঁচ শত টাকা হিসাবে মোট ২৮,৫০০৲ টাকা পান। কৃষিসমাজের বেলায় ইহাকে এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া হইল। আরও স্থির হইল, কৃষিসমাজ প্রতি বৎসর ছয় হাজার টাকা করিয়া সরকারী সাহায্য পাইবে—একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মেটকাফ হলের পুরাপুরি মালিক হইলেন অতঃপর ভারত সরকার স্বয়ং। মেটকাফ হলের দ্বিতল ও নিম্নতল উভয়ই ১৯২৩ সন পর্যন্ত গ্রন্থাগারের জন্য ব্যবহৃত হয়। ঐ সনের শেষে গ্রন্থাগার এস্‌প্লানেডে চলিয়া আসে। বর্তমানে ভারত সরকার নিজেদের বৈষয়িক প্রয়োজনে হলটিকে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কলিকাতার একটি সাধারণগম্য সংস্কৃতিমূলক ভবনের এতাদৃশ পরিণতিতে কাহার না দুঃখ হয়?

———

শীল্‌স্ ফ্রী স্কুল

সেযুগে কলিকাতায় বিস্তর 'ফ্রী স্কুল' বা অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল। আজও কলিকাতায় ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট নামীয় রাস্তাটি এইরূপ রেওয়াজের সাক্ষ্য দান করিতেছে। ঐ অঞ্চলের ফ্রি স্কুলটি দুঃস্থ ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রদের লিখন-পঠন শিখাইবার নিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যেই নব্য-শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণ স্বদেশবাসীদের ভিতরে দ্রুত শিক্ষা বিস্তার মানসে কলিকাতায় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহু অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন।

তবে এ সকল বিদ্যালয়ই ছিল 'প্রাইমারী' বা প্রাথমিক স্তরের। কলিকাতার 'রথচাইল্‌ড' মতিলাল শীল যে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন তাহা এসকলকেই ছাড়াইয়া যায়। তৎকালীন প্রচলিত উচ্চতম বিদ্যা পর্যন্ত শিখাইবার ব্যবস্থা এখানে হইয়াছিল। তাই 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' বিদ্যালয়ের সূচনাতেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন,

"The sudden appearance of an Institution of such a magnitude takes the mind so completely by surprise that we scarcely know how to allude to it in language which shall not be mistaken for indifference to native improvement." (9 March, 1843).

অর্থাৎ, এরূপ একটি বিরাট আকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হঠাৎ আবির্ভাবে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। কিরূপে ইহার কথা ব্যক্ত করিব সে ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। যে ভাষাতেই ইহার

কথা ব্যক্ত করি না কেন তাহাই হয়ত অ-যথেষ্ট বিধায় দেশীয় উন্নতি প্রচেষ্টার প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য বলিয়া ভ্রম হইবে।

'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' এই প্রসঙ্গে মতিলাল শীলকে কলিকাতার 'রথচাইল্‌ড' বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার দাতব্যের কথাও পত্রিকাখানি উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। যাহা হউক, কিরূপে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠায় মতিলাল উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে দু-চার কথা প্রথমে বলিতেছি।

তখনকার দিনে হিন্দু কলেজে কলিকাতার মান্যগণ্য হিন্দু-প্রধানদের ছেলেরা উচ্চতম শিক্ষা পর্যন্ত লাভ করিতে পারিত। মতিলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র হীরালাল শীলও এই কলেজে পড়িতেন। তাঁহাকে জনৈক শিক্ষক একদা অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়ায় মতিলাল নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে কলেজ হইতে ছাড়াইয়া আনিলেন, এবং নিজেই এইরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এই সময় সাহেব পাড়ায় রোমান ক্যাথলিক জেসুট মিশনারিগণ সেণ্ট জেভিয়ার্স বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছিলেন।

মতিলাল তাঁহাদের সঙ্গে যোগস্থাপন করেন। তাঁহারাই প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টির ভার গ্রহণ করিবেন, স্থির হইল। এইরূপে প্রাথমিক আয়োজনাদির পর, মতিলাল শীলের কলুটোলাস্থ ভবনে ১৮৪৩ সনের ১লা মার্চ মহাসমারোহে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সভার সভাপতিত্ব করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স পীল। দ্বারকানাথ ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের পরিচালক ও অধ্যাপকবর্গ এবং আরও বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই দিনকার আর একটি বিষয়ও স্মরণীয়। পার্লামেণ্টের বিখ্যাত সদস্য বাগ্মী ভারতহিতৈষী জর্জ টমসনও

এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

বিদ্যালয় উক্ত দিবসে যথারীতি খোলা হইল। মতিলাল পাঁচ শত জন ছাত্র যাহাতে অ-বেতনে এখানে উচ্চতম শিক্ষা অর্জন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। পাঠ্য বিষয় ধার্য হইল—ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, আবৃত্তি-লিখন, পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, উচ্চগণিত, ব্যবহারিক গণিত এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা। সে যুগে আজিকার মত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষার এরূপ সূক্ষ্ম স্তরভেদ করা হইত না। একই বিদ্যালয়ে নিম্নতম হইতে উচ্চতম বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, আর এ ধরনের বিদ্যালয়কেই বলা হইত কলেজ। হিন্দু কলেজের মত মতিলাল-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাগারটিও 'শীলস কলেজ' নাম পরিগ্রহ করে। তখনই কিন্তু ইহাকে 'শীল্স ফ্রি কলেজ' আখ্যা দেওয়া হয় নাই। কারণ প্রতিষ্ঠাকালে নিয়ম করা হইয়াছিল যে, মাসিক বেতন না লইলেও, কলেজ হইতে ছাত্রদের যে সমুদয় পুস্তক সরবরাহ করা হইবে তাহার মূল্য বাবদে প্রত্যেককে এক টাকা করিয়া প্রতিমাসে দিতে হইবে।

জেস্যুট মিশনরীদের পরিচালনায় কলেজের দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল, অ-বেতনে উচ্চ শিক্ষা লাভের এমন সুযোগ দুঃস্থ বাঙ্গালী ছাত্রদের খুব কমই ছিল। ডাফ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়-সমূহে উচ্চ শিক্ষা লাভ সম্ভব হইত বটে, কিন্তু সে-সব স্থলে খ্রীষ্টতত্ত্ব শিখাইবার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হইত বলিয়া অনেক অভিভাবক সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতেন। 'শীলস কলেজ'-এর কর্তৃত্বভার মিশনরীদের হস্তে অর্পিত থাকিলেও সেরকম আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। ছেলেরা ক্রমে অধিক সংখ্যায় আসিয়া ভর্তি হইতে লাগিল। কিন্তু বৈষয়িক কারণে জেস্যুট পাদ্রীদের সঙ্গে ক্রমে মতিলালের মতদ্বৈধ

উপস্থিত হয়। মতান্তর মনান্তরে পরিণত হইল। কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড় বৎসর পরে জেসুইটদের হস্ত হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া তিনি ইহার পরিচালনার ভার দিলেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। কৃষ্ণমোহন ছিলেন 'চার্চ অফ্ ইংলণ্ড' নামক প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। এই ব্যাপার লইয়া তখন সংবাদপত্রেও বাদানুবাদ হইয়াছিল।

যাহা হউক, ইহার পর এক বৎসরের মধ্যেই কলিকাতায় এমন একটি ব্যাপার ঘটিল যাহাতে বিদ্যালয়ের পরিচালনাভার খ্রীষ্টানদের উপর না রাখিয়া মতিলাল স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। ১৮৪৫ সনের প্রথমে পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ সস্ত্রীক একটি ছাত্রকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করায় হিন্দু সমাজে তুমুল আন্দোলনের সূচনা হয়। ইহার প্রতিকারার্থ একটি প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে মতিলাল শীলের শিমুলিয়াস্থ বাসভবনে ১৮৪৫ সনের ২৫শে মে রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইল। মতিলালের বিদ্যালয়টি প্রায় অবৈতনিক ছিল। এইদিনকার সভায় তিনি নিজেই একটি পুরাপুরি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া ঐ ভবনেই পরবর্তী ২রা জুন এক স্বতন্ত্র অবৈতনিক বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেন।

ইহার অল্পকাল মধ্যেই মতিলালের মূল বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই অবৈতনিক বিদ্যালয়টি যুক্ত হইল। তখন হইতে এই মিলিত বিদ্যালয় 'শীলস্ ফ্রি কলেজ' নামে অভিহিত হইতে থাকে। হাসপাতাল, দেবালয়, দুঃস্থ-সেবা প্রভৃতি তাঁহার অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির মত দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়টিকে ১৮৪৮ সনের ২০শে জানুয়ারী নিরানব্বই বৎসরের মেয়াদে একটি ট্রাষ্ট ফণ্ড গঠন করেন। ইহার উপস্বত্ব হইতে বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয়ও নির্বাহিত হইতে থাকে। গত ১৯৪৭

সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী এই ফণ্ডের মেয়াদ পূর্ণ হইলে নূতন করিয়া ট্রাষ্ট ফণ্ড গঠিত হয়। এখনও ইহার আয় হইতেই বিদ্যালয়টির ব্যয় নির্বাহ হইতেছে।

সম্মিলিত বিদ্যালয়টি অতঃপর গোলদীঘির পূর্ব-দক্ষিণ কোণের বাড়ীতে উঠিয়া আসে। এই ভবনটির কথা ইতিপূর্বে আমরা হেয়ার স্কুল ও বেথুন বিদ্যালয় প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এখানে এল-এম-এস্ কলেজ স্থিত ছিল। বাঙ্গলার শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভবনটির অস্তিত্ব এখন আর নাই। এই স্থলে বর্তমানে কর্পোরেশন ২নং জেলা আপিস-বাড়ী করিয়াছে।

শীলস্ ফ্রি কলেজের বৈচিত্র্যময় জীবনে আরও একটি গুরুতর বৈচিত্র্য ঘটে ১৮৫৩ সনে। এই বৎসরের প্রথম দিকে সরকারী শিক্ষা-সমাজ এবং হিন্দু প্রধানদের মধ্যে হিন্দু কলেজে হীরা বুলবুল নামে এক পশ্চিমা গণিকার পুত্রকে ভর্তি করা লইয়া গোলমাল বাধে। ইহার প্রতিবাদে হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দ ১৮৫৩ সনের ২রা মে 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ' বড়বাজার সিন্দুরিয়াপটিস্থ রামগোপাল মল্লিকের সুবৃহৎ ভবনে প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন ওয়েলিংটনস্থ দত্ত-পরিবারের সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী রাজেন্দ্রনাথ দত্ত। গুরুচরণ দত্তের 'হেয়ার একাডেমী' এবং মতিলাল শীলের 'শীল্‌স ফ্রি কলেজ' লইয়াই ইহার সূচনা হয়। মতিলাল এই নূতন সম্মিলিত কলেজের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। স্বীয় কলেজেব আড়াই শত ছাত্রকে এখানে অ-বেতনে পড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি ১৮৫৪ সনে মাসিক পাঁচ শত টাকা আয়ের একটি সম্পত্তি কলেজের কার্য-সৌকর্যার্থ দান করিলেন। এই বৎসরেই ২০শে মে মতিলাল পরলোকগমন করেন।

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় ১৮৫৮ সনের জুলাই মাসে 'শীল্‌স ফ্রি কলেজ' আলাদা হইয়া

যায়। ১৭ই জুলাই ১৮৫৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' এই সংবাদ দিয়া লেখেন :

"সম্প্রতি কয়েক দিবস হইল 'শীল্‌স ফ্রি কলেজের' অধ্যক্ষগণ 'হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে'র সহিত সংযোগ সম্বন্ধ সংছেদন পূর্বক আপনারা স্বতন্ত্র হইয়াছেন, ছাত্র ও শিক্ষকদিগের সহিত তাঁহারা আপনাদিগের কলেজ আপনারা তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন।"

মতিলাল অতীব দূরদর্শী ছিলেন। তিনি দাতব্য কার্যের জন্য যে ট্রাষ্ট ফণ্ড করিয়া গিয়াছেন তাহারই উপসত্ব হইতে শতাধিক বর্ষ যাবৎ এই বিদ্যালয়টির কার্য সুষ্ঠুভাবে নির্বাহিত হইয়া আসিতেছে। ইহার একটি স্বতন্ত্রভবন নির্মিত হইয়াছে। বিদ্যালয়টির সঙ্গে এই দীর্ঘকালের মধ্যে বাঙ্গলার বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি পরিচালক-সভার সদস্য শিক্ষাব্রতী এবং ছাত্ররূপে যুক্ত ছিলেন। সভাপতিরূপেও দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বিদগ্ধজনের নাম পাইতেছি। সহস্র সহস্র দুঃস্থ ছাত্র এখানে বিদ্যার্জন করিয়া নানা বিভাগে বিশেষতঃ বিদ্যা-প্রচারে এবং সংস্কৃতি-সংরক্ষণ বিষয়ে বঙ্গভারতীর মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র হিসাবে ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই কলেজ একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। আজ আমরা ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম অতীব শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি।

যুগে যুগে এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া যে সকল ছাত্র জীবনে বিস্তর উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বঙ্গ জননীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। আধুনিক কালে যাঁহারা বিদ্যাবত্তায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আদিত্য মুখোপাধ্যায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন খয়রা অধ্যাপক

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুনীতিকুমার ভাষাতত্ত্ববিদ্ হিসাবে দেশবিদেশের বুধ-মণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত। বাঙালী জাতির মধ্যে নব্য শিক্ষাপ্রসারে এই অবৈতনিক বিদ্যালয়টি শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ প্রশংসার সহিত কার্য করিয়া আসিতেছে।

———

বেথুন স্কুল ও কলেজ

হেদুয়ার—বর্তমান আজাদ হিন্দ্ বাগের পশ্চিমে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের উপর প্রাচীরবেষ্টিত একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। তাহার মধ্যে চারিটি ভবন—একটি প্রাচীন রীতিতে নির্মিত, অন্য তিনটি অপেক্ষাকৃত নূতন। এই প্রাচীন ভবনটিই মুখ্যতঃ বেথুন বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি দুই স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত। একটি কলেজ, অন্যটি স্কুল। কিন্তু দুইটির সঙ্গেই প্রতিষ্ঠাতা বেথুন সাহেবের নাম যুক্ত রহিয়াছে। মূল বিদ্যালয়টি বর্তমানে বেথুন কলেজিয়েট স্কুল নামে আখ্যাত। কলেজ বিভাগের নাম বেথুন কলেজ।

'মাধ্যমিক' পাঠশালা প্রসঙ্গে কলিকাতায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচেষ্টার বিষয় আমরা কতকটা জানিতে পারিয়াছি। মিশনারীদের আওতায় পরিচালিত ও পরিপুষ্ট বলিয়া ইহা হিন্দুসাধারণের মধ্যে গ্রাহ্য হয় নাই। বিদ্যালয়টি অবশেষে খৃষ্টান ছাত্রী ও মহিলাদের শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয়দের, বিশেষ করিয়া নব্য শিক্ষিতদের মনে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা খুবই অনুভূত হইতে থাকে। রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার প্রাচীন ও নবীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন এবং কার্যক্ষেত্রেও কতকটা অগ্রসর হন। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একযোগে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বারাসতে বাঙালীদের দ্বারা একটি প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায় তখনও অ-সাম্প্রদায়িক, হিন্দুদের

গ্রাহ্য কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই অভাব পূরণ করিতে গিয়াই বেথুন বিদ্যালয়ের জন্ম।

জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ১৮৪৮ সনের এপ্রিল মাসে বড়লাটের শাসন-পরিষদে আইনসচিব নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। উক্ত পদাধিকার বলে তিনি শিক্ষা-সমাজেরও ('Council of Education') সভাপতি হন। কথিত আছে, বারাসতে সরকারী বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়া বেথুন তথাকার বালিকা বিদ্যালয় সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন। কলিকাতায় এইরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপনে অতঃপর তাঁহার বাসনা হয়। রামগোপাল ঘোষ তখন শিক্ষা-সমাজের সদস্য এবং নব্যবঙ্গের প্রধান নেতা—বেথুন তাঁহার সঙ্গেই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। রামগোপাল বেথুন সাহেবের নিকট বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের লইয়া আসিয়া তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, এরূপ সাধু সঙ্কল্পে তাঁহাদের সম্মতিও পাওয়া গেল। রামগোপালের সতীর্থ বন্ধু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাবে বিশেষ আনন্দিত হইয়া সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার বৈঠকখানা ভবনটি বিনা ভাড়ায় বিদ্যালয়ের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার মূল্যবান গ্রন্থাগার এবং মির্জাপুরে পাঁচ বিঘা পরিমিত ভূমিও বিদ্যালয়ের জন্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

এইরূপ সহানুভূতি ও প্রতিশ্রুতির ফলে বেথুনের সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। তিনি ১৮৪৯ সনের ৭ই মে দক্ষিণারঞ্জনের গৃহে এই বিদ্যালয়টির দ্বার উন্মোচন করিলেন। প্রথম দিনে বিদ্যালয়ের ছাত্রী হইয়াছিল মাত্র একুশটি। এই একুশজন ছাত্রীর মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই কন্যা—ভুবনমালা ও কুন্দমালা। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে বেথুন সাহেব স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও পাঠ্য বিষয়াদি সম্বন্ধে

একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে অ-বেতনে শিক্ষাদান, প্রয়োজনীয় শিল্পাদি শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় ইহাতে আলোচিত হয়।

হিন্দু ভদ্রলোকদের কন্যাগণই এখানে পড়িতে পাইবে, বক্তৃতায় তিনি একথা স্পষ্ট করিয়া বলেন। এই নূতন বিদ্যালয়ের নামকরণ লইয়াও তখন বিভিন্ন আলোচনা চলিয়াছিল। তবে বেথুন প্রথম হইতেই ইহাকে 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' বা 'কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়' নামেই আখ্যাত করেন। এই বিদ্যালয় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ প্রেরণা যোগায়। ইহার প্রতিষ্ঠার অল্পকাল ব্যবধানে কলিকাতায় ও মফঃস্বলে—উত্তরপাড়া, সুখসাগর, নিবধুইয়ে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে। বারাসতের আদি বিদ্যালয়টি বেথুন-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের আদর্শে পুনর্গঠিত হইল।

ইহার পর বিদ্যালয়ের একটি স্থায়ী আবাস নির্মাণে বেথুন তৎপর হইলেন। মির্জাপুরে দক্ষিণারঞ্জনের জমির পার্শ্বে তিনিও সমপরিমাণ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন। কিন্তু শত বর্ষ পূর্বেকার কলিকাতার অবস্থা আজিকার মত ছিল না। মির্জাপুর তখন কলিকাতার উপকণ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত। হিন্দু মেয়েদের পক্ষে অত দূরে গিয়া পড়াশুনা করা সম্ভব ছিল না। একারণ বেথুন সাহেব উক্ত উভয় ভূমিখণ্ডের বিনিময়ে হেদুয়ার পশ্চিম দিকে বর্তমান বিদ্যালয়ের জমি বাংলা সরকারের নিকট হইতে লইলেন। ১৮৫০ সনের ৬ই নবেম্বর সাড়ম্বরে বিদ্যালয় ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইল। হেদুয়ার পূর্ব দিকস্থ জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশন (এখনকার স্কটিশ চার্চ কলেজ) হইতে 'মেসন'গণ শোভাযাত্রা করিয়া ঐ স্থানে আসেন। ডেপুটি গবর্ণর স্যার জন হার্বার্ট লিটলার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তদীয় পত্নী লেডী লিটলার বেথুন সাহেবের অনুরোধক্রমে ভূমিখণ্ডের এক কোণে

নারী জাতির উন্নতির প্রতীকস্বরূপ একটি অশোক বৃক্ষ রোপণ করিলেন। ইহার অনুকরণে সম্প্রতি বিদ্যালয়ের শত বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যেও একটি অশোক বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। ঐ সময়ে বেথুন যে বক্তৃতা দেন, তাহা নারী জাতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় মমত্ববোধেরই দ্যোতক। অশোক বৃক্ষ রোপণের প্রস্তাব করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন :

"I propose therefore henceforth that the Asoca tree be made the symbol of female education in India , and not only here, but by every school which has been already established in the villages round Calcutta in imitation of this, and near all these which shall hereafter be multiplied in the land, I suggest that an Asoca tree be planted, a new tree of liberty, to remind us of the bond of fellowship which unites our labours in one common cause,"

বেথুন এখানে অশোক-তরুকে স্ত্রী-শিক্ষা তথা স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতীক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার স্কুলের আদর্শে বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল—এই তরুটি হইবে তাহাদের সকলের মধ্যে যোগসূত্র।

বেথুন নিজে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা দেন। উত্তরপাড়ার জমিদার স্ত্রী-শিক্ষার অনুরাগী জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও দশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু বেথুন এই নূতন ভবনটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইতে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৮৫১ সনের ১২ই আগষ্ট জ্বররোগে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। কলিকাতার যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি তিনি প্রিয় স্কুলটিকে উইল করিয়া দিয়া যান।

১৮৫১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এই স্কুল নূতন ভবনে উঠিয়া আসে। ইহার পূর্বে কিছুদিন বিদ্যালয়টি গোলদীঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, এখন যেখানে কর্পোরেশন ২নং জেলা অফিস অবস্থিত, সেই স্থলে একটি পুরণো বাড়ীতে বসিত। শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কলিকাতার গণ্যমান্য বক্তিগণ নিজ নিজ কন্যাদের এখানে বিদ্যা শিক্ষার্থে ভর্তি করিয়া দেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার পাঠোপযোগী পুস্তক রচনা করিয়া ছাত্রিগণকে পড়াইতেন। বেথুন তাঁহাদিগকে বিশেষ আদর যত্ন করিতেন। বড়লাট ডালহৌসীর পত্নী লেডী ডালহৌসীও মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়ে গিয়া ছাত্রীদের পাঠোৎকর্ষ নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহারই নির্বন্ধাতিশয়ে বেথুনের মৃত্যুর পর লর্ড ডালহৌসী এই স্কুলটির যাবতীয় ব্যয়ভার নিজ স্কন্ধে বহন করেন।

এখানে থাকিতেই ডালহৌসী বিলাতের ডিরেক্টর-সভার সঙ্গে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে তাঁহার অবর্তমানে বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ভার সরকার গ্রহণ করিবেন। কাজেও তাহাই হইল। ১৮৫৬ সনের মার্চ মাসে ডালহৌসী ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যান। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন লর্ড ক্যানিং। নূতন বড়লাট-পত্নী লেডী ক্যানিংএর দৃষ্টি স্কুলটির প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি কলিকাতার নেতৃবৃন্দকে ইহার পরিচালনায় যোগদান করিতে আহ্বান করিলেন। পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হইলেও উক্ত সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ইহাকে একটি বে-সরকারী কমিটির পরিচালনাধীনে আনা হইল। ভারত সরকারের সেক্রেটারী সিসিল বীডন হইলেন এই কমিটির সভাপতি এবং সম্পাদক হইলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এখানে বলা আবশ্যক যে বেথুনের জীবিতকালেই বিদ্যাসাগর স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নূতন কমিটিরও তিনি সম্পাদক হইলেন।

কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি এই নূতন কমিটির সদস্যপদে বৃত হন।

ইহার পর হইতে প্রায় বার বৎসর পর্যন্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনা ভার এই কমিটির হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রথমে 'কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়' নামে স্কুলটি পরিচিত হইত বলিয়াছি। ১৮৬১-৬২ সনের শিক্ষাবিষয়ক বার্ষিক বিবরণে এটিকে সর্বপ্রথম 'বেথুন স্কুল' নামে আখ্যাত হইতে দেখি। স্কুলটি তখনও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র ছিল। সরকারী সাহায্যে এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অদম্য উৎসাহে মফঃস্বলে বহু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার বেথুন স্কুলের জন্য অতিরিক্ত অর্থব্যয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ ভাল চক্ষে দেখেন নাই। তাঁহাদের নির্দেশে ১৮৬৬ সনে ছাত্রীদের মাসে এক টাকা করিয়া বেতন ধার্য হইল। এই সময় বেথুন স্কুলের অনগ্রসর শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে বে-সরকারীভাবেও সমালোচনা হইতে থাকে। কতকটা এই কারণে এবং কতকটা কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের পরামর্শে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুতির জন্য ইহার সঙ্গে একটি নর্ম্যাল স্কুল স্থাপিত হইল এবং কমিটি ভাঙ্গিয়া দিয়া সরকার সরাসরি উভয়ের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বয়স্থা ছাত্রীর অভাবে তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহারা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় তুলিয়া দিতে বাধ্য হন। বেথুন স্কুলের পরিচালনাকার্য ১৮৭৩ সন হইতে পুনরায় একটি সরকারী কমিটির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই কমিটির সম্পাদক ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ।

মনোমোহনের সময়ে বিদ্যালয়টির যাবতীয় উন্নতি সূচিত হয়। এখানকার শিক্ষাপ্রণালী অনেকটা পরিমার্জিত হইল। তবে তখনও ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা দানের ব্যবস্থা হয় নাই। কেশবচন্দ্র সেনের শিক্ষয়িত্রী ও বালিকা বিদ্যালয়ে দেশীয় রীতি-প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা

প্রদত্ত হইতে থাকে বটে, কিন্তু তাহাতেও একদল লোকের অসন্তোষ প্রকাশ পায়। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় এবং পরে নাম পরিবর্তনান্তর বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় এই অভাব পূরণ করিতে অগ্রসর হইল। বেথুন স্কুলের সম্পাদক মনোমোহন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও বিশেষ-ভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা-যত্নে বেথুন স্কুল ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় মিলিত হইয়া একটি উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্র হইয়া উঠে। মিলন-কার্য সম্পন্ন হয় ১৮৭৮ সনের ১লা আগষ্ট। এই যুক্ত বিদ্যালয় বেথুন স্কুল নামেই পরিচিত হইতে থাকে; তবে ইহার সঙ্গে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের 'বোর্ডিং' ব্যবস্থারও সূচনা হইল। বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিসেস সেভিল সাময়িকভাবে বেথুন স্কুলের অধ্যক্ষ হইলেন। তখন অধ্যক্ষকে 'লেডী সুপারিণ্টেডেণ্ট বলা হইত।

বেথুন স্কুল হইতে এই বৎসরেই প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কাদম্বিনী বসু। সরকার এই সর্তে বৃত্তি দেন যে, তাঁহাকে এফ-এ পড়িতে হইবে। তখন মহিলাদের কলেজে পড়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কাদম্বিনী এফ-এ পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ১৮৭৯ সন হইতে বেথুন স্কুলে কলেজ বিভাগ খোলা হইল, আর ইহার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হইলেন শশিভূষণ দত্ত। ইহার পর ক্রমে বি-এ শ্রেণীও খোলা হয়। ১৮৮৩ সনে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু এখান হইতে প্রথম বি-এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। ইতিপূর্বে মেডিক্যাল কলেজে নারীদের ভর্তি করা হইত না। এই জন্য অবলা দাসকে (পরে লেডী অবলা বসু) মাদ্রাজে গিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইতে হয়। ১৮৮৩ সনে এই বাধা বিলুপ্ত হয় এবং কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (এই সময় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়) সর্বপ্রথম কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রীরূপে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষায়ও নারীরা

অগ্রসর হইলেন। চন্দ্রমুখী বসু বেথুন স্কুলের কলেজ বিভাগ হইতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বেথুন কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ।

বাংলা দেশে—কলিকাতায় ও মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থলে নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে নানা সভা-সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে কলিকাতার বামাবোধিনী সভা উত্তরপাড়া হিতকরী সমিতির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'বামাবোধিনী পত্রিকা' স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে বিশেষ সহায় হন। নারিগণ সাহিত্য-সেবায় ও সাময়িকপত্র সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ-সেবাদি বিষয়ে এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলন পরিচালনায় মহিলারা তৎপর হন। এ সকলেরই মূল আমরা বেথুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের মধ্যে লক্ষ্য করি। স্ত্রী-শিক্ষা তথা স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে ইহার প্রেরণা কখনও ভুলিবার নয়। ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, অধ্যক্ষ চন্দ্রমুখী বসু, লেডী অবলা বসু, কবি কামিনী রায়, সরলা দেবী-চৌধুরাণী, জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, কুমুদিনী বসু প্রমুখ ছাত্রিগণের কার্য-কলাপ বাঙালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছে।

দেশের জাতীয় উন্নতি-প্রচেষ্টার আহ্বান যখন আসে, তখনও এই বিদ্যালয়টি পশ্চাৎপদ হয় নাই। দেশীয় শিল্পাদির প্রসার উদ্দেশ্যে এখানে শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইত। গত শতাব্দীর শেষ দিকে স্বর্ণকুমারী দেবী সখি-সমিতির আনুকূল্যে পুরাপুরি একটি নারীশিক্ষা প্রদর্শনীর আয়োজন করেন বেথুন স্কুল ভবনে। এই উপলক্ষ্যে নারীদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' নাটকখানি অভিনীত হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের অধিবেশনও হয় এই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। গায়কোয়াড়ের মহারাণী লেডী চিমনবাঈ সভানেত্রীর অভিভাষণে বঙ্গমহিলাদের স্বাদেশিকতার গুণগান করেন। বেথুন বিদ্যালয় নানা কারণেই সংস্কৃতির কেন্দ্র হইয়া উঠে।

প্রেসিডেন্সী কলেজ

ইতিপূর্বে 'হিন্দু কলেজ' ও 'সংস্কৃত কলেজ' অধ্যায়ে হিন্দু কলেজ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজ হিন্দু কলেজেরই অনুক্রম। ১৮৫৪ সনের মাঝামাঝি বিলাতের ডিরেক্টর সভার অনুমোদন সাপেক্ষে দুইটি প্রতিষ্ঠানের কার্য আরম্ভ হয়। ডিরেক্টর সভার অনুমোদন-পত্র এখানে আসিয়া পৌঁছে ঐ বৎসরের ১৩ই সেপ্টেম্বর। ১৮৫৪ সনটি শিক্ষার ইতিহাসে অত্যন্ত স্মরণীয়। ১৮৫৪, ১৯শে জুলাইয়ের যে শিক্ষাবিষয়ক বিধান-পত্র বিলাতের কর্তৃপক্ষ এদেশে প্রেরণ করেন তাহাতে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব সরকারীভাবে ঘোষিত হয়। উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন শিক্ষার যথোচিত আয়োজন, সরকারী শিক্ষা বিভাগ গঠন এবং শিক্ষার বাহন সম্পর্কীয় কথাও এই বিধানে ছিল।

কলিকাতার প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে প্রেসিডেন্সী কলেজকে কেন্দ্র করিয়া কার্যে অগ্রসর হয় তাহার উদ্যোগ-আয়োজন সুরু হইল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবসে (২০শে জানুয়ারী, ১৮১৭) কলেজের অন্যতম উদ্যোক্তা ও দেশীয় সেক্রেটারী দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'আজ হিন্দু কলেজের যে বীজ উপ্ত হইল, কালে তাহা বিরাট বটবৃক্ষে পরিণত হইবে।' অধ্যক্ষ-সভা এবং শিক্ষা-সমাজের 'দ্বৈত শাসনে' হিন্দু কলেজের এতদিন আশানুরূপ উন্নতি হইতে পারে নাই। কলেজের অনুক্রম প্রেসিডেন্সী কলেজ ১৮৫৪ সনের মধ্যভাগ হইতেই পুরাপুরি সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আসে। ডিরেক্টর-সভা কর্তৃক অনুমোদন লাভে এবং প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্বরূপ ইহার পুনর্গঠনের

আয়োজনে দেওয়ান বৈদ্যনাথের প্রতিষ্ঠাকালীন স্বপ্ন কার্যে পরিণত হইতে চলিল।

স্থাপনাবধি কলেজ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়—১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ বর্ষ। এই চারি শ্রেণীতে সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। ইহাকে বলা হইত সাধারণ বিভাগ। ইহা ছাড়া কলেজের আরও দুইটি বিভাগ ছিল—(১) আইন বিভাগ ও (২) ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ। আজ এই দুইটি বিভাগের কতই উন্নতি আমরা দেখি। ইহাদের গোড়া পত্তন হইল হিন্দু কলেজে। আইন অধ্যাপনা আরম্ভ হয় ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে। ইহার প্রথম অধ্যাপক ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিষ্টার থিয়োডোর ডিকেন্স। দ্বিতীয় অধ্যাপক ছিলেন স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে আইন বিভাগ উঠিয়া যায়। পরে ১৮৪১ সনে ইহা পুনরুজ্জীবিত হয়। এই বৎসর হইতে কলেজে সার্ভেয়িং বা জরিপ-বিদ্যা শিখাইবারও ব্যবস্থা হইল। ইহাকে সূত্র করিয়াই পরে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ গঠিত হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজ উত্তরাধিকার-সূত্রে এই দুই বিভাগের ভার গ্রহণ করিল। ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ যদিও প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্তর্ভুক্ত হইল তথাপি ইহার নাম দেওয়া হইল 'সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ'। অধ্যাপনা ও পরি-চালনার সুবিধার জন্য ১৮৫৬ সনের ২৪শে নভেম্বর ইহাকে রাইটার্স বিল্ডিংসে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৬৪, নভেম্বর মাসে পুনরায় ইহা এখানে চলিয়া আসে। এ সম্বন্ধে পরে আরও কিছু বলিতে হইবে।

আগেই বলিয়াছি, প্রেসিডেন্সী কলেজকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়। এই বিষয় একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। ১৮৫৪ সনের শিক্ষাবিষয়ক বিধানের নির্দেশ-

বলে ভারত-সরকার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন-উদ্দেশ্যে গণ্যমান্য ইউরোপীয় ও দেশীয়দের লইয়া এক কমিটি গঠন করেন। কমিটির পরিকল্পনা রচনা সমাপ্ত হইলে বড়লাট যথারীতি সরকারীভাবে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন (১২ই ডিসেম্বর ১৮৫৬)। ১৮৫৭ সনের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যও অবিলম্বে আরম্ভ হয়। আজিকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয় একটি উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। তখন কিন্তু ইহা এমনটি ছিল না। প্রতিষ্ঠাবধি দীর্ঘকাল যাবৎ ইহা পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্ররূপে বিরাজিত ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজ ছিল উচ্চতম বিদ্যা অধ্যয়নের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। মফঃস্বলস্থ কলেজ সমূহে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষার তেমন আয়োজন ছিল না, বলাই বাহুল্য। কলেজের অধ্যক্ষ জেমস্ সি, সাট্‌ক্লিফ একক্রমে বার বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বা প্রধান কর্মকর্তার পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম এণ্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হয় ১৮৫৭, মার্চ মাসে। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ২৩ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইল। ২২ জন প্রথম বিভাগে ও ১ জন দ্বিতীয় বিভাগে। প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে কলেজের যে-কোন শ্রেণী হইতে ছাত্রেরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিত। ১৮৫৯ সনে স্থির হয় যে, কলেজ হইতে কেহ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবে না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদেরই কলেজে ভর্তি করা হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ-এ পরীক্ষার সূচনা হয় ১৮৬২ সনে। ইহার পূর্বে প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে বিভিন্ন কলেজের সেশন শেষ হইলে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা লওয়া হইত। ১৮৬০ সনে শিক্ষা-বিভাগের আদেশে মফঃস্বল কলেজের সকল সিনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইতে থাকে। ফলে একদিকে যেমন

এখানকার ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল অন্যদিকে তেমনি বঙ্গের উৎকৃষ্ট ছাত্রগণই এখানে আসিয়া ভিড় জমাইল।

আর একটি কারণেও কলেজের ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৫৬ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন বিভাগ হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রেরা সদর আদালতে উকিল এবং মুন্সেফ হইবার অধিকার লাভ করেন। আজকালকার মত তখনও আইনের তিনটি শ্রেণী ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এখানে প্রায় তিন বৎসর আইন অধ্যয়ন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম সম্বলিত ১৮৫৮ সনের আইন বিভাগের রেজিষ্ট্রী বহি কলেজে সযত্নে রক্ষিত হইতে দেখিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি-এ পরীক্ষা গৃহীত হয় ১৮৫৮ সনে। প্রেসিডেন্সী কলেজের সাধারণ বিভাগ হইতে ৪ জন এবং আইন বিভাগ হইতে ২ জন এই পরীক্ষা দিলেন। ইহাদের মধ্যে দুইজন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন—আইন-বিভাগের শেষ তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আর সাধারণ বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র যদুনাথ বসু। যদুনাথ পূর্ব বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে সিনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররূপে কলেজে অধ্যয়নে রত ছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজ যে বাঙ্গলার যাবতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল তাহার মূলে নানা কারণই বিদ্যমান ছিল। পূর্বে বলিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা প্রেসিডেন্সী কলেজেই প্রথম অবলম্বিত হয়। নানা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়াও কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছু পরিমাণ অর্থ নিজ ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। এই অর্থের বার্ষিক সুদ হইতে উচ্চতম বিদ্যা অর্থাৎ এম-এ অধ্যয়নরত ছাত্রদের কতকগুলি বৃত্তি

দেওয়ারও বন্দোবস্ত হয়। এই বৃত্তিগুলির নাম এবং মাসিক হার এইরূপ :

বর্ধমানরাজ বৃত্তি	৫০৲
দ্বারকানাথ ঠাকুর বৃত্তি	৫০৲
বার্ড বৃত্তি	৪০৲
রায়ান বৃত্তি	৪০৲

ইহা ছাড়া ৩০৲ মূল্যের তিনটি মাসিক বৃত্তি দানের বিষয়ও স্থির হয়। শিক্ষাবিভাগ মূলধনের উদ্বৃত্ত আয় হইতে ১৮৬৩ সনে দশটি বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। ১৮৬১ সন হইতে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদেব নিকট হইতে আংশিক বেতন লওয়া হইতে থাকে। অবশ্য বহরমপুব ও কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রেরা ছিল ইহার ব্যতিক্রম।

প্রেসিডেন্সী কলেজের বর্তমান প্রাসাদোপম হর্ম্যরাজি এবং সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ ও খেলার মাঠ দেখিয়া ইহার পূর্বরূপ কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৫৪, জুন মাস হইতে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয় বটে, কিন্তু ইহার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্মাণের তখন কোন ব্যবস্থা হয় নাই। পূর্বতন হিন্দু কলেজ ভবনের পশ্চিম অংশে প্রেসিডেন্সী কলেজের কয়েকটি শ্রেণী বসিত। অবশিষ্ট শ্রেণীগুলির জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয় কলেজ-ফটকের প্রায় বিপরীত দিকে রামকমল সেনের বাড়ীতে। এই বাড়ীর দ্বিতলে পূর্বে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপটেন রিচার্ডসন থাকিতেন। পরবর্তী কালে এলবার্ট হলের প্রতিষ্ঠা হয় এই গৃহে। বর্তমানে ইহা নিশ্চিহ্ন হইয়া ইহার উপরে বিরাট এলবার্ট বিল্‌ডিংস নির্মিত হইয়াছে।

আজিকার প্রেসিডেন্সী কলেজের মূল ভবনের জমির একাংশে হেয়ার স্কুল নিজ নূতন বাড়ীতে উঠিয়া গেলে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের কার্য এখানে আরম্ভ হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্মাণের আবশ্যকতা বরাবর অনুভূত হইতেছিল, ভূমিও ক্রমশঃ ক্রয়

করা হয়। উক্ত ১৮৭২ সনেই বর্তমান মূল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক স্থাপন করেন। নির্মাণ কার্য শেষ হইলে ১৮৭৪ ৩১শে মার্চ তৎকালীন ছোট লাট স্যার জর্জ ক্যামবেল নূতন ভবনের দ্বার উন্মোচন করেন। পরবর্তী এপ্রিল মাসেই কলেজের যাবতীয় বিভাগ এখানে উঠিয়া আসে। নফরচন্দ্র পালচৌধুরীর প্রদত্ত অর্থে 'টারেট ক্লক' স্থাপিত হওয়ায় কলেজভবনের সৌষ্ঠব আরও বাড়িয়া যায়।

কলেজের ইঞ্জিনীয়ারিং এবং আইন বিভাগ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব। ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে তিন বৎসর ছাত্রদের অধ্যয়ন করিতে হইত। সরকার ঘোষণা করেন যে, ১৮৭২ সনে সাব্ ডেপুটিগিরির পরীক্ষায় ছাত্রদের সার্ভেয়িং ও ইঞ্জিনীয়ারিং সম্পর্কে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। এইজন্য ১৮৭১, নবেম্বর মাস হইতে এই বিভাগে বিশেষ শ্রেণী খোলা হয়। ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ দীর্ঘকাল প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া অবশেষে ১৮৮০ সনে উঠিয়া যায় হাওড়া শিবপুরে বিশপস্ কলেজের পরিত্যক্ত বাড়ীতে। উক্ত সনের ৫ই এপ্রিল হইতে এখানে পঠন-পাঠন আরম্ভ হইল। পূর্বে একমাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজেই আইন অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। অষ্টম দশক হইতে বিভিন্ন কলেজে ছাত্রদের নিকট হইতে অল্পতর বেতন লইয়া আইন-শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে ১৮৮৫, ১লা জানুয়ারী এখানকার আইন শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও রহিত হইয়া যায়।

নূতন ভবনে আসার পর হইতেই প্রেসিডেন্সী কলেজের বিভিন্ন বিভাগের বিশেষ উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে আইন ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের দায়িত্বভার মুক্ত হইয়া সাধারণ বিভাগের উন্নতিকার্যে কলেজে অধিকতর মনঃসংযোগ করে। সাধারণ বিভাগে আর্ট ও সায়ান্স—জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাদিও সুরু হইল। বিবিধ বিদ্যার অধ্যাপকগণের নাম শুধু

বাঙ্গলা বা ভারতবর্ষে নহে, অন্যান্য দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীরাও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিয়া থাকেন। পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ প্রসন্নকুমার রায়, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতাগ্রগণ্য ও শিক্ষাব্রতীদের নাম কে না জানেন? শ্রী অরবিন্দের অগ্রজ সুকবি মনোমোহন ঘোষ গত শতাব্দীতেই এখানে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনাকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। আচার্য যদুনাথ সরকার ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে এখানে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইংরেজ তথা ইউরোপীয় অধ্যাপকগণও বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণা যেমন সুফলপ্রসূ হইয়াছে এমনটি বোধ হয় আর কিছুতে হয় নাই। বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্যই হিন্দু কলেজকে সংস্কৃত কলেজের বিরাট ভবনে স্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, পূর্বে আমি একথা বলিয়াছি। তদবধি বিজ্ঞান-শিক্ষার স্রোত কখনও মন্দীভূত হয় নাই তবে স্থানাভাব হেতু ইহা তেমন প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। নূতন ভবন নির্মাণের সূচনাতেই স্যার আলেকজাণ্ডার পেডলার ভারত সরকারের নিকট হইতে নিয়োগপত্র লইয়া কলিকাতায় আসেন এবং রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে ১৮৭৩ সনে ৮ই মে কার্যে যোগ দেন। তিনি বিলাত হইতে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতিও ক্রয় করিয়া লইয়া আসিলেন। নবনির্মিত বিরাট ভবনে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার গবেষণাগার স্থাপিত হইল। ১৮৭৫ সনে পুনরায় বহু যন্ত্রপাতি কেনা হয়। বিজ্ঞানের গবেষণাগারে বিভিন্ন কলেজের ছেলেরাও আসিয়া গবেষণা করিতে পারিত। আনন্দমোহন বসু ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থায়ই উচ্চ-গণিতে বিশেষ

কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। বহু প্রতিভাশালী ছাত্র শাসন বিভাগীয় উচ্চপদে নিযুক্ত হওয়ায় বিজ্ঞানের গবেষণায় কৃতিত্ব দেখাইতে অপারগ হন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে বলিতে গেলে প্রথমেই দুই জন মহামনীষীর নাম আমাদের মনে উদিত হয়। তাঁহারা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। জগদীশচন্দ্র পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপকরূপে ১৮৮৫ সনের ৭ই জানুয়ারী তারিখে কর্ম গ্রহণ করেন। তদবধি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পদার্থবিদ্যার গবেষণায় তিনি যে সকল নিত্য নূতন আবিষ্কার করিতেছিলেন তাহা পাণ্ডিতমণ্ডলীকে ক্রমশঃ তাক লাগাইয়া দিতে থাকে। ভারতবর্ষ অধ্যাত্মবিদ্যার দেশ, কিন্তু জড়বিজ্ঞানের আলোচনা গবেষণায়ও সে একদা সকলের শীর্ষ-স্থানে উঠিয়াছিল এ ধারণা বিশ্ববাসী প্রায় ভুলিতেই বসে। প্রেসিডেন্সী কলেজ-ভবনেই জগদীশচন্দ্র বেতারে সংবাদ আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া গবেষণাদ্বারা অবগত হন এবং অন্যদেরও অবগত করান। এই বিষয়ে অধিকতর গবেষণা করিয়া মার্কনি পরে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। আচার্য বসুর অন্যতম প্রধান কীর্তি বৃক্ষ ও ধাতু দ্রব্যের প্রাণ-স্পন্দন আবিষ্কার। তিনি পরবর্তীকালে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবতত্ত্ববিষয়ক গবেষণার সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৫ই জুন ১৮৮৯—২রা নবেম্বর, ১৯১৬) প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে আর একজন চিরস্মরণীয় ব্যক্তি। রসায়ন-শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপকরূপে কলেজে তাঁহার কার্যারম্ভ হয়। বহু বৎসর পরে তিনি অধ্যাপকপদে উন্নীত হইয়া-ছিলেন। তিনি রসায়নের ইতিহাস দুই খণ্ডে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়াছেন, অতীতযুগে ভারতবাসীরা বিজ্ঞানের

এই বিভাগে কতখানি কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। রসায়নের গবেষণাগার তাঁহার গবেষণায় ধন্য হইয়াছে। তিনি ভারতের একজন রসায়নবিদ্ বলিয়া সুধীসমাজে স্বীকৃত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কৃতিত্ব এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি কলেজের ছাত্রবৃন্দের মনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে মৌলিক গবেষণাস্পৃহা জাগ্রত করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে ছাত্রদল পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞানের নিত্যনূতন আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। আবিষ্কৃত বিষয়াদি স্বদেশের কৃষিশিল্পের উন্নতিকল্পে, এককথায় দেশবাসী জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত করিতেও তাঁহারা যথেষ্ট প্রেবণা পাইয়াছেন। আমি আমার আলোচনা হইতে বর্তমান শতকের কথা ইচ্ছা করিয়াই বাদ দিতেছি। তথাপি দুই একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম না করিয়া পারি নাই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া বর্তমান যুগের যে সকল প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের গবেষণায় অগ্রসর হন তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ মেঘনাথ সাহা, ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডঃ বসিকলাল ধব, ডঃ জ্ঞান চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডঃ শিশিরকুমাব মিত্র, ডঃ নীলরতন ধর প্রভৃতিব নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। বিজ্ঞানেব গবেষণালব্ধ তথ্যকে স্বদেশের সেবায় নিয়োজিত করিতে ইহারা অনেকেই তৎপর।

আর একটি বিষয়েও প্রফুল্লচন্দ্র পথপ্রদর্শক হইয়া আছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি বাঙ্গালাভাষায় ছেলেদের বুঝাইয়া দিতেন। ইহার পূর্বে এ রেওয়াজ প্রচলিত ছিল না। আচার্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ ভবনের যে যে অংশে নিজ নিজ গবেষণাকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমেত তাহার স্মৃতিফলক সেই সেই স্থলে খোদাই করিয়া রাখা আবশ্যক। সেইসব স্থল ভারতবাসীর নিকট আজ তীর্থক্ষেত্র।

প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয় অধ্যাপনারও

প্রথম ব্যবস্থা হইল। বাঙ্গলা সরকার ১৮৮৮ সন হইতে ভূতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব এবং উদ্ভিদবিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৮৯২ সন হইতে ভূবিদ্যা পড়াইবার আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। টমাস হল্যাণ্ড ইহার প্রথম অধ্যাপক হইয়া আসিলেন। অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের উপরে ১৯০০ সন হইতে প্রাণিবিদ্যা অধ্যাপন.র ভার অর্পিত হয়। উদ্ভিদবিদ্যা পঠন-পাঠনেরও ব্যবস্থা হইল। এই বৎসরে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার গবেষণাগার পুনর্গঠিত হইল। কলেজ ভবনের ছাদের উপবে একটি মানমন্দির কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই বৎসরই আলিপুর হাওয়া-অফিসে ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য একটি ম্যাগ্-নেটিক্ অব্জারভেটরী নির্মিত হয়। উচ্চাবচ ভূমি জরিপের জন্য থিওডোলাইট যন্ত্রপাতির কতকগুলি সার্ভেয়র-জেনারেল কলেজকে অর্পণ করেন। পদার্থবিদ্যা, শারীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ তত্ত্ব ও পবিসংখ্যান বিভাগ এখন যে বিরাট অট্টালিকায় রহিয়াছে, তাহা বর্তমান শতকের প্রথম দিকে তৈরী হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৯০২-০৭ সন পর্যন্ত কমার্শিয়াল ক্লাস ছিল। শেষোক্ত বৎসর ইহা স্থানান্তরিত হয়। গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটের (গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্স) ইহাই সুচনা। কলেজ-কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের ব্যায়ামচর্চার দিকেও বিশেষ অবহিত ছিলেন। খেলাধূলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার কলেজের একটি প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু। ১৮৭৯ সনে কলেজের ব্যায়ামশালা গঠিত হয়। ১৮৯১ সন হইতে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের কয়েকটি সর্ত সাপেক্ষে শরীরচর্চা আবশ্যিক করা হয়। ছাত্রদের বসবাসের সুব্যবস্থার নিমিত্ত হিন্দু হোষ্টেলও তৈরী হইল। কলেজের গ্রন্থাগার—সাধারণ এবং বিজ্ঞান উভয় বিভাগই বিশেষ সমৃদ্ধ। সকল দিক হইতেই গত শতাব্দীতে প্রেসিডেন্সী কলেজ একটি আদর্শ শিক্ষা তথা সংস্কৃতি

কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইহা ক্রমে একটি 'টিচিং ইউনিভার্সিটি' বা উচ্চতম বিদ্যাশিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মূল রূপ অনেকাংশে বদলাইয়া এই ভার গ্রহণ করায় উক্ত সম্ভাবনা আর রহে নাই। তথাপি এই কলেজটিকে একটি বিশিষ্ট জাতীয় গৌরব ও সম্পদ বলিয়া আমরা মনে করি।

কলা-মহাবিদ্যালয়

কলিকাতার যাদুঘর বা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ভারতবাসীর একটি প্রধান আকর্ষণ। দক্ষিণ পার্শ্বে ইহারই সংলগ্ন একটি স্বতন্ত্র বাটিতে অবস্থিত এই কলা-মহাবিদ্যালয় এখনও সাধারণের দৃষ্টি তেমনভাবে আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আর্ট স্কুল বা আরও পোষাকী 'গবর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্টস্' নামে এই বিদ্যালয়টি এতদিন পরিচিত ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা কলেজে পরিণত হইয়াছে ও উক্ত নামেই পরিচিত হইতেছে। প্রতিষ্ঠাকালে কিন্তু ইহার নাম ছিল অন্য, বাঙলায় পাইতেছি 'শিল্প বিদ্যালয়'। ইহার ইংরেজী নাম ছিল 'Industrial School of Art.'

সে আজিকার কথা নয়। শতাধিক বৎসর পূর্বে এই বিদ্যালয়ের জন্ম। তখনকার দিনের বিদগ্ধ ইংবেজ বাঙালী অন্ততঃ সংস্কৃতি বিষয়ে একযোগে কার্য করিতে দ্বিধা করিতেন না। এই শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ও তাঁহারা সমান তৎপর হইলেন। ১৮৫৪ সনের ৬ই এপ্রিল সাধারণের নিকট একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইল: বারোজন গণ্যমান্য দেশী-বিদেশী ব্যক্তি মিলিয়া একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন—উদ্দেশ্য ঐরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। সভার নাম পাইতেছি 'শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা'। ইংরেজীতে নাম দেওয়া হয়—'Industrial Art Society'। সভাপতি কর্ণেল ই. গুডউইন। তিনি বেথুন সোসাইটিতে ১৮৫৪ সনের প্রথমে ভারতে শিল্পবিদ্যা অনুশীলন সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক ইহার অনুকূল আলোচনাও করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা হইতেই সভার উৎপত্তি।

শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদক ছিলেন দুইজন শাসন বিভাগের হজসন প্রাট এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সভাপতি ও সম্পাদক বাদে সদস্য ছিলেন পনর জন। ইঁহাদের নাম আজ নানা কারণে স্মরণীয় হইয়া আছে। সিসিল বীডন, পাদরী লঙ, ডঃ সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, হেনরি উড্রো প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ ছিলেন সদস্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

সভার পক্ষে সম্পাদকদ্বয়ের স্বাক্ষরে ১৮৫৪, ৬ই এপ্রিল তারিখে যে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয় তাহাকে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান-পত্রও বলা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। ১৮৫৪, ২৫শে মে 'সম্বাদ ভাস্কর' হইতে এই বিজ্ঞপ্তির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:

"শিল্পবিদ্যা শিক্ষার উৎসাহার্থে এতন্নগরে এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, তৎকর্তৃক আদেশিত হইয়া আমরা সাধারণের শিক্ষোপযুক্ত একটি প্রকাশ্য বিদ্যালয় সংস্থাপনের নিমিত্ত মহাশয়দিগের সাহায্য যাচ্ঞা করিতেছি। উক্ত বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা, কাষ্ঠ, ধাতু, প্রস্তরাদির তক্ষণ-বিদ্যা ও মৃৎপাত্র পুত্তলিকাদির গঠনোপযোগী বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

"দেশীয় শিল্প সাধ্য ব্যবসায়ের উৎসাহ ও তদুন্নতি চেষ্টা, এতদ্দেশে চিত্রকর ও তক্ষকের অভাব নিরাকরণ করা এবং হিন্দু, মোসলমান এবং ইংরাজ সন্তান যাহারা কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিয়া পরে উপজীবিকা প্রাপ্তির ক্লেশ পাইতেছে, তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যবসায় প্রস্তুত করা প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ্য এবং তৎকার্য সকল করণাভিপ্রায়ে এই সাহায্য প্রত্যাশা করা যাইতেছে।.........

"প্রাচীন রীত্যনুসারে কায়িক শ্রমসাধ্য শিল্প অশিক্ষিত

ব্যক্তিবর্গের হস্তে সমর্পণ করাতে তদুন্নতির প্রতি যে হানি হইয়াছে এই বিদ্যালয় সংস্থাপন তাহার দূরীকরণের প্রতি এক প্রধান কারণ হইবে।"

এই বিজ্ঞপ্তি বা অনুষ্ঠানপত্রখানিতে আরও বহু মূল্যবান উক্তি করা হইয়াছে। আমাদের শিক্ষা শতাব্দীকাল পূর্বেই পুঁথিগত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে মানসিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। অনুষ্ঠানপত্রে এ সম্পর্কে বলা হয়, 'এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গের মনকে স্বাধীন করণার্থে সকল মনোবৃত্তি চালনা করা অত্যাবশ্যক'। আর এই জন্যই প্রস্তাবিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। ইহা পাঠে আরও জানা যায়, মাদ্রাজে ইতিপূর্বেই একটি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

উক্ত দিবসীয় 'সম্বাদ ভাস্করে' শিল্প বিদ্যালয় আশু প্রতিষ্ঠার জন্য আদায়ীকৃত অর্থ ও দাতাদের নামেরও এক ফিরিস্তী প্রকাশিত হয়। তাহাতে দেখা যায়, ইংরেজগণ বাদে বঙ্গের নেতৃস্থানীয় বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই ভাণ্ডারে এককালীন অর্থ দান করিয়াছেন এবং মাসিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। দাতাদের মধ্যে প্রতাপ-চন্দ্র সিংহ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সত্যচরণ ঘোষাল ও রাজেন্দ্র দত্তের নাম পাইতেছি। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে বর্ধমানের মহারাজা এককালীন পাঁচশত টাকা ইহার অর্থ ভাণ্ডারে দান করেন।

শিল্পবিদ্যা শিক্ষাগারের কার্য আরম্ভ হয় ১৮৫৪, ১৬ই আগষ্ট সোমবার দিবসে। প্রত্যহ বৈকাল ৪টার সময় ক্লাস বসিবে। প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য মাসিক বেতন ধার্য হয় এক টাকা, দুইটি বিষয় শিখিলে দেড় টাকা মাত্র লাগিবে কথা থাকে। অঙ্কন-শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে শ্লেট ও শ্লেট পেন্সিল সঙ্গে আনিতে হইবে।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ দিয়া পরবর্তী ২২শে আগষ্ট 'সংবাদ ভাস্কর' লেখেন :

"শিল্পবিদ্যা শিক্ষালয়। পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ করুন এই বিদ্যালয় সংস্থাপন সম্ভাবনায় আমরা পূর্বে বিস্তারিত প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম এবং শিল্প বিদ্যা শিক্ষায় যে যে উপকার এ প্রস্তাব মধ্যে তাহা প্রদর্শন করাইয়াছি, এক্ষণে আনন্দিত হইয়া বলিতেছি শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুরদিগের গরাণহাটার প্রশস্ত বাটীতে বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ হইয়াছে, প্রতিদিন ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।...... "

১৮৫৮ সন পর্যন্ত শিল্প বিদ্যালয় গরাণহাটায় অবস্থিত ছিল। ইহার পর ১৮৫৯ সনে কলুটোলায়, এখন যেখানে মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু চিকিৎসালয় অবস্থিত, সেখানে একটি বাড়ীতে বিদ্যালয় উঠিয়া আসে। এখানে বিদ্যালয়টি চারি বৎসর (১৮৫৯—৬৩) ছিল। ইহার পর চলিয়া যায় শিয়ালদহের সন্নিকটে বৌবাজার ও বৈঠকখানার মোড়ের কাছাকাছি ১৬৩।১৬৪নং বাটীতে। ১৬৫।১৬৬নং বাটীতে বিদ্যালয়ের আর্ট-গ্যালারি ছিল। ১৮৬৪—৯২, এই দীর্ঘ আঠাশ বৎসর এইখানে বিদ্যালয়টি বসিত।

শিল্প বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা প্রকাশিত হইলেই দেশী-বিদেশী প্রধানেরা এককালীন ও মাসিক সাহায্য করিতে অগ্রসর হন, বলিয়াছি। এই দান এবং ছাত্র বেতনেই স্কুলের ব্যয় নির্বাহিত হইত। তবে প্রথম দশ বৎসরে সরকারী সাহায্য মাঝে মাঝে যৎসামান্য পাওয়া যাইত। সরকার ১৮৬৪ সনে বিদ্যালয়টির সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন। তদবধি ইহা পুরাপুরি সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়, নাম হইল 'গবর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্টস্'। ১৮৯২ সনে আর্ট স্কুলটি যাদুঘরের দক্ষিণ পার্শ্বে নিজ আবাসে উঠিয়া আসে।

ইউরোপীয় শিল্পাদর্শে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হইত। বিদ্যালয়টির প্রথম যুগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা) এখানকার ছাত্র ছিলেন। ১৮৭৯ সনের শিল্প-প্রদর্শনীর চিত্র-তালিকায় বাঙ্গালী, অ-বাঙ্গালী এবং ইংরেজ শিল্প-শিক্ষার্থীর বিস্তর নাম পাইতেছি। ইহা হইতেও বুঝা যায়, প্রতিষ্ঠাপন্ন পরিবারের ছেলেরাও শিল্পবিদ্যা শিক্ষার জন্য এখানে আসিতে কসুর করিত না।

কিন্তু তখনও যে শিল্প বিদ্যালয়ের আসল কার্য সুরু হয় নাই, অবনীন্দ্রনাথের 'জোড়াসাঁকোর ধারে' পাঠে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। আমরা তখন ইউরোপের অনুকরণে লালায়িত। বড়-ছোট যাবতীয় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিদেশ হইতে আমদানী হওয়ায় স্বদেশের শিল্প ও শিল্পীরা 'জীয়ন্তে মরা' হইয়া পড়ে। তখন আদর্শ বিকৃত, বস্তু বিদেশী—আমাদের আপনার বলিয়া কোন কিছু আছে, এমন বিশ্বাসও আমরা যেন হারাইতে বসিয়াছি। শিল্প-বিদ্যালয়ে ই বি হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের নিয়োগে এই অধোগতির পথ অনেকটা রুদ্ধ হইলে আমরা আত্মস্থ হইবার পথ পাইলাম। শিল্পবিদ্যালয়ে যে নূতন ধারা প্রবর্তিত হয়, তাহাতে আদর্শহীন মৃতপ্রায় জনসমাজে প্রাণরস সিঞ্চিত হইল। বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে ইহার গুরুত্ব যে কত অধিক এ পর্যন্ত আমরা তাহা বুঝিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

অধ্যক্ষ হ্যাভেল ভারতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। শিল্পের প্রতি ভারতসন্তানদের সত্যকার অনুরাগ জন্মাইতে হইলে চারুশিল্প, কারুশিল্প উভয়েতেই ভারতীয় আদর্শ ও নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—হ্যাভেল ইহা বিশ্বাস করিতেন। ইউরোপীয় শিল্পাদর্শের পরিবর্তে ধীরে ধীরে দেশীয় রীতি প্রবর্তনের মূলে রহিয়াছে তাঁহার মঙ্গলহস্ত। অবিলম্বে হ্যাভেল তাঁহার একজন যোগ্য

সহকর্মী পাইলেন অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে। অবনীন্দ্রনাথ এতদিন শিল্প-বিদ্যা চর্চা করিয়াছেন, কিন্তু চাকরীর ভাবনা কখনও তাঁহার ছিল না। ১৮৯৮—৯৯ সনে কলিকাতার প্লেগ আমাদের নিকট 'শাপে বর' হইল। সদ্য কন্যাহারা অবনীন্দ্রনাথকে হ্যাভেল সাহেব একরূপ জোর করিয়াই আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল বা উপাধ্যক্ষের পদে আনিয়া বসাইলেন। সোনায় সোহাগা। একদিকে হ্যাভেল, অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথ। হ্যাভেলের দরদ অবনীন্দ্রনাথকেও অভিসিঞ্চিত করিয়া ফেলিল। সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ে সত্যসত্যই খাঁটি 'স্বাদেশিকতার' পত্তন হইল। ভারতের যত রকম শিল্প-রীতি, তাহা ছাত্রদের দ্বারা আয়ত্ত করার প্রয়াস তো চলিলই, আবার কারুবিদ্যার নূতন করিয়া শিক্ষাও সুরু হইল। অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, দেউলকোর ধরনে খাটের পায়া নির্মাণের কৌশল তিনিই প্রথম শেখান। এই রকম ছোট-বড় সকল বিষয়ে বিদেশী রীতি বর্জন করিয়া দেশীয় রীতি বহাল হইবাব প্রয়াস চলে। আমাদের দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইতে আরম্ভ হয়।

এই অন্তর্মুখিনতা চারুশিল্পের মধ্যে বিশেষ করিয়া প্রকটিত হইল। তখন দেশের বিদগ্ধ সমাজের চোখ ইউরোপীয় ধরনে আঁকা চিত্রাবলীতে একেবারে ঝলসাইয়া গিয়াছিল। দেশজ পটশিল্পও অনাদরে কোণঠাসা হইয়া ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ, মঙ্গল-কাব্য ও মধ্যযুগীয় ঘটনাদি হইতে বিষয়বস্তু লইয়া যখন চিত্রাদি অঙ্কিত হইতে লাগিল, তখন শিক্ষিত সমাজ তাহা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, তাহা হইতে দশ হাত দূরে থাকাই সমীচীন মনে করিতেন। যাহা হউক, সশিষ্য অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-সমূহের ব্যাখ্যাতা পাওয়া গেল এক বিদেশিনীকে। ভগিনী নিবেদিতা সরল অথচ ওজস্বিনী ভাষায় নিতান্তই সহানুভূতির সঙ্গে এই সকল চিত্রের পরিচয় বিভিন্ন পত্রিকায় ইংরেজি ও বাঙ্গালা

ভাষায় প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। তখন পরের মুখে .ঝাল খাওয়ায় অভ্যস্ত তথাকথিত অভিজাত ও শিক্ষিতেরা যেন থমকিয়া দাঁড়াইল।· তাঁহাদের কর্ণকুহরে উঁচু দরের ভারতীয় শিল্পের অভিনব ব্যাখ্যা প্রতিনিয়ত ঝঙ্কৃত হইতেছিল। আমরা ক্রমে 'পর' ছাড়িয়া 'ঘরের' দিকে মুখ ফিরাইলাম। অবনীন্দ্রনাথের 'সাজাহানের মৃত্যু' ও 'সতী' আর নন্দলাল বসুর 'উমার তপস্যা' আমাদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল। এই যে স্বকীয়তা ও জাতীয়তা—ইহাই শিল্প বিদ্যালয়ের প্রকৃষ্টতম দান।

হ্যাভেল তখন অবসর লইয়াছেন (১৯০৫)। তবে তিনি যে আদর্শের পত্তন করিয়া যান, অবনীন্দ্রনাথের স্নেহবারিসিঞ্চনে তাহা দিন দিন গভীরতর ও বিস্তৃততর হইতে থাকে। তাঁহার কৃতী ছাত্রদল দিকে দিকে ভারতীয় শিল্পাদর্শ প্রচারে রত হইলেন। অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রগণের মধ্যে শিল্পাচার্য নন্দলালের কথা এইমাত্র উল্লেখ করিলাম। যামিনী রায়, অসিতকুমার হালদার, সমরেন্দ্র গুপ্ত, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, মুকুল দে প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পিগণ শিল্প-বিদ্যালয়ে অবনীন্দ্রনাথের নিকট হইতে যে কত অনুপ্রেরণা লাভ করেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইঁহারা প্রত্যেকেই শিল্পের ক্ষেত্রে এক একজন দিকপাল। শুধু ভারতবর্ষে নহে এশিয়ার অন্যান্য দেশে, ইউরোপে ও আমেরিকায় তাঁহাদের চিত্রসমূহ উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বা কর্ণধাররূপে ভারতীয় আদর্শ তাঁহারা জনসমাজে অবিরত প্রচারে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। পররর্তীকালেও এই বিদ্যালয় হইতে শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে বহু প্রখ্যাত শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছে।

শিল্পীদের কার্য জনসমাজে প্রচারের উপায়স্বরূপ সঙ্ঘবদ্ধ আয়োজনও এই শিল্প বিদ্যালয় হইতে প্রথম সুরু হয়। অবনীন্দ্রনাথ 'জোড়াসাঁকোর ধারে' পুস্তকে একটি আর্ট ক্লাবের কথা বলিয়াছেন।

অধ্যক্ষ হ্যাভেল ছিলেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। 'ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট'-এরও সূচনা এখান হইতে। লর্ড কিচেনার ছিলেন ইহার সভাপতি আর সম্পাদক অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং। এই বিদ্যালয়ে শিল্পপ্রদর্শনীও আরম্ভ হইল জনসামাজে ছাত্র ও শিক্ষক-শিল্পীদের শিল্পকার্যের প্রচার ও প্রকাশের জন্য। এখনও প্রতিবৎসর এইরূপ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী এখানে প্রদর্শিত হইয়া প্রথম সাধারণের গোচরীভূত হয়। শত বর্ষে এই শিল্প-বিদ্যালয়টি চিত্রসম্পদেও বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে। দেশ-বিদেশের বিস্তর বিখ্যাত ছবি ক্রয় করিয়া একটি আর্ট-গ্যালারি স্থাপিত হয়। ইহা বর্তমানে যাদুঘরের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট আগার হইয়াছে। বর্তমানে এই বিদ্যালয় একটি কলেজে পরিণত হইয়াছে এবং জাতীয় জীবনের উন্নতিমূলক বিভিন্ন শাখার চিত্রবিদ্যা শিক্ষার বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে।

হ্যাভেল প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি ভারতীয় চারু ও কারু শিল্পের কতখানি দরদী ছিলেন তাহার প্রমাণ আমরা উপরে পাইলাম। তাঁহার এই দরদ ও প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতে হয়। হ্যাভেলের পূর্বে কলাবিদ্যায় শিক্ষা যেরূপ ইউরোপীয় রীতি অনুসৃত হইত তেমনি আর্ট-গ্যালারিতেও ইউরোপীয় রীতিতে আঁকা চিত্রাবলীর সমাবেশ হইয়াছিল। হ্যাভেল ১৯০৪ সাল নাগাদ নিজ দায়িত্বে নিলামে বিক্রয় করেন। ইহা হইতে যে-অর্থ পাওয়া যায় তাহার দ্বারাই বর্তমান আর্ট-গ্যালারির পত্তন হইল বলা চলে। এই আর্ট-গ্যালারি এখন আমাদের ভারতীয় শিল্প-সম্পদের একটি মস্ত বড় আগার হইয়া উঠিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম জনসাধারণের নিকট 'যাদুঘর' নামে পরিচিত। ইহা এখানকার একটি প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। কিছুকাল পূর্বের হিসাবে জানা যায়, দৈনিক অন্যূন তিন সহস্র নরনারী যাদুঘরে পদার্পণ করিয়া থাকেন। ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিদ্যা, কারুশিল্প, ললিতকলা—আবার প্রত্যেকটির অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগে বিস্তর অমূল্য পদার্থ দেশ-বিদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া এখানে স্থান পাইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমিক অভ্যুদয়ের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন এই মিউজিয়ামটি। একারণ 'বিদগ্ধমণ্ডলী' ইহাকে ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন।

'এসিয়াটিক সোসাইটি' প্রসঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম' যাদুঘরের উল্লেখ করিয়াছি। ১৮৭৫ সনে নূতন আবাস নির্মিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইহা সোসাইটির অঙ্গীভূত হইয়াই ছিল। উপরি-উক্ত মিউজিয়ামের নানা দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া বহু পূর্ব হইতেই সোসাইটি-ভবনে সংরক্ষিত হইতেছিল। বস্তুতঃ সোসাইটির নিজস্ব ভবন-নির্মাণের মূলেও ছিল এই নিদর্শনগুলি সুষ্ঠুরূপে সংরক্ষণের প্রেরণা। ক্রমে এত দ্রব্যাদি এখানে সংগৃহীত হইয়াছিল যে, এগুলি শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে সাজাইযা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

সে যুগের প্রখ্যাতনামা উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী ডঃ নাথানিয়েল ওয়ালিচের নাম অন্যান্য প্রসঙ্গে আমরা বহুবার উল্লেখ করিয়াছি। এসিয়াটিক সোসাইটিতে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত দ্রব্যাদি দৃষ্টে তাঁহার মনে এখানে একটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার কথা উদিত হয় তিনি

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী সোসাইটির এইসব জিনিসপত্র লইয়া একটি মিউজিয়াম গঠনের প্রস্তাব করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলেন যে, তাঁহার নিজ সংগ্রহ হইতে অতিরিক্ত দ্রব্যাদিও এইজন্য দিতে প্রস্তুত। শুধু ইহাও নহে, তিনি প্রস্তাবিত মিউজিয়ামের 'অনারারি' বা অবৈতনিক কিউরেটর হইতে সম্মত হন। সোসাইটি সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। সংগৃহীত দ্রব্যাদি মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা হইল এইরূপ—(১) প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক এবং (২) ভূতত্ত্ব ও প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক। সোসাইটির গ্রন্থাধ্যক্ষ প্রথম বিভাগের ভার লইলেন। ডঃ ওয়ালিচ দ্বিতীয় বিভাগের অবৈতনিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে বর্তমান বিরাট যাদুঘরের উৎপত্তি হইল।

ক্রমশঃ মিউজিয়ামের দ্রব্যসমূহ অধিকতর সংগৃহীত হইতে থাকে। কি ধরনের দ্রব্যসমূহ এখানে রক্ষিত হইবে প্রথম হইতে তাহারও কতকটা নির্দেশ পাওয়া গেল। স্থির হয়, প্রস্তর বা পিত্তলে খোদাই অনুশাসন, হিন্দু ও মুসলমানের মন্দির-মসজিদ-স্মৃতিস্তম্ভের নিদর্শন, দেব-দেবীর মূর্তি, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন পুঁথি, প্রাচ্যের যুদ্ধ-সরঞ্জাম, সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র, পূজায় ব্যবহৃত বাসন-কোসন, ভারতীয় কৃষি-শিল্পের যন্ত্রপাতি, শুষ্ক অথবা সংরক্ষিত ভারতীয় পশু পক্ষী ও অন্যান্য জীবজন্তু, এই সকল জীবজন্তুর কঙ্কাল বা অস্থিসমূহ, শুকনা গাছ ও ফলমূল, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতির ধাতুগত ও ভেষজ ঔষধাদি, অশোধিত ও শোধিত বিভিন্ন ধাতুদ্রব্য—এই প্রকার বিভিন্ন জিনিস লইয়া যাদুঘর পুষ্ট হইবে।

মিউজিয়ামের উপর সোসাইটির কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ওয়ালিচের পর নিজ সঙ্গতি-অনুযায়ী স্বল্পবেতনে মিউজিয়ামের কিউরেটর পদে লোক নিযুক্ত করিলেন। সোসাইটির ধনরক্ষক তৎকালীন অন্যতম প্রসিদ্ধ এজেন্সী হাউস পামার এণ্ড কোং ফেল

হওয়ায় ইহার সঞ্চিত অর্থ প্রায় নষ্ট হইয়া যায়। তখন ১৮৩৬ সন নাগাদ এই পদের ব্যয় নির্বাহার্থ অর্থসাহায্যের জন্য সরকারের নিকট তাঁহারা আবেদন করেন। তখনই ইহাতে ফল না হইলেও বিলাতের ডিরেক্টর সভার অনুমোদনে সরকার কিছুকাল পরে কিউ-রেটরের বেতন বাবদ মাসিক তিনশত টাকা বরাদ্দ করিলেন। বিলাত হইতে ১৮৪১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এই পদে কিউরেটর নিযুক্ত হইয়া আসেন এডওয়ার্ড ব্লাইথ। তিনি ভূতত্ত্ব বা জীবতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন না। এজন্য তাঁহার একজন বিজ্ঞান-জানা-সহকারীরও প্রয়োজন হইল।

এই সময়ে রাণীগঞ্জে কয়লার খনিতে কাজ সুরু হয়। সরকার এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। তাঁহারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ক্যাপ্টেন জি বি ট্রেমোহিয়ারকে বিলাতে পাঠান। তিনি সেখানে ভূতত্ত্বের এই বিভাগের বহু নিদর্শনও সংগ্রহ করেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে এই সংগ্রহ সোসাইটিভবনে স্থিত হয়। পিডিংটন নামক এক সাহেব এই বিভাগের ও সোসাইটিতে পূর্ব-রক্ষিত বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির কিউরেটর নিযুক্ত হইলেন।

১৮৫৬ সন নাগাদ সরকার একটি আলাদা ভূতত্ত্ব বিভাগ গঠন করিয়া ১নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ইহার আপিস খুলেন। সোসাইটিতে রক্ষিত স্বীয় জিনিসপত্রও তাঁহারা সেখানে লইয়া যান। ইহাতে সোসাইটির স্থানের কতকটা সুরাহা হইল বটে, কিন্তু জিনিসপত্র তখন এতই বাড়িয়া যাইতেছিল যে, তাহার রক্ষণের সুব্যবস্থা করা ইহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। তাই কর্তৃপক্ষ ঐ সনেই সরকারের নিকট এই মর্মে এক স্মারকলিপি পাঠাইলেন যে, কলিকাতায় অবিলম্বে তাঁহারা যেন একটি মিউজিয়ম স্থাপন করেন; সেখানে সোসাইটির গ্রন্থাগার ছাড়া যাবতীয় দ্রব্যাদি প্রদান করা যাইবে। সিপাহী যুদ্ধের জন্য এ প্রস্তাব তখন কার্যকরী হয় নাই। পরেও কিন্তু

অর্থাভাবের ওজুহাতে সরকার মিউজিয়মের গুরুত্ব স্বীকার করিয়াও ইহা স্থাপনে রাজি হইলেন না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভূতত্ত্ব-বিষয়ক আপিস খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে এতৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি স্থানান্তর করার সময় সরকার সোসাইটি হইতে অন্য দ্রব্যসমূহ লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এবারেও ঐরূপ প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু সোসাইটি দুইবারেই উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এইজন্য যে, সরকার একটি স্বতন্ত্র মিউজিয়ম গঠন না করিলে এরূপভাবে দ্রব্য-সম্ভার জড় করিয়া রাখায় কোন কাজই হইবে না।

সোসাইটি নাচার, এবারে তাঁহারা বিলাতে ভারত-সচিবের নিকট আবেদন করেন। ইহাতে ফল হইল। ১৮৬২ সনের মে মাসে ভারত সরকার এরূপ একটি মিউজিয়ম স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন। সোসাইটি ও সরকারের মধ্যে এ সম্পর্কে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। আলাপ-আলোচনা দীর্ঘকাল চলিবার পর ১৮৬৫ সনে স্থির হইল যে, সোসাইটির প্রাণিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বমূলক দ্রব্যাদি সরকারের পক্ষে এক ট্রাষ্টী সভার উপর অর্পণ করা হইবে এবং সোসাইটির একটি আবাসস্থানের ব্যবস্থাও মিউজিয়মের মধ্যে করিতে হইবে। এই মর্মে ১৮৬৬ সনে 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম এক্ট' নামে একটি আইনও পাস হইয়া গেল। আইনসঙ্গত ভাবে গঠিত ট্রাষ্টী সভার প্রথম সভাপতি হইলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণেস পীকক এবং প্রথম কিউরেটর নিযুক্ত হন এডিনবরার ফ্রি চার্চ কলেজের প্রাণি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ জন এণ্ডারসন (২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৬)।

কিন্তু মিউজিয়ম-ভবন নির্মিত হইতেও ঢের সময় লাগিয়া যায়। ১৮৭৫ সনে নব-নির্মিত ভবনে এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে জিনিস-পত্র স্থানান্তর করা হইতে থাকে। দেখা গেল, ভূতত্ত্ব বিভাগ ও প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের স্থান হইতেই প্রায় জায়গা জুড়িয়া গেল। তখন

এসিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ একদিকে স্থানাভাব এবং অন্যদিকে মিউজিয়ামের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেলে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পাইবার সম্ভাবনা—এই আশঙ্কায় ওখানে যাইতে রাজি হইলেন না। ইহা লইয়া আবার সরকারের সঙ্গে আলোচনার সূচনা হইল। পরে দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ লইয়া সোসাইটি মিউজিয়ামে যাওয়ার দাবী তুলিয়া লইলেন। একারণ আবার ১৮৭৬ সনের ১৭ই ডিসেম্বর নূতন করিয়া মিউজিয়াম আইন পাস করাইয়া লওয়া হয়। ইহার পর সরকার মিউজিয়ামটির পরিচালনা-ভার ট্রাষ্টী-সভার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। নূতন আইনে ট্রাষ্টীদের সংখ্যা তেরজন হইতে বাড়াইয়া ষোলজন করা হইল। ১৮৮৭ সনে সরকার এই সংখ্যা পুনরায় একুশ জনে বাড়াইয়া দেন। ট্রাষ্টী-সভাকে অতিরিক্ত সদস্য গ্রহণেরও ক্ষমতা দেওয়া হয়। মিউজিয়ামের সঙ্গে কলিকাতায় বিদ্বন্মণ্ডলী ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের যোগসাধনের ব্যবস্থা ১৮৬৬ সন হইতেই করা হয়। ট্রাষ্টী সভা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, বঙ্গীয় বণিক সভা, ভারতবর্ষীয় সভা 'British Indian Association' এবং এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইল।

নূতন ভবনে আসিবার পর হইতে মিউজিয়মের দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল। ইহার উন্নতির পক্ষে একটি বিষয় খুবই সহায় হয়। ছোটলাট স্যার জর্জ ক্যাম্বেল ১৮৭৪ সনে বঙ্গপ্রদেশের কৃষি ও শিল্পের নমুনাস্বরূপ ডালহৌসী স্কোয়ারে একটি 'ইকনমিক মিউজিয়াম' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পরবর্তী ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্প্‌লের আমলে (১৮৭৪-৭৭) ইহার বিশেষ উন্নতি হয়। এই মিউজিয়ামের শাখাস্বরূপ বিভিন্ন জেলা সহরে শাখা কমিটি ছিল। তাহারা ঐ ঐ অঞ্চল-জাত কৃষি এবং শিল্পদ্রব্যের নমুনা ও হিসাব এখানে পাঠাইতেন। টেম্প্‌লের সময়ে বঙ্গ-

প্রদেশজাত আট শত রকম ধান্যের নমুনা এই মিউজিয়ামে সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৮৮৩ সনে কলিকাতায় যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে এই মিউজিয়ামটি বিশেষ প্রশংসিত হইল। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের সংলগ্ন জমিতে সাময়িকভাবে উক্ত প্রদর্শনীর জন্য ঘর নির্মিত হইয়াছিল। সরকার ইকনমিক মিউজিয়ামটি ১৮৮৫-৮৬ সনে এখানে স্থানান্তরিত করিলেন। এই স্থানেই গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল (বর্তমানে কলা-মহাবিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার এই মিউজিয়ামটি ১৮৮৭ ১লা এপ্রিল হইতে একটি নূতন আইনবলে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের অন্তর্ভুক্ত করেন।

কিন্তু মিউজিয়ামে তো স্থানাভাব। ইহার উত্তর পার্শ্ব দিয়া 'সদর ষ্ট্রীট' গিয়াছে। সদর নিজামত ও সদর দেওয়ানী আদালত হইতে ইহার নাম 'সদর ষ্ট্রীট' হইয়াছে। এ দুইটি আদালতই বড়লাট বেণ্টিঙ্কের সময় পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল ইহার উপরস্থিত একটি বাটীতে ছিল। এই বাটী ও তৎসংলগ্ন জমি ছিল মিউজিয়ামের ঠিক পূর্ব পার্শ্বে। সরকার বাড়ী সমেত জমি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের জন্য ক্রয় করিয়া এখানে পূর্ব ভবনের সঙ্গেই একটি বাটী নির্মাণ করেন। ১৮৯১ সনে ইকনমিক মিউজিয়াম এখানে স্থানান্তরিত হয়। এই সঙ্গে একটি আর্ট বিভাগও মিউজিয়ামে খোলা হইল। সাধারণের নিকট ইহার দ্বার উন্মোচিত হয় ১৮৯২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। জাতিতত্ত্ববিষয়ক গ্যালারি স্থাপিত হয় পরবর্তী জানুয়ারী মাসে। ইকনমিক ও আর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণের ভার অর্পিত হইল ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর। তিনি সহকারী কিউরেটর পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দেশীয় কারুশিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের 'Art Manufactures of India' (1888) পুস্তক এ বিষয়ের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ বাঙ্গলার ছোটলাট

স্যার চার্লস এলফ্রেড এলিয়টের সময় (১৮৯০-৯৫) বিশেষ বাড়িয়া যায়। ১৮৯৪ সনের মে মাসে মিউজিয়মের ট্রাষ্টী সভা একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। অশোকের অনুশাসনসমূহের প্রতিলিপি কোন এক জায়গায় সংরক্ষিত হইবার তখনও ব্যবস্থা হয় নাই! এগুলি নানা কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে একেবারে লোপ পাইতে বসিবে। সভা অনুশাসন-গুলির প্রতিলিপি বা ধাতুদ্রব্যের উপরে ছাপ লইয়া তৎসমুদয় মিউজিয়মে রক্ষণের আবেদন জানাইলেন। ভারত সরকার এজন্য নূতন লোক নিযুক্ত না করিলেও ছোটলাট এলিয়ট ইহার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করিয়া বঙ্গপ্রদেশের মধ্যকার অনুশাসনগুলির প্রতিলিপি বা ছাপ লইবার ব্যবস্থা করিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই সরকারকে নিজ নিজ অনুশাসনলিপির ছাপ লইতেও অনুরোধ জানাইলেন। নেপাল হইতেও ছাপ আনাইবার ব্যবস্থা হইল। এইরূপে অশোকের অনুশাসনগুলির যতদূর সম্ভব একটি সম্পূর্ণ প্রস্থ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে সংগৃহীত হইতে পারিয়াছে। ছোটলাট এলিয়টের সহৃদয় সহযোগিতার দরুণই তখন ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

১৯০৪ সন নাগাদ পুনরায় ভবনটি বাড়াইবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কারণ বিভিন্ন বিভাগের জিনিসপত্র এতই অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইতে থাকে যে, স্থানসঙ্কুলান অসম্ভব হইয়া পড়ে। চৌরঙ্গীর উপরে মিউজিয়ম-ভবন সংলগ্ন জমিতে গৃহ-নির্মাণ সুরু হয় এবং শেষ হয় ১৯১১ সন নাগাদ। এই বাড়ীর উপরিতলে গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের আর্ট গ্যালারিটি স্থিত হয় (১৯১১)। এই সময় হইতে ইহা মিউজিয়মের অঙ্গীভূত হইল। তবে এটি এখনও আর্ট স্কুল বা বর্তমান কলা-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছে। নিম্ন তলে প্রত্নতত্ত্বমূলক দ্রব্যাদি সংরক্ষিত আছে।

বাঙ্গলাদেশ তথা ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের পথপ্রদর্শক এশিয়াটিক সোসাইটি। আর ইহার ক্ষেত্র ছিল ঐ স্থলে রক্ষিত এই মিউজিয়মটি। প্রাণিতত্ত্ব, ভূতত্ত্বই শুধু নয়, আবহাওয়া তত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা-গবেষণার এখানে প্রথম সূচনা হয়। ব্যবহারিক বিদ্যা, বিশেষতঃ উদ্ভিদ্ বিদ্যা ও রসায়নের গবেষণার মূল পাই এখানেই। সরকার কালে এক একটি বিষয় লইয়া এক একটি বিভাগ খুলিয়াছেন, প্রত্নতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, কারু ও চারু শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কেন্দ্রস্থল এই ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম।

মিউজিয়মস্থিত এই সকল বিভাগের গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন বিভাগ হইতে প্রকাশিত বিবরণ গ্রন্থপাঠে আমরা জানিতে পারি। 'রেকর্ডস অফ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম' কয়েক খণ্ডে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতেও বিদগ্ধ-জনেরা ইহার আগেকার কার্যকলাপ জানিতে পারিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম' সাধারণের নিকট কলিকাতায় নয়নমুগ্ধকর বিশেষ বিশেষ দ্রব্যসম্ভার, প্রাণি-কঙ্কাল, মুদ্রাভাণ্ডার, অনুশাসন ও অন্যবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য, ভাস্কর্যের বিবিধ নিদর্শন, চারু ও কারুশিল্প প্রভৃতির সংগ্রহশালা বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। তৎসত্ত্বেও ইহা দ্বারা তাহাদেরও দৃষ্টিকোণ প্রসারিত হইতে পারে। গ্রাম্য নিরক্ষর লোকেরাও ইহার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় বিস্তর পাইয়া থাকেন।

কিন্তু ইহা বর্তমানে একটি সুসমৃদ্ধ জাতীয় সম্পদেও পরিণত হইয়াছে। সমগ্র ভারতের প্রাণের স্পর্শ আমরা পাই এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তুগুলির মধ্যে। তবে ইহাই যথেষ্ট নয়। সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ইহা একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষা এবং বিদ্যা-কেন্দ্ররূপে আজ গণ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অধ্যাপক, গবেষক প্রত্যেকেই আজ নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী বিদ্যার অনুশীলন এবং গবেষণার সুযোগ এখানে পাইতে পারেন। এই

সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিলে আমরা অতীতের গৌরব উপলব্ধি করিব, মানুষের প্রয়াসে কতখানি সাফল্য লাভ করা যায় তাহার পরিচয় পাইব এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত হইয়া স্বদেশকে ঐশ্বর্যশালী করিয়া তুলিতে সক্ষম হইব। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম আজ আমাদের এই শিক্ষাই দিতেছে।*

---

* এই প্রসঙ্গ রচনাকালে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য লইয়াছি :

The History of Indian Museum (A speech by Sir Asutosh Mukherjee), Nov. 28th, 1915.

Bengal under Lieutenant-Governors.
vols, I,& II.

Calcutta Old and New

India Museum (A. Benerjee).

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ

ইতিপূর্বে আদি ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক আলোচনায় প্রসঙ্গতঃ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও তৎ-প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কথাও উল্লেখ করিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ কলিকাতা (পরে, আদি) ব্রাহ্মসমাজ হইতেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি। কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র হিসাবে ইহারও দান অপরিসীম। সমগ্র ভারতে ঐক্যবোধ উন্মেষের পক্ষে ইহার কৃতিত্ব সর্বদা স্মরণীয়।

প্রথমেই 'ভারতবর্ষীয়' কথাটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি পতিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক ঐক্য বরাবর বিদ্যমান ছিল। সিপাহী যুদ্ধের পর, ইংরেজের সাক্ষাৎ শাসনাধীন অঞ্চল এবং করদ বা মিত্র-রাজ্যগুলি পুরাপুরি বৃটিশ কর্তৃত্বাধীনে আসিয়া পড়িল। সেই সময় হইতে রাষ্ট্রনৈতিক কারণেও ভারতবর্ষ একরাজ্য বা রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং আগেকার ধর্ম-সংস্কৃতি আর এই সময়কার রাষ্ট্র-ব্যবস্থা—সব দিক দিয়াই ভারত-বাসীদের মধ্যে ঐক্যবোধ দৃঢ়মূল হইবার সুযোগ ঘটে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬৪ সন হইতে বহুবার উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা করিয়া ধর্মগত ভিত্তিতে ঐক্যবোধের উন্মেষে প্রয়াসী হন। তখন রাষ্ট্র-শাসন ব্যবস্থার দরুনেও তিনি ইহাতে অনেকটা সাফল্য লাভ করেন। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'-এর 'ভারতবর্ষীয়' কথাটির মধ্যে তাঁহার এই প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম রূপ পরিগ্রহ করে।

১৮৬৫ সনের প্রারম্ভ হইতেই কেশবচন্দ্রের অনুবর্তিরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রাচীনগণ হইতে নানা কারণে আলাদা

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দির

প্রেসিডেন্সী কলেজ
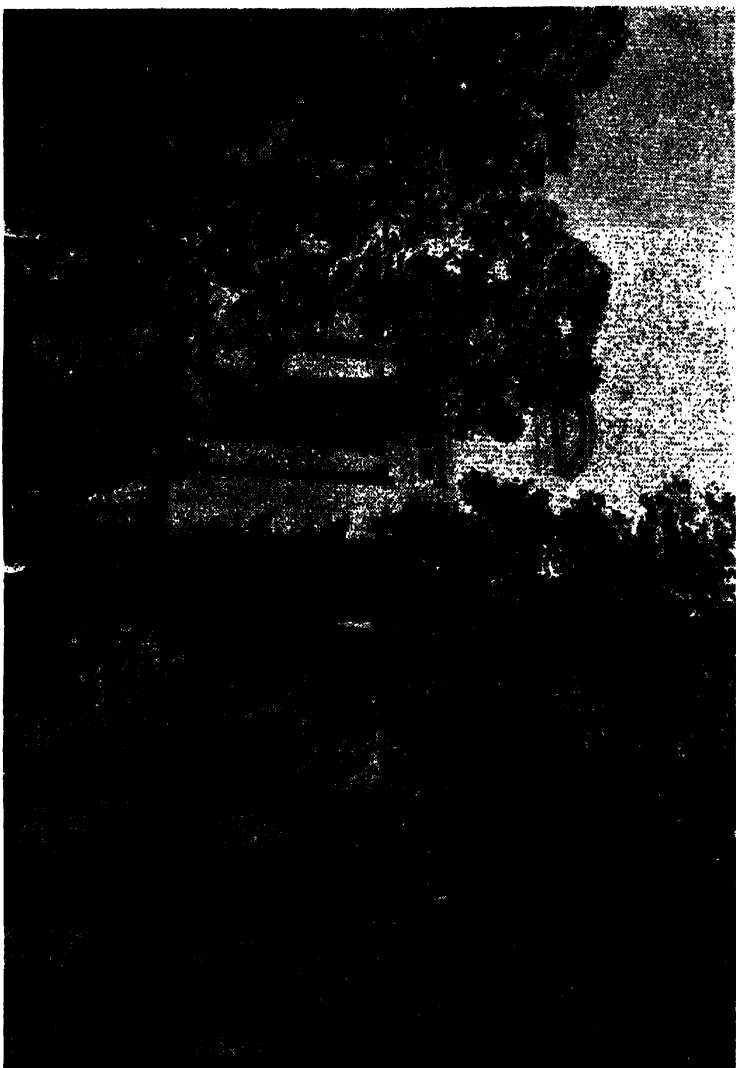
হইয়া পড়েন। পরিশেষে ১৮৬৬, ১১ই নবেম্বর ব্রাহ্মদের একটি সাধারণ সভায় 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয়। ৩০০নং লোয়ার চীৎপুর রোডে ঐদিন এই উপলক্ষে যে সভা হয়, তাহাতে দুইশত জন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক বাদে তিনজন ইউরোপীয় দর্শকও উপস্থিত ছিলেন। উমানাথ গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র সেন এরূপ সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। সমাজের মূল উদ্দেশ্য তৎকর্তৃক এইরূপ বর্ণিত হইল: "যাঁহারা ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের নিজ মঙ্গল সাধন এবং ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধনা প্রচারোদ্দেশ্যে তাঁহারা 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে সমাজস্থ হউন।" প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে আর একটি প্রস্তাবে স্থির হয় যে, বিবিধ ধর্মশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপাদক বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া অবিলম্বে প্রকাশ করা হইবে। এই সভায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নবগঠিত 'ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের' পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্র প্রদানের প্রস্তাবও ধার্য হইল। এইরূপে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের' গোড়া পত্তন হয়।

সভা সমাজের অধ্যক্ষ-সভা রহিত করিয়া ইহার পরিচালনা-ভার কয়েকজন সভ্যের উপর অর্পণ করেন। কেশবচন্দ্র সেন হইলেন তত্ত্বাবধায়ক, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সম্পাদক এবং যদুনাথ চক্রবর্তী সহকারী সম্পাদক। মূল কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এইরূপে যখন নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা হইল, তখন উহা নাম গ্রহণ করিল আদি ব্রাহ্মসমাজ। কলিকাতায় দুইটি ব্রাহ্মসমাজ সমান্তরাল-ভাবে অতঃপর কার্যে অগ্রসর হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পূর্বগামী প্রতিষ্ঠানের মত মূলতঃ একটি ধর্মসংস্থা হইলেও ভারতবাসীর শিক্ষা-সংস্কৃতিকেও ইহা কম নিয়মিত ও প্রসারিত করে নাই। এই দিক হইতেই ইহার কৃতিত্বের

বিষয় এখানে বিশেষভাবে আলোচ্য। নূতন সমাজের সভ্যগণ উচ্চশিক্ষিত, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক যুবক। স্বমতে দৃঢ় থাকিয়া তাঁহারা যে ত্যাগস্বীকার ও দুঃখবরণ করিয়াছিলেন, তাহাও সে সময়ে কাহারও অবদিত ছিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই যুব-সম্প্রদায়ের হস্তেই সমাজের প্রচারকার্য ও জনহিতকর অনুষ্ঠানাদির ভার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে স্বতন্ত্র হইয়া যাইবার পরেও এই যুবক দল একান্ত নিষ্ঠার সহিত এ সকল কর্ম সাধনে তৎপর হইলেন।

ধর্মের ভিত্তিতে জনশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, সেবা, সংবাদপত্র পরিচালন ও পুস্তক প্রকাশ প্রভৃতি তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হইয়া উঠে। অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন ব্যতিরেকে ১৮৬৫ সনে কলিকাতার ব্রাহ্মিকা সমাজ স্থাপিত হয়। কেশবচন্দ্র তাঁহাদের ধর্মোপদেশ দিতেন। ভূগোল, অঙ্কবিদ্যা ও শিল্প বিষয়ে শিক্ষাদানের নিমিত্ত এখানে ইউরোপীয় মহিলা নিযুক্ত হন। ঐ সন হইতে 'ধর্মতত্ত্ব' এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রকাশের ভারও তাঁহারা পুরাপুরি গ্রহণ করেন। ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ হইল। 'স্ত্রীর প্রতি উপদেশ' ও 'বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য' নামে বাংলা পুস্তক ঐ বৎসর বাহির হয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাকালীন প্রস্তাব অনুসারে ১৮৬৬ সনের মধ্যেই 'শ্লোক সংগ্রহ' পুস্তকখানি ছোট আকারে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাতে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, আবেস্তা, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র হইতে সার কথাগুলি সংগৃহীত হয়। এই পুস্তকখানি পরবর্তী সংস্করণসমূহে ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া বর্তমানে বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মসমাজ যে কোন একক সম্প্রদায়ের সমাজ নহে, ইহা যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মিলন-ভূমি এই 'শ্লোক সংগ্রহে'র সঙ্কলন ও প্রকাশ হইতে কার্যতঃ তাহা প্রতিপাদিত হইল। মূল

সমাজ প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পর হইতেই আর একটি বিষয়েও যুবক-দল মনঃসংযোগ করেন—তাহা হইল একটি নূতন বিবাহ আইন প্রণয়ন-প্রচেষ্টা। কেশবচন্দ্রের আগ্রহাতিশয়ে ইহার সুরু এবং তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ১৮৭২ সনের তিন আইনরূপে 'সিভিল ম্যারেজ এক্ট' নামে ইহার পরিণতি। সে এক বিচিত্র কাহিনী।

চীৎপুর রোডের যে বাড়ীতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা ছিল ইহার প্রচার-কার্যালয়, ভাড়াটিয়া বাড়ী। সমাজের একটি স্থায়ী আবাসের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। নূতন সমাজ স্থাপনের অব্যবহিত পর হইতেই যে এ বিষয়ে চেষ্টা আরম্ভ হয়, তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের চত্বর প্রায় সাড়ে সাত কাঠা জুড়িয়া অবস্থিত। ৪,৬৫০৲ টাকা দিয়া প্রথমে ছয় কাঠা জমি ক্রয় করা হয়। পরে আরও দেড় কাঠা ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছিল। ১৮৬৯ সনের সাম্বৎসরিক কার্যবিবরণে (২৩শে জানুয়ারী, ১৮৭০-এর সাম্বৎসরিক সভায় পঠিত) আছে: "দুই বৎসরকাল অতীত হইল এই ভূমিখণ্ড—যদুপরি সুরম্য অট্টালিকাতলে আপনারা উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এই ভূমিখণ্ড গর্ভে দুই বৎসর হইল আপনাদিগের উৎসাহ ও বিশ্বাসের বীজ প্রথমে বপিত হয় ও নগরের রাজপথকে ব্রহ্মনামের গভীর ধ্বনিতে জাগরিত করিয়া বহু লোক সমভিব্যাহারে এই স্থানে আপনারা ব্রহ্ম মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন (২৪শে জানুয়ারী, ১৮৬৮)।" ভিত্তি প্রস্তরে এই কথা কয়টি উৎকীর্ণ ছিল:

"By the grace of God, today the 24th of January, 1868, Friday, is laid the foundation-stone of the house of worship of the Brahmo Samaj of India."

মন্দির-নির্মাণ শেষ হইতে দেড় বৎসরের কিছু উপর সময়

লাগিয়াছিল। ১৮৬৯, ২২শে আগষ্ট যথারীতি সমারোহ ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে মন্দিরের দ্বার উন্মোচিত হয়। ইহার পূর্বে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্মগণ নগরকীর্তন করিয়া মন্দিরস্থলে গমন করেন। এ সময় যে গানটি গীত হয়, তাহাতে আছে—"নরনারী সকলের সমান অধিকার যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাতিবিচার।" এই দিবসে একুশজন ব্রাহ্ম যুবক এবং দুইজন মহিলা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। উক্ত একুশজনের মধ্যে ছিলেন—আনন্দমোহন বসু ও তাঁহার অনুজ মোহিনীমোহন বসু, অনাথবন্ধু গুহ, শিবনাথ ভট্টাচার্য (পরে শাস্ত্রী), কেশবচন্দ্রের অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি। মহিলাদের মধ্যে একজন ছিলেন আনন্দমোহন বসুর সহধর্মিণী স্বর্ণপ্রভা বসু। ঐদিন প্রাতে কৃষ্ণবিহারী সেনের নাবালিকা পত্নীও গৃহে বসিয়া কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষিত হন।

ইহার পর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যমণি কেশবচন্দ্র বিলাতে যাইতে মনস্থ করিলেন। তিনি ১৮৭০, ১৫ই ফেব্রুয়ারী আনন্দ-মোহন বসু, কৃষ্ণধন ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দের পিতা) প্রমুখ পাঁচজন সমভিব্যাহারে বিলাত যাত্রা করেন। পরবর্তী অক্টোবর মাসে কেশবচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। যাতায়াতের সময় বাদে প্রায় সাত মাস তিনি সেখানে অবস্থান করেন। কেশবচন্দ্র ধর্ম-নেতা; স্বভাবতই তিনি বিলাতে ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন সভায় ও গীর্জায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনে নূতন করিয়া যেসব দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়াছিল, বক্তৃতায় সে সকলের উপরও জোর দিতে তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। এদেশে সরকারী ও বে-সরকারী ইংরেজ মহলে, বিশেষতঃ ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকা-গুলিতে খুবই চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। যাহা হউক, কেশবচন্দ্র বিলাতে বসিয়া ভারতবাসীর হিতকর নানা কার্যেই অগ্রসর হইলেন। ভারত-হিতৈষিণী মিস্ মেরী কার্পেণ্টার ভারতবাসীদের, বিশেষতঃ

এখানকার নারী জাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে ব্রিষ্টলে ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামে একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন (৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭০)। কেশবচন্দ্র এ সভায় উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা দেন ও ইহার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়তা করেন। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি তথাকার শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালী বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্রে রাখিয়া তিনি যে সকল জনকল্যাণকর কার্যে হাত দেন, তাহা হইতেই ইহা আমাদের সম্যক উপলব্ধি হয়। এই কথাই এখানে বলিতেছি।

কেশবচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্ম প্রধানদের পরিচালনায় সুষ্ঠুভাবে চলিতেছিল। এই সময়ে কয়েকটি ব্রাহ্ম-পরিবার একসঙ্গে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহাই ক্রমে ভারতাশ্রমে এবং সর্বশেষে 'মঙ্গলবাড়ী' বা প্রচারকদের পল্লীতে পরিণত হয়। কেশবচন্দ্র ২০শে অক্টোবর ১৮৭০ তারিখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই লব্ধ অভিজ্ঞতার নিরিখে সমাজের জনকল্যাণকর কার্যগুলি নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইলেন। এই উদ্দেশ্যে 'ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এসোসিয়েশন' বা ভারত-সংস্কার সভা প্রতিষ্ঠিত হইল পরবর্তী ২রা নবেম্বর তারিখে। এখানেও 'ইণ্ডিয়ান' বা 'ভারত' কথাটি লক্ষণীয়। এই সভা তিনি শুধু ব্রাহ্মগণের মধ্যে নিবদ্ধ রাখিলেন না। কোন সম্প্রদায়, জাতি ও ধর্মনির্বিশেষে দেশ-বিদেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে ইহার সদস্য শ্রেণীভুক্ত করা হইল। ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন—ইহার লক্ষ্য। সভার পরিচালনা ভার রহিল কিন্তু কেশব এবং তদীয় বন্ধু ও সহকর্মিগণের উপর। সেযুগের একটি বিষয় আমাদের বড়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ত্যাগী, নিষ্ঠাবান কর্মীরা কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিলে জনসাধারণের নিকট হইতে স্বতঃই তাঁহারা

সহানুভূতি ও সমর্থন পাইতেন, কর্তৃত্ব লইয়া তখন কেহ বড় একটা মাথা ঘামাইত না। সভার সভাপতি হইলেন কেশবচন্দ্র স্বয়ং এবং অবৈতনিক সম্পাদক হইলেন গোবিন্দচন্দ্র ধর। দ্বিতীয় বর্ষে যুগ্ম-সম্পাদকরূপে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনের নামও পাইতেছি।

ভারত-সংস্কার সভার কার্য পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হইল—(১) স্ত্রী-জাতির উন্নতি সাধন, (২) শিল্প-ব্যবসা সম্পর্কিত শিক্ষা ও জন-শিক্ষা, (৩) দাতব্য, (৪) সুলভ সাহিত্য এবং (৫) সুরাপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণ। প্রথম বিভাগে সম্পাদক হ'ন 'বামাবোধিনী পত্রিকার'—সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বিতীয় বিভাগে জয়কৃষ্ণ সেন, (২য় বর্ষে যুগ্ম-সম্পাদক কৃষ্ণবিহারী সেন), তৃতীয় বিভাগে সম্পাদক কান্তিচন্দ্র মিত্র, চতুর্থ বিভাগে উমানাথ গুপ্ত এবং পঞ্চম বিভাগে সম্পাদক যাদবচন্দ্র রায় (২য় বর্ষে কানাইলাল পাইন)।

প্রত্যেকটি বিভাগের কার্যও যথারীতি আরম্ভ হয়। স্ত্রী-জাতির উন্নতি সাধন বিভাগের অধীনে 'নেটিভ এডাল্ট ফিমেল এণ্ড নর্মাল স্কুল' নামে একটি বয়স্থা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৭১ দিবসে। পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসে ইহার অন্তর্গত একটি বালিকা বিদ্যালয়ও খোলা হয়। দ্বিতীয় বিভাগে শিল্পী ও শ্রমজীবী বিদ্যালয় ১৮৭০, ২৮শে নবেম্বর মহা সমারোহে প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রমজীবী বিদ্যালয়ে সায়ংকালে সাধারণ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। শিল্পী বা কারিগরী বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বিদ্যা শিখাইবার আয়োজন হইল: (১) সূত্রধরের কার্য (২) সূচী-কার্য, (৩) ঘড়ি মেরামত, (৪) মুদ্রাঙ্কণ ও লিথোগ্রাফ এবং (৫) এনগ্রেভিং। কলিকাতা কলেজ নামে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের একটি বিদ্যালয় ছিল। কেশবচন্দ্রের উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্পিত হয়। মূল সমাজ হইতে আলাদা হইয়া গেলে এই বিদ্যালয়টি

তাঁহার হেপাজতেই থাকিয়া যায়। পরে ইহার নাম পরিবর্তিত হইয়া ক্যালকাটা স্কুল হয়। ১৮৭২, জুলাই মাস হইতে ইহাও উক্ত সভার শিক্ষা বিভাগের অধীনে আসে। সুলভ সাহিত্য বিভাগে ১৮৭০, ১৬ই নবেম্বর হইতে 'সুলভ সমাচার' নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইল। এত সস্তার সংবাদপত্র এদেশে ইহার পূর্বে কখনও বাহির হয় নাই। ১৮৭১, ১লা জানুয়ারী হইতে সাপ্তাহিক ইণ্ডিয়ান মিরর দৈনিকে পরিণত হইল। দেশীয়দের পরিচালিত ইহাই সর্বপ্রথম ইংরেজী দৈনিক। সুরাপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণী বিভাগে ১৮৭১, এপ্রিল মাস হইতে 'মদ না গরল' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইতে থাকে। ইহা ছাড়া এ বিভাগে সভা-সমিতিও অনুষ্ঠিত হইতেছিল। দাতব্য বিভাগে দরিদ্র বালকদিগকে মাসিক বৃত্তি, আর্ত, খঞ্জ ও পীড়িতদের সাহায্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

বিভিন্ন বিভাগে কার্য সুরু হইল বটে, কিন্তু ইহার জন্য অনন্যচিত্ত ত্যাগী, নিষ্ঠাবান একদল কর্মী চাই। কেশবচন্দ্রের সহকর্মিগণের মধ্যে এরূপ এক শ্রেণীর লোক অবশ্য পাওয়া গেল, কিন্তু বৈষয়িক চিন্তাবিবর্জিত হইয়া কাজ করিতে গেলে আরও কিছু প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটান হইল ১৮৭২ সনের ৫ই এপ্রিল ভারত-আশ্রম প্রতিষ্ঠা দ্বারা। এই আশ্রমে কর্মীদের পরিবারস্থ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও নিকট-আত্মীয়গণ একসঙ্গে আহার ও বাস করিতেন। কোন কিছু সঞ্চয় না করিয়া প্রত্যেককেই নিজ নিজ সাধ্যমত স্বোপার্জিত অর্থ আশ্রমে দিতে হইত। এই আশ্রম বেলঘরিয়ায়, পরে মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছি উদ্যানে এবং সর্বশেষে ১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটে স্থিত হয়।

বয়স্থা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ও আশ্রমের সঙ্গে ঐ ঐ স্থানে চলিয়া

যায়। সরকার এই বিদ্যালয়টিকে প্রতি বৎসর দুই হাজার টাকা অর্থসাহায্য করিতেন। স্যার এশলি ইডেন ছোটলাট হইয়া ১৮৭৭-৭৮ সনে এই সাহায্য বন্ধ করিয়া দেন। বিদ্যালয়টিও উঠিয়া যায়। পরে ১৮৭৯ সনে ভারত-সংস্কার সভার অধীনে কেশবচন্দ্র মেট্রোপলিটন ফিমেল স্কুল স্থাপন করেন। তখন বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র নারী জাতির স্বাধীনতা ও উন্নতির সমর্থক হইলেও ছেলেমেয়েদের একই ধরনের শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি এইজন্য স্ত্রী-জাতির উপযোগী বিশেষ বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৮২ সনের ১লা মে ১০ নং আপার সার্কুলার রোডে একটি স্ত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই দ্বিতীয় বৎসর হইতে ভিক্টোরিয়া কলেজ নামে অভিহিত হয়। বর্তমান ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন উক্ত কলেজের অনুবর্তী হইলেও উহার আদর্শ এখন আর অনুসৃত হইতেছে না।

বয়স্থা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া নারী জাতির সর্ববিধ উন্নতি-বিধানের জন্য ১৮৭২, ৫ই এপ্রিল বামা হিতৈষিণী সভা স্থাপিত হয়। ধর্ম ব্যতিরেকেও শিক্ষা, সাহিত্য, আচার-আচরণ, রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক ও পারিবারিক কর্তব্যা-কর্তব্য বিষয় এখানে আলোচনা হইত, ভদ্রমহিলারাও বাহির হইতে আসিয়া ইহার বিভিন্ন অধিবেশনে যোগ দিতেন। ১৮৭৯ সনে আর্য নারী-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই সকল বিষয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রতাচরণাদিও অনুসৃত হয়। স্ত্রীজাতির উন্নতি-সাধন বিভাগের প্রথম মুখপত্র ছিল উমেশ চন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকা এবং পরে ইহার মুখপত্র হয় ১৮৭৯ সনের মে মাস হইতে প্রকাশিত 'পরিচারিকা'।

সাধারণ শিক্ষা ও সুলভ সাহিত্য বিভাগেও বিশেষ কার্য চলিয়াছিল। উচ্চ শিক্ষার সংস্কার চিন্তা সেই যুগেই কেশবচন্দ্রের মনে

উদিত হয়। এবার তিনি ইণ্ডিয়ান মিররে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের উদ্দেশ্যে লিখিত নয়খানি খোলা চিঠিতে সেই সব চিন্তাকে রূপ দান করেন। কলিকাতা স্কুল প্রিন্স অব ওয়েলেসর আগমনের (১৮৭৫-৭৬) পর এলবার্ট স্কুল নামে পরিচিত হয়। ইহাই ১৮৮২-৮৩ সনে কেশবচন্দ্রের অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেনের অধ্যক্ষতায় এলবার্ট কলেজে রূপায়িত হইল। দেশী-বিদেশী, এবং এদেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্ররূপে ১৮৭৬, ২৫শে এপ্রিল কলেজ ষ্ট্রীটে এলবার্ট হল বা ইনষ্টিটিউটও কেশবচন্দ্র স্থাপন করিলেন। কলেজটি এই বাড়ীতেই অবস্থিত ছিল।

সুরাপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণে ভারত-সংস্কার সভার কার্য বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল। এই সভার পক্ষে পত্রপত্রীতে এবং সভা-সমিতির মারফত যে সব আন্দোলন চলে তাহাতে সরকার নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা ১৮৭৬ সন নাগাদ মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকল্পে কতকগুলি নূতন নিয়মকানুন প্রবর্তন করিতে বাধ্য হন। এই আন্দোলনকে জীয়াইয়া রাখিবার জন্য অ্যালবার্ট স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তরুণ ছাত্রদের লইয়া কেশবচন্দ্র 'ব্যাণ্ড অব হোপ' বা আশালতা দল গঠন করেন। 'আশালতা দলের' মুখপত্র স্বরূপ 'বিষ ও বৈরী' নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই 'আশালতা'র শাখা মফঃস্বলেও স্থাপিত হইয়াছিল। বিশিষ্ট সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কৈশোরে ভাগলপুরে থাকাকালে 'আশালতা দলে'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। বালক-বালিকাদের মধ্যে পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়াদিতে জ্ঞানলাভের সহায়তার জন্য কেশবচন্দ্র 'বালকবন্ধু' নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিলেন ১৮৭৯ এপ্রিল মাসে। সাহিত্যে অশ্লীলতা নিবারণকল্পেও তিনি একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। জনশিক্ষার প্রধান বাহনস্বরূপ সংবাদ-পত্রকেই ভারত-সংস্কার সভা আশ্রয়

করেন। 'সুলভ-সমাচারে' অল্পশিক্ষিতদের বুঝিবার উপযোগী করিয়া তাহাদেরই ভাষায় ও ভঙ্গীতে বিবিধ বিষয় লিখিত হইত। এক পয়সা মূল্যের এই সাপ্তাহিকখানি তখন শুধু কলিকাতায় নহে, মফঃস্বলের দূর দূরান্তের পল্লীবাসীদের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পত্রিকাখানির পুরাতন ফাইলগুলি পাঠের সুযোগ যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারাই ইহার সহজ সরল পল্লীজন-মনোগ্রাহী ভাষার বিষয় উপলব্ধি করিবেন। পরবর্তী কালের 'সন্ধ্যা'র ভাষায় ইহার ছাপ সুস্পষ্ট। পুরাতন পত্রিকাদির যেসব ফাইল এ যাবৎ দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে 'সুলভ সমাচারে'ই শারদীয়া সংখ্যারূপে একটি সচিত্র অতিরিক্ত পত্র সর্বপ্রথম নজরে পড়িয়াছে। মনে হয় এ বিষয়েও ইহা পথপ্রদর্শক। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তথা ভারত-সংস্কার সভার উদ্যোগে বা আনুকূল্যে বহু সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। 'ধর্মতত্ত্ব' 'সান্‌ডে মিরর' 'ভারত সংস্কারক' 'থিষ্টিক কোয়ার্টার্লি' 'লিবারাল' প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য

পরিচালকবর্গের মধ্যে মতদ্বৈধ হেতু 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' হইতে একদল বহির্গত হইয়া ১৮৭৮, মে মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজও 'নব-বিধান'রূপে ক্রমশঃ পরিচিত হইতে থাকে। সমাজ পুরাপুরি 'নব বিধান' নাম পরিগ্রহ করে ১৮৮০ সনের ২৬শে জানুয়ারী হইতে। 'নববিধানের' নূতন বাণী শিক্ষিত সাধারণের গোচরে আনিবার জন্য ইংরেজী 'দি নিউ ডিস্‌পেন্সেসান' এই সময় প্রকাশিত হয়। 'নববিধান' হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দেবদেবী, পালপার্বণ, আচার-আচরণের মূল আদর্শ গ্রহণ করিয়া পর-ব্রহ্মের এক একটি বিকাশ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আবার অন্যান্য ধর্মের সারবস্তু অবলম্বন দ্বারা নববিধানের ভিত্তিভূমি প্রশস্ততর করিয়া লওয়া হয়। ঈশ্বর তথা দেশজননীকে মাতৃরূপে আরাধনা করিতেও নববিধান

অগ্রণী হন। আর এই 'নববিধানের' আবিষ্কর্তা ও ব্যাখ্যাতা হইলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকেও ১৮৭৫ সনে দক্ষিণেশ্বর হইতে আবিষ্কার করিয়া বহির্জগতে তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন।

'নববিধানকে' সর্বধর্মের সমন্বয়ক্ষেত্র বলিয়াও তিনি ঘোষণা করিলেন। ইহাকে বস্তুগত করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৭৯ সনেই বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত কয়েক জন কর্মী বা প্রচারক তৎকর্তৃক নিযুক্ত হইলেন। হিন্দুধর্ম, খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, মহম্মদীয়ধর্ম, শিখধর্ম প্রভৃতির শাস্ত্র-গ্রন্থাদি মূলে অধ্যয়ন এবং ঐ সকল বিষয় প্রধানতঃ বাঙ্গলা ভাষার মাধ্যমে গৌড়জনকে পরিবেশনের উদ্দেশ্যেই এইরূপ ব্যবস্থা হয়। এই সকল ধর্মের গ্রন্থাদি ব্যাখ্যা ও মূল হইতে অনুবাদ বাঙ্গলা ভাষায় তাঁহারা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দ্বারা বঙ্গভারতী তথা বঙ্গ সংস্কৃতি বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়ের বেদবেদান্ত গীতাদির নবতন ব্যাখ্যা, গিরীশচন্দ্র সেনের কোরাণের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'মৌলবী গিরীশচন্দ্র' বলিয়াও সে সময় তিনি উক্ত হইতেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের উপর খৃষ্ট-শাস্ত্র অধ্যয়নের ভার পড়ে। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। তবে তাঁহার রচনা ছিল ইংরেজী ভাষায়। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল তথা চিরঞ্জীব শর্মা সঙ্গীতেও এক নবযুগ আনয়ন করেন। তদীয় 'নববিধান' নাটক অভিনীত হয় ও প্রশংসালাভ করে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত-সংকলন গ্রন্থেরও এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হয়।

এইরূপে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং পরে 'নববিধান' কলিকাতায় শুধু নহে, মফঃস্বলের দূর দূর অঞ্চলে এবং বঙ্গেতর প্রদেশসমূহে ধর্মের ভিত্তিতে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসারে

অবহিত হইয়াছিল। সাহিত্য ও সংবাদপত্রাদি প্রকাশ ইহার একটি প্রধান কার্য। আজ বাঙ্গলার সংস্কৃতির কথা বলিতে গেলে ইহাকেও একটি উচ্চ স্থান দিতে হয়।*

---

* প্রবন্ধ রচনাকালে শ্রীযুক্ত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি দিয়া আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

সেনেট হল

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট

সেনেট হল

পূর্বে টাউন হল ও মেটকাফ হল সম্বন্ধে বলিয়াছি। এখন সেনেট হল সম্বন্ধে কিছু বলিব। পূর্বোক্ত হল দুইটির মত এটিও একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়।

কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ও কলেজ স্কোয়ার বা গোলদীঘি নানা কারণে স্মরণীয় হইয়া আছে। সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজ এই প্রশস্ত রাস্তার উপর অবস্থিত বলিয়া ইহার এই নাম দেওয়া হইয়াছিল। পার্শ্ববর্তী পুষ্করিণীটির নামও তাই কলেজ স্কোয়ার। 'নীলদর্পণ'-রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ দীনবন্ধু মিত্র 'সুরধুনী কাব্যে' উক্ত কলেজত্রয় এবং কলেজ ষ্ট্রীট ও কলেজ স্কোয়ারকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। এই কাব্য রচনা কালে প্রেসিডেন্সী কলেজের বিরাট ভবন বা সেনেট হল নির্মিত হয় নাই, নহিলে এ দুইটিও নিশ্চয়ই উহাতে স্থান পাইত।

এই সেনেট হল হইতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্য ক্রমশঃ প্রসারলাভ করিয়াছে। কলিকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে, শুধু কলিকাতা কেন, বাঙ্গলার—এমনকি সমগ্র উত্তর ভারতের সংস্কৃতি-কেন্দ্ররূপে এই হলটি এক সময় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। "প্রেসিডেন্সী কলেজ" প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার কথা কিছু আলোচনা করিয়াছি। তখনও এই হলটি নির্মিত হয় নাই।

সেনেট হলের নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১৮৭২ সনে। ইহার আট বৎসর পূর্ব হইতেই এ বিষয়ে উদ্যোগ-আয়োজন চলিতে থাকে। ১৮৫৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাবধি এতকাল ইহার

কার্য ভাড়াটিয়া বাড়ীতে নিষ্পন্ন হইত। সেনেট হল নির্মিত হইলে ইহার যাবতীয় কার্য এখানেই হইতে থাকে। দীর্ঘকাল ধরিয়া সেনেট হলই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকেন্দ্র ছিল। অদ্যাবধি ইহা বিশ্ববিদ্যালয়েরই অঙ্গ। কাজেই এই হলটির কথা বলিতে গেলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। এখানে এ বিষয়ে একটু বিশদভাবে বলিব।

পূর্ব পূর্ব প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, কলিকাতায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্রাদি শিক্ষার সুষ্ঠু আয়োজন হয় গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। ইহার চতুর্থ দশকে, ১৮৪৪—৪৫ সনে শিক্ষা-সমাজের তৎকালীন সেক্রেটারী ডাঃ ফ্রেডারিক জন মৌএটের পরামর্শে কলিকাতায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তখন এই প্রস্তাব বিলাতের ডিরেক্টর-সভা অনুমোদন করেন নাই। শিক্ষা-সমাজের প্রস্তাবের হেতুবাদে এই মর্মে বলা হয় যে, কলিকাতায় ও মফঃস্বলে যেরূপ উচ্চশ্রেণীর শিক্ষালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় এখানে অবিলম্বে একটি শিক্ষানিয়ামক প্রতিষ্ঠান গঠন করা আবশ্যক। উচ্চবিদ্যালয়গুলিতেই বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে; কিন্তু তাহাদের উপরে বিশ্ববিদ্যালয় থাকিয়া পাঠ্য নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা গ্রহণ, ডিগ্রী প্রদান প্রভৃতি বিষয় পরিচালনা করিবেন।

ইহার দশ বৎসর পরে কিন্তু বিলাতী কর্তৃপক্ষের মত বদলাইয়া যায়। ১৮৫৪ সনের ১৯শে জুলাই তাঁহারা শিক্ষা সম্বন্ধে একশতটি অনুচ্ছেদ-সম্বলিত একখানি বিধান-পত্র এদেশে প্রেরণ করেন। ইহাতে পূর্বেকার প্রস্তাবের সারবত্তা বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়। তাঁহারা এই নির্দেশ দেন যে উচ্চশিক্ষা যেরূপ দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে তাহাতে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে অবিলম্বে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে যেন স্থাপন করা হয়। এই নির্দেশ বলে ভারত সরকার দেশী বিদেশী কতিপয় ব্যক্তিকে লইয়া নিয়মাবলী রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে ছিলেন— প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী বাঙ্গালীগণ। ১৮৫৬ সনের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কমিটি তাঁহাদের কার্য সমাধা করেন। ভারত সরকারের পক্ষে বড়লাট লর্ড ক্যানিং কমিটির সভ্যগণকে যথারীতি ধন্যবাদ জানাইলেন।

ইহার পর ১৮৫৭ সনের ২৪শে জানুয়ারী '১৮৫৭ সনের ২য় আইন' নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই সময় বোম্বাই ও মাদ্রাজে অনুরূপ আইন পাস হইয়া বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে "Body Politic and Corporate" নামে যে পরিচালকসভায় সভ্যদের নাম উল্লিখিত হয়, তাঁহাদের মধ্যে উপরি-লিখিত বাঙালী প্রধানদের নাম পাইতেছি। ইহা ছাড়া দুইজন মুসলমানও এই সদস্যদের মধ্যে ছিলেন, নাম প্রিন্স গোলাম মহম্মদ এবং মৌলবী মহম্মদ ওয়াজী (কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ)। ইউরোপীয়দের মধ্যে ছিলেন আলেকজাণ্ডার ডাফ, উইলিয়ম কে, উইলিয়ম গর্ডন ইয়ং, হেনরি গুডুইন, টমাস টমসন, হড্‌সন প্রাট, হেনবি উড্রো, ফ্রেডারিক জন মৌএট প্রমুখ পদস্থ ও কৃতী শিক্ষাবিদ্‌গণ। এই সভার সদস্য সংখ্যা মোট একচল্লিশ জন। চ্যান্সেলার ভাইস-চ্যান্সেলারও এই সংখ্যাব মধ্যে। সভা 'সেনেট' নামে আখ্যাত হইল। বড়লাট চ্যান্সেলর; প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর হইলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যাব জেমস্ উইলিয়ম কলভিল।

আইন বিধিবদ্ধ হইবার পুর্বেই অস্থায়ী 'সেনেট' উক্ত সদস্যদের

লইয়া গঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রথম অধিবেশন হয় ৩রা জানুয়ারী। এই অধিবেশনেই প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক উইলিয়ম গ্র্যানেল প্রথম রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন। আর্টস, আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র ও ইঞ্জিনীয়ারিং—এই চারিটি ফ্যাকালটি গঠিত হইল। বীডন্, ইয়ং, রমাপ্রসাদ রায় প্রমুখ ছয়জন সদস্য লইয়া একটি অস্থায়ী কমিটি স্থাপিত হয়। এই কমিটি প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন রচনার ভার গ্রহণ করেন। সেনেটের প্রস্তাবক্রমে এই অস্থায়ী কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য নির্বাহ করিতেন। নিয়মকানুন রচিত হইলে, তদনুযায়ী সিণ্ডিকেট নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সভা গঠিত হয়। সিণ্ডিকেটের প্রথম অধিবেশন বসে ১৮৫৮ সনে ৩০শে জানুয়ারী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিককার পরীক্ষা গ্রহণাদি ব্যাপার সম্বন্ধে 'প্রেসিডেন্সী কলেজ' প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাঁচ টাকা মাত্র 'ফি' ছিল। প্রথম বৎসরে ইহার বাংলা ও সংস্কৃত পরীক্ষক ছিলেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্নপত্র পরীক্ষকগণই তৈরী করিতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজী বাদে গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী, ফরাসী. হিব্রু, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও উর্দুর যে কোন একটি, ইতিহাস ও ভূগোল, অঙ্ক ও বিজ্ঞান এই কয়টি বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হয়। বি-এ পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা স্বভাবতঃ বিস্তৃততর ছিল। ইহার 'ফি' ধার্য হয় পঁচিশ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম এল-এম-এস পরীক্ষা গৃহীত হয় ১৮৫৭, ২রা মার্চ হইতে কয়েকদিন ধরিয়া। এফ-এ পরীক্ষা চালু হয় ১৮৬২ সন হইতে। আইন ও ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষা গ্রহণও ক্রমে আরম্ভ হইল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে উচ্চশিক্ষা-নিয়ামকরূপে আবির্ভূত হইলেও ইহার কার্যকলাপ ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়া বর্তমান বিরাট আকার ধারণ

করিয়াছে। এই ক্রম নির্ধারণ বর্তমানে আলোচ্য নয়। তবে সাধারণ বিষয়ই এখানে মাত্র উল্লেখ করিতে চাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমা সুদূরবিস্তৃত ছিল—পশ্চিমে লাহোর হইতে পূর্বে রেঙ্গুণ পর্যন্ত। সমগ্র উত্তর ভ.রত এবং ব্রহ্মদেশ ইহার আওতার মধ্যে ছিল। এরূপ বিরাট অঞ্চল লইয়া একটি বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক যুগে কোথাও দেখা যায় নাই।

উচ্চতম শিক্ষা যাহাতে কলেজে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত না হয়, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ যাহাতে বিদ্যাচর্চায় লিপ্ত থাকে তদুদ্দেশ্যে পূর্ব যুগে হিন্দু কলেজে কতকগুলি বৃত্তি দানের ব্যবস্থা ছিল। প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ বিখ্যাত শিক্ষা-বিদ্‌গণের পক্ষে কলেজী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া এইরূপ বৃত্তিলাভে বেশ কিছুদিন সাহিত্যাদির আলোচনা-গবেষণা করা সম্ভবপর হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও শীঘ্র এইরূপ বৃত্তিদানের সুযোগলাভ করিলেন। বোম্বাই-নিবাসী প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ১৮৬৬ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়কে এককালীন দুই লক্ষ টাকা দান করিবার প্রস্তাব করিয়া এক পত্র লেখেন। সেনেট পরবর্তী জুলাই মাসে সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। এই অর্থের আয় হইতে কতকগুলি নিয়ম সাপক্ষে প্রতি বৎসর উৎকৃষ্ট গবেষণা-প্রবন্ধের জন্য প্রেমচাঁদ রাইচাঁদ বৃত্তি দানের ব্যবস্থা হয়। ১৮৬৮ সনে এই বৃত্তি প্রথম লাভ করেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে স্যার আশুতোষও এই বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ সনে আনন্দমোহন বসু, ১৮৭০ সনে গৌরীশঙ্কর দে, ১৮৭১ সনে সারদাচরণ মিত্র এই বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইঁহারা প্রত্যেকেই নানা বিভাগে পরবর্তীকালে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এইরূপ বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি এই বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তির ন্যায় আরও বহু বৃত্তি এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা পরে হইয়াছে।

ইহার পরই উল্লেখযোগ্য, ঠাকুর আইন অধ্যাপক বৃত্তির ব্যবস্থা। দানবীর প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৮৬২ সনে চরম স্বেচ্ছাপত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচুর অর্থ দান করেন। ইহাতে এই সর্ত থাকে যে, তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে এ প্রস্তাব কার্যকরী হইবে। দানের আয় হইতে ঠাকুর আইন অধ্যাপককে অনধিক দশ হাজার টাকা বৃত্তি দেওয়া ধার্য হয়। সর্ত থাকে যে, প্রত্যেক অধ্যাপককে নির্দিষ্ট সংখ্যক বক্তৃতা দিতে হইবে। তাঁহার এই বক্তৃতাবলী ছাপাইবার জন্য কিছু বরাদ্দও করা হয় এই দানের মধ্যে। প্রসন্নকুমার ১৮৬৮ সনের ৩০শে আগষ্ট মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার দুই বৎসর পরে ১৮৭০ সনে হার্বার্ট কাওয়েল প্রথম ঠাকুর আইন অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ইহার পরে ১৮৭৩-৭৪ সনে দ্বিতীয় অধ্যাপক পদে বৃত হন 'ব্যবস্থা-দর্পণ' প্রণেতা সুবিখ্যাত শ্যামাচরণ শর্ম-সরকার। ১৮৭৬ সনে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ এবং ১৮৭৮ সনে ডক্টর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। ইহার পরেও দেশ বিদেশের বহু খ্যাতনামা ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ ঠাকুর অধ্যাপকরূপে ভারতীয় আইনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করিয়াছেন। ইহার পরে, বিশেষতঃ আধুনিক কালে বহু অধ্যাপক-বৃত্তিও সৃষ্টি হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু ছাত্র যুগে যুগে বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আশাতীত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনায়ও তাঁহারা কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার হন ডক্টর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯০-৯২), দ্বিতীয় বাঙালী ভাইস চ্যান্সেলার হন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯০৬ সনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী রেজিষ্ট্রার পদ লাভ করেন ডক্টর প্রসন্নকুমার রায় (১৮৮৭)। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিটি ফ্যাকালটীর কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল বিভাগের সভাপতিকে

বলে 'ডীন'। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবাসীদের মধ্যে আর্টসে সর্বপ্রথম ,ডীন হন ১৮৬৫ সনে। ব্যবহার-শাস্ত্রে প্রথম বাঙালী ডীন হন বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র (১৮৭৭) এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ডাঃ সূর্যকুমার সর্বাধিকারী (১৮৯৭)। ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে ডীন হন বহু পরে (.৯৩১) স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সায়ান্স বা বিজ্ঞান ফ্যাকালটির সূচনা হয় ১৯০৬ সনে। বাঙালীদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯১৪ সনে ইহার প্রথম 'ডীন' বা সভাপতি হন।

'ফ্যাকালটি অফ মেডিসিন' বা চিকিৎসা-ফ্যাকালটি সম্বন্ধে একটি কৌতুককর ব্যাপারের উল্লেখ এখানে না করিয়া পারিলাম না। ১৮৭৮ সনে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এবং কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে এই বিভাগের সদস্য পদে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে গ্রহণের প্রস্তাব সেনেটে পাস হয়। মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রত ছিলেন বলিয়া অন্য ইংরেজ চিকিৎসকগণ ফ্যাকালটিতে তাঁহার সঙ্গে একযোগে কার্য করিতে অসম্মত হন। অবশেষে অগত্যা মহেন্দ্রলালের নাম কাটিয়া দেওয়া হইল! এই সময়ে মহেন্দ্রলাল যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনিট্স বইয়ে স্থান পাইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় এই পত্র দুইখানি হইতে পাওয়া যায়।

নারী জাতির উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুকূল মত ছিল না। প্রথমে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরে আনন্দমোহন বসুর ঐকান্তিক প্রয়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দানে নারী জাতির বাধা বিদূরিত হয়। চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষায়ও পরে তাহাদের বিশেষ বাধা দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৮৩ সনে ছোট লাট স্যার রিভার্স অগস্টাস টমসনের আগ্রহে এ বাধাও নিরাকৃত হয়।

কাদম্বিনী বসু (পরে গাঙ্গুলী) মেডিক্যাল কলেজ হইতে প্রথম চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ডাক্তার হইয়াছিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, তখনকার বিশ্ববিদ্যালয় একটি পরীক্ষা-নিয়ামক কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল। স্কুল-কলেজের মাধ্যমেই ইহা শিক্ষা-সংস্কৃতির বীজ সর্বত্র ছড়াইতেছিল। বর্তমানে ইহার রূপ প্রায় সবটাই বদলাইয়া গিয়া উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান কিছুই ইহা হইতে বাদ যায় না। আজিকার বিরাট আকার ও পরিবেশ দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন রূপ কল্পনা করাও কঠিন। তেমনই কলেজ ষ্ট্রীটে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবৃহৎ হর্ম্যরাজির মধ্যে সেনেট হলটির গুরুত্ব আজিকার দিনে উপলব্ধি হওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য। অথচ এই সেনেট হলই দীর্ঘকাল যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইত। সে যুগে এখান হইতেই সমগ্র উত্তর ভারতে এবং ব্রহ্মদেশে উচ্চতম শিক্ষা যে নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল, একথা আগেই বলিয়াছি। সমাবর্তন উৎসব, ঠাকুর অধ্যাপকদের বক্তৃতা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন সভার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র ছিল এই সেনেট হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেট সভায় এবং বিভিন্ন ফ্যাকালটির অধিবেশনে পণ্ডিত-প্রধানেরা এখানেই আসিয়া একত্র হইতেন। এখানকার বক্তৃতাদির ব্যবস্থাও ছিল সুন্দর। হলের ভিতরে পশ্চিম অংশে চক্রাকারে যে ধ্বনি-প্রক্ষেপ যন্ত্র স্থাপিত ছিল তাহার সাহায্যে ইহার সর্বত্রই বক্তার কথা শোনা যাইত। দেশ-বিদেশের কত বিদগ্ধ জন যে এখানে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। বর্তমানে হয়ত ধ্বনি-যন্ত্রের উপকারিতা নাই, তবে এক সময়ে ইহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। হলের ইহা একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু বলিয়া গণ্য হইত।

এই হলটি বাঙ্গালী মাত্রেরই তীর্থ-ক্ষেত্ররূপে বিবেচিত হইবে। পূর্বদিক হইতে সিঁড়ি দিয়া বারান্দায় উঠিতেই যে উপবিষ্ট মূর্তিটি

আগে নজরে পড়ে তাহা দানবীর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের। ১৮৮৪ সন নাগাদ এটি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। হলের ভিতরে প্রবেশ করিয়াই আমরা দেখি কয়েকটি আবক্ষ প্রতিমূর্তি, স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। সে যুগের বহু সুপণ্ডিত শিক্ষাব্রতী ও মান্যগণ্য ব্যক্তিই ইঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, চার্লস হেনরী টনি, নবাব আবদুল লতিফ খাঁ, হেনরি উড্রো, জেমস সাটক্লিফ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তি উল্লেখযোগ্য। তৈলচিত্রও এখানকার একটি দ্রষ্টব্য বিষয়। হাজি মহম্মদ মহসীন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্যকুমার সর্বাধিকারী, স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ প্রভৃতির চিত্র এখানে রহিয়াছে। বর্তমানে ইহার বিভিন্ন অংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের আপিস বসে। হলটি দীর্ঘকাল যাবৎ পরীক্ষা-কেন্দ্ররূপেও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার পশ্চিম অংশে রক্ষিত আশুতোষ মিউজিয়াম বাঙালীর গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

প্রসঙ্গতঃ আধুনিক যুগে আসিয়া পড়িয়াছি। সেনেট হলটিকে কেন্দ্র করিয়া যে উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণা বাঙলাদেশে আবদ্ধ হইয়াছিল তাহা কতই না ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে। ইহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে এই হলটির সঙ্গে একটি ঐতিহ্যও ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার পরিচয় পাওয়া আজ একান্তই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় কার্যকলাপ মিনিটস বই ক্যালেণ্ডার রিপোর্ট প্রভৃতির মধ্যেই কি এখনও লুকাইয়া থাকিবে? ইতিহাসের উপাদান যথেষ্টই আছে কিন্তু ইহা এখনও লিখিত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক ইতিহাস-রচনার সময় কি এখনও আসে নাই?

অ্যালবার্ট হল

পূর্বেকার কোন কোন নিবন্ধে প্রসঙ্গতঃ অ্যালবার্ট হলের কথাও আসিয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ প্রায় পঁচাত্তর বৎসর যাবৎ কলিকাতাস্থ দেশীয় অঞ্চলের সংস্কৃতিমূলক কার্যকলাপে ইহার স্থান সুনির্দিষ্ট ছিল। টাউন হল দেশীয় অঞ্চল হইতে দূরে, সেনেট হল একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া নির্মিত। কাজেই জনসাধারণের মিলন-ক্ষেত্র হিসাবে দেশীয় অঞ্চলে তখন কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। অ্যালবার্ট হল সে-যুগে এই অভাব পূরণ করিয়াছিল। এই হলটির অস্তিত্ব এখন আর নাই। এক যুগ পূর্বেও ইহার কার্যকারিতা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এখন ইহার অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করি। কাজেই এই শুভ-প্রতিষ্ঠানটির কথাও সংস্কৃতি-প্রসঙ্গে এখানে কিছু বলিতে চাই।

গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে বাঙালীজীবনের নানা দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজসেবা সকল দিকেই আমরা এক অভূতপূর্ব কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করি। ইহার প্রত্যেকটিরই মূল লক্ষ্য ছিল স্বদেশের উন্নতি। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজকে কেন্দ্র করিয়া তখন যে স্বদেশ তথা সমাজসেবার প্লাবন বহিয়াছিল, পূর্বেকার একটি অধ্যায়ে তাহার বিবরণ দিয়াছি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন এই সমাজের প্রধান নেতা। শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে ইহার অফুরন্ত প্রয়াসের বিষয়ও উহা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি। অ্যালবার্ট হল কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত আর একটি সার্থক প্রয়াস।

দেশী-বিদেশীর, বিশেষ করিয়া দেশীয় বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মিলন-ক্ষেত্র কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে একটিও ছিল না। অথচ

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান এবং জাতীয় উন্নতিমূলক কার্যসমূহের আলোচনাদির নিমিত্ত একটি বিশেষ স্থলের প্রয়োজনীয়তা তখন অনুভূত হইতে থাকে। ১৮৭৫-৭৬ সনে সপ্তম এড্ওয়ার্ড 'প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স'রূপে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনকে উপলক্ষ্য করিয়া কলিকাতায় অন্ততঃ দুইটি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হয়। তন্মধ্যে একটি ইণ্ডিয়ান লীগের আনুকূল্যে শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'অ্যালবার্ট টেম্পল অফ সায়ান্স', অপরটি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত এই 'অ্যালবার্ট হল' বা 'অ্যালবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউট।' রাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্টের নামানুসারে এ দুইটির নামকরণ হয়।

কেশবচন্দ্র সেন শুধু বাংলায় নহে, সমগ্র ভারতেই তখন সুপরিচিত এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি। কি রাজ-সরকার কি মিত্র-রাজাদের দরবারে, কি শিক্ষিত সাধারণে তাঁহার নাম জানিত না এমন লোক বিরল ছিল। তিনি কলিকাতার কেন্দ্র স্থলে একটি ইন্‌ষ্টিটিউ বা হল প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলা সরকারের নিকট হইতে পাঁচ হাজার এবং বাংলা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা-মহারাজাদের নিকট হইতে তেইশ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হন। এই টাকা যথাসময়ে সম্পূর্ণ আদায়ও হইয়াছিল। দাতাদের নামও দ্বিতলে অ্যালবার্ট হলের সম্মুখভাগে প্রাচীর গাত্রে লিখিত ছিল। উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের প্রতিশ্রুতি পাইয়া কেশবচন্দ্র উক্ত প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে অগ্রণী হইলেন।

কলেজষ্ট্রীটে 'অ্যালবার্ট বিল্‌ডিংস' নামে যে বিরাট ভবন অবস্থিত এবং যাহার দ্বিতলে আমরা অ্যালবার্ট হল দেখিয়াছি, তাহার অতীত ইতিহাস এখানে একটু বলা দরকার। প্রসঙ্গত পুর্বে এই ভবনটির কথা কিছু কিছু বলিয়াছি। দুইটি বাড়ী যুক্ত হইয়া বর্তমান ভবন বা অ্যালবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউট গঠিত হয়। দক্ষিণ দিকের মূল বাড়ীটি ছিল

কেশবচন্দ্রের পিতামহ রামকমল সেনের। এই বাড়ীর দ্বিতলে এক সময় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ডি এল রিচার্ডসন বাস করিতেন। নিম্নতলে মেডিক্যাল কলেজ, বাংলা পাঠশালা এবং সর্বশেষে প্রেসিডেন্সী কলেজের কয়েকটি শ্রেণী এখানে বসিত। কেশবচন্দ্র যখন এইস্থলে অ্যালবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউট বা হল স্থাপনে অগ্রসর হন, তখন ইহার মালিক ছিলেন কেশবচন্দ্রের সর্বকনিষ্ঠ খুল্লতাত মুরলীধর সেন। ঐ সময়ই এই বাড়ীটির নম্বর ছিল ১৫, কলেজ স্কোয়ার। ইহার পূর্ব পার্শ্বের রাস্তার নাম রতন মিস্ত্রী লেন। এই গলির ২০নং বাড়ীটি ছিল উক্ত বাড়ীর লাগ উত্তর দিকে। এই দুইটি বাড়ীর জমির পরিমাণ এক বিঘা চৌদ্দ ছটাক বিয়াল্লিশ বর্গফুট। জমি ও বাড়ী দুইটির স্বত্বস্বামিত্ব অ্যালবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউটের পক্ষে তেইশ হাজার একশত ত্রিশ টাকায় ভারত-সচিব ক্রয় করিয়া লন। বলা বাহুল্য, এই অর্থ কেশবচন্দ্র সংগ্রহ করিয়া দেন। এতৎসংক্রান্ত দলিল রেজেষ্ট্রী হয় ১৮৭৮ সনের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে।

কিন্তু ইহার আড়াই বৎসরের অধিক কাল পূর্বে ১৮৭৬ সনের ২৫শে এপ্রিল, দিবসে উক্ত রামকমল সেনের বাড়ীতেই তৎকালীন লেঃ গবর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল অ্যালবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউটের দ্বার উন্মোচন করেন। টেম্পল মহোদয়কে দ্বার উন্মোচন করিতে আহ্বান করিয়া কেশবচন্দ্র এরূপ একটি হল প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, পূর্ববর্তী ছয় মাস হইতেই এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আয়োজন চলিতেছিল। ইতিমধ্যেই এই উদ্দেশ্যে পঁচিশ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। বাংলা সরকার পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজী হন। এই হলটি হইবে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের মিলন-ক্ষেত্র। কোন একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় বা রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠান ইহা নহে। সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের কল্যাণের

জন্যই ইহার প্রতিষ্ঠা। স্যার রিচার্ড টেম্পল তাঁহার ভাষণে অ্যালবার্ট ইনষ্টিটিউট বা হল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। টেম্পলের বক্তৃতায় ইহার চারিটি মূল উদ্দেশ্য এইরূপ বিবৃত হইয়াছে : (১) সঙ্গীত, জলসা ও নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ, (২) সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা ও বিতর্ক, (৩) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার এবং (৪) জনহিতকল্পে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সাধারণ সভা। এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া চারিটি বিষয়ের কার্যই সত্বর সুরু হইল।

প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে কলিকাতার তৎকালীন গণ্যমান্য ইংরেজ ও বাঙালী প্রধানগণ যুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৭ সনের ২৮শে এপ্রিল তারিখে ইহা ১৮৬০ সনের একুশ আইন অনুযায়ী রেজেষ্ট্রী করা হয়। দলিলে অ্যালবার্ট ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ-সভায় এই সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নাম পাইতেছি : ছোটলাট স্যার এস্‌লি ইডেন—সভাপতি; মহারাজা রমানাথ ঠাকুর—সহঃসভাপতি ; মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা কমলকৃষ্ণ, আর্কডিকন জন বেলী, হেন্‌রি বেল, ইউজিন লাফোঁ, চার্লস হেন্‌রি টনি, ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, নবাব আমীর আলি, নবাব আসগর আলি, মৌলবী আব্দুল লতিফ—সদস্য ; কেশবচন্দ্র সেন—সম্পাদক ; আনন্দমোহন বসু—সহঃসম্পাদক। উক্ত দলিলে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে আরও কয়েকজন বিখ্যাত লোকের নাম যুক্ত রহিয়াছে। তন্মধ্যে দুর্গামোহন দাস, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই অ্যালবার্ট হল শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র হইয়া উঠিল। অ্যালবার্ট স্কুলের কথা পূর্বে অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। স্কুলটির আবাসস্থল হইল এই অ্যালবার্ট হল। বিদ্যালয়ের প্রধান পরিচালক ছিলেন কেশবচন্দ্রের অনুজ সুপণ্ডিত কৃষ্ণবিহারী সেন। তাঁহারই অধ্যক্ষতায় ১৮৮২-৮৩ সনে বিদ্যালয়টি একটি কলেজে উন্নীত

হয়। তখন স্কুল ও কলেজ উভয়ই এই বাড়ীতে বসিতে থাকে। কৃষ্ণবিহারী ১৮৮১ সনে অ্যালবার্ট হল তথা ইন্‌ষ্টিটিউটের অনারারি সেক্রেটারী বা 'সম্মানিত' সম্পাদক নিযুক্ত হন। মৃত্যুকাল (২৯শে মে ১৮৯৫) পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর ১৮৯৫ সনের ২রা জুলাই হইতে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করেন। তিনিও আমৃত্যু এই পদে সমাসীন ছিলেন (১লা জুলাই ১৯১১)। ইহার পূর্বেই ১৯০৯ সালে নানাকারণে অ্যালবার্ট স্কুল ও কলেজ উঠিয়া গিয়াছিল

অ্যালবার্ট হল কলিকাতার একটি প্রকৃষ্ট মিলন-ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। জাতীয় উন্নতির উদ্দেশ্যে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ-কল্যাণ, রাজনীতি নানা বিষয়ে সভাসমিতির অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। একথা আজ হয়ত আমরা অনেকে ভুলিয়া গিয়াছি যে, সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহন-শিবনাথ-প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হয় এই অ্যালবার্ট হলে ১৮৭৬ সনের ২৬শে জুলাই তারিখে। কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারত-সভা নিখিল ভারতীয় প্রতিনিধিদের লইয়া ১৮৮৩ সনে প্রথমবার যে ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স বা জাতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন, তাহাও হয় এই অ্যালবার্ট হলে। গত শতাব্দীর শেষ দশকে ভগিনী নিবেদিতার "কালী দি মাদার" এবং উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের "বেদান্তদর্শন" সম্পর্কীয় বক্তৃতাবলীও এইখানেই প্রদত্ত হয়। সরলা দেবীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত প্রতাপাদিত্য উৎসব, উদয়াদিত্য উৎসব দ্বারা এই হলটি স্মরণীয় হইয়া আছে। বর্তমান শতকে মাত্র পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বেও রসরাজ অমৃতলাল বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, এনি বেসাণ্ট, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ মনীষী ও নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে।

অ্যালবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউটের অন্যান্য বিভাগেও যথারীতি কাজ আরম্ভ হয়। গ্রন্থাগার ও পাঠাগারে বহু মূল্যবান পুস্তক এবং দেশ-বিদেশের

পত্রিকা সংগৃহীত হইল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদপত্র সংগ্রহ এখানকার একটি আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে (পরে ইম্পিরিয়াল এবং বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পূর্বজ) গিয়া দেশীয় অঞ্চলের যুবকদের অধ্যয়নাদি করা নিয়ত তেমন সম্ভবপর ছিল না। তাঁহারা বিভিন্ন বিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকা এখানেই পড়িতে পাইতেন। জ্ঞান ও বিদ্যার প্রসার ইন্‌ষ্টিটিউটের যে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরাও এই সেদিন পর্যন্ত এই হলের পাঠাগারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতাম। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইংরেজী কেশব-জীবনীতে এই হলটির কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন:

"Altogether the high patriotic object of the Albert Hall was successful, and at the present moment, it forms the rallying ground of all sections of the community of Calcutta for purposes of religious, social or intellectual improvement. It forms a fitting memorial to the Catholic genius and character of its great founder." **Keshub Chander Sen**, 2nd ed., 1891, p 177.)

প্রতাপচন্দ্রের পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ বাহির হয় ১৮৮৭ সনে। এখানে দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে উদ্ধৃতিটি দেওয়া হইল। দেখা যাইতেছে, ঐ সময়ে ইহার কার্য সুচারুরূপে চলিতেছিল। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট ১৮৯১ সনের ৩১শে আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন কেশব-বন্ধু ও সহকর্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। বিশেষ করিয়া কলেজের ছাত্রদের কল্যাণকর্মে নিয়োজিত হইলেও, এই প্রতিষ্ঠানটির স্থাপয়িতার মনে অ্যালবার্ট হলের আদর্শও যে জাগরূক ছিল না, এমন কথা বলা যায় না।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতেই অ্যালবার্ট হলের পরিচালনা

সম্পর্কে গলতি দৃষ্ট হইতে থাকে। পুস্তক-পত্রিকাদিও তেমন আনানো হইত না। অবশেষে ১৯০৫ সনে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৯০৮ সনে অ্যালবার্ট হলের কার্যাদি পুনঃ-প্রচলনের চেষ্টা হয়। কিন্তু তাহাতেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। অ্যালবার্ট হল বা ইনষ্টিটিউট ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিতে পর্যবসিত হইল।

একটি রেজেষ্ট্রীকৃত সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠানের এইরূপ পরিণতি দেখিয়া অরুণচন্দ্র সিংহ, নীলরতন সরকার, সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, সত্যেন্দ্রনাথ সেন এবং সত্যানন্দ বসু নামক কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ১৯১৩ সনে ইহার পুনরুদ্ধার মানসে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। ইহার ফলে ১৯১৬ সন হইতে প্রতিষ্ঠানটি পুনরায় সাধারণের হাতে আসে। বাঙ্গলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া কমিটি বা অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হয়। এই অধ্যক্ষ-সভা দ্বারাই পুরাতন বাড়ীর স্থলে নূতন বিরাট ভবন নির্মিত হইয়াছে। এ যুগের লোকেরা এই নূতন ভবনের সঙ্গেই অল্প-বিস্তর পরিচিত। আমরা অ্যালবার্ট ইনষ্টিটিউট বা হলের নূতন রূপের সঙ্গে পরিচিত। এমন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি গত ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যে দেনার দায়ে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভবনটি আজ হস্তান্তরিত। যে হলে আমরা মহামনীষীদের বক্তৃতা-ভাষণাদি শুনিতাম তাহা এখন ব্যবসায়কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। অ্যালবার্ট হল আজ নাই, কিন্তু এখনও উহা বিস্মৃতির গভীরে তলাইয়া যায় নাই।*

---

* অ্যালবার্ট হল সংক্রান্ত কাগজপত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিভূষণ সেন ও শ্রীযুক্ত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা

বাংলাদেশে বিজ্ঞানের আলোচনা-গবেষণায় হিন্দু কলেজ ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের আয়োজনের কথা পূর্ব পূর্ব প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এখন ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা সম্পর্কে কিছু বলিব। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার পুরা নাম 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়ান্স'। সায়ান্স এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা নামেই ইহা সাধারণের নিকট পরিচিত। কলেজ ষ্ট্রীট-বৌবাজার ষ্ট্রীটের মোড়ে কিঞ্চিৎ পূর্বদিকে অগ্রসর হইলেই বাম পার্শ্বে এই ভবনটি অবস্থিত। অল্পকাল পূর্ব পর্যন্তও বিজ্ঞান-সভা এই বাটীতে ছিল, এখন ইহা কলিকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে নূতন ভবনে উঠিয়া গিয়াছে।

ভারতবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় বিজ্ঞান-সভা পথপ্রদর্শক, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। সুতরাং সংস্কৃতিকেন্দ্র হিসাবেও ইহার স্থান অতি উচ্চে। একারণ এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের একজন প্রখ্যাত ছাত্র, এম্-ডি উপাধি পাইয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিবার কিছুকাল পরেই তিনি হোমিওপ্যাথির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এই প্রণালীতে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন্। ইউরোপীয় এলোপ্যাথ চিকিৎসকগণ এইজন্য তাঁহার উপর খুবই বিরূপ হন এবং সময়ে সময়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবেও তাঁহার বিরোধিতা করিতে ছাড়েন নাই।

মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথির অনুরক্ত হইয়াও একথা বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার অনুরাগ কখনও এতটুকুও হ্রাস পায় নাই, বরং উত্তরোত্তর তাহা বর্ধিত হইয়াই চলিয়াছিল। ১৮৬৮ সনের জানুয়ারী মাস হইতে তিনি 'ক্যালকাটা জর্ন্যাল অব মেডিসিন' নামে একখানি চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ভারতবাসীদের বিজ্ঞান-চর্চার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া ইহার ১৮৬৯, আগষ্ট সংখ্যায় একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটিতেই তিনি সর্বপ্রথম 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ইহার পরে মহেন্দ্রলাল এই সভার অনুষ্ঠানপত্র রচনা করিলেন। ১৮৭০, ৩রা জানুয়ারী 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ইহা প্রকাশিত হয়। মহেন্দ্রলাল অনুষ্ঠানপত্রখানি পরে আরও বিশদ করিয়া লেখেন এবং তাহাতে তিনি মূল উদ্দেশ্য সবিশেষ বিবৃত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১২২৯ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' এই অনুষ্ঠানপত্রখানির বাঙ্গলা অনুবাদসহ বিজ্ঞান-অনুশীলনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন। 'বঙ্গদর্শনে' প্রদত্ত অনুষ্ঠানপত্রখানি হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা দ্বারা সভার মূল উদ্দেশ্য জানা যাইবে।

"এক্ষণে ভারতীয়দের পক্ষে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে ; তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে ; এবং আবশ্যক মতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখা-সভা স্থাপিত হইবে।

"ভারতবর্ষীয়দিগকে আহ্বান করিয়া বিজ্ঞান অনুশীলন বিষয়ে প্রোৎসাহিত ও সক্ষম করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ; আর ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যে-সকল বিষয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা (মনোরম ও জ্ঞানদায়ক প্রাচীন গ্রন্থ সকল মুদ্রিত ও প্রচারিত করা) সভার আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য।

"সভা স্থাপন করিবার জন্য একটি গৃহ, কতকগুলি বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র এবং কতকগুলি উপযুক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তিবিশেষের আবশ্যক। অতএব এই প্রস্তাব হইয়াছে যে, কিছু ভূমি ক্রয় করা ও তাহার উপর একটি আবশ্যকানুরূপ গৃহ নির্মাণ করা, বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র ক্রয় করা এবং যাহারা এক্ষণে বিজ্ঞানানুশীলন করিতেছেন, কিম্বা যাঁহারা এক্ষণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়নে একান্ত অভিলাষী; কিন্তু উপকরণাভাবে সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না, এরূপ ব্যক্তিদিগকে বিজ্ঞানচর্চা করিতে আহ্বান করা হইবে।"

মূল অনুষ্ঠানপত্রে এবং এখানিতেও এ সমুদয় কার্যের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বিধায় বদান্য স্বদেশবাসীদের নিকট মহেন্দ্রলাল আবেদন জানাইলেন। ক্রমশঃ অর্থের প্রতিশ্রুতিও পাওয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৭৫ সন হইতেই প্রতিশ্রুত ও আদায়ী অর্থের বলে মহেন্দ্রলাল ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠায় সবিশেষ তৎপর হইলেন। ১৮৭৫, ৪ঠা এপ্রিল ও ২০শে নবেম্বর চাঁদাদাতাদের দুইটি সভা হয়। দ্বিতীয় সভায় তিনি একটি বিবৃতিতে বলেন যে, প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-সভায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব, ও ভূতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা চালানো হইবে।

তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭৬ সনের ১৫ই জানুয়ারী। বাঙ্গলার তৎকালীন ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিজ্ঞান-সভার পূর্বোক্ত নাম ধার্য হইল। এই সভায় স্থির হয় যে, প্রথমতঃ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইবে। এখানে ট্রাষ্টী ও অধ্যক্ষ সভাও গঠিত হইল। ট্রাষ্টীদের মধ্যে ছিলেন—মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা কমলকৃষ্ণ, রমেশচন্দ্র মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মৌলবী আব্দুল লতিফ ও ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। অধ্যক্ষ সভায় নিযুক্ত হন

স্যার রিচার্ড টেম্পল (সভাপতি), ফাদার ই লাফোঁ, মহারাজা রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজা দিগম্বর মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনাথ দাস, সূর্যকুমার সর্বাধিকারী, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র ঘোষাল, কানাইলাল দে, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, রমানাথ লাহা, নীলমণি মিত্র, যদুনাথ ঘোষ, পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী, কৃষ্ণদাস পাল, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার সেন, মৌলবী আব্দুল লতিফ, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, অন্নদা-প্রসাদ রায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজেন্দ্র দত্ত, যদুলাল মল্লিক, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দমোহন বসু, ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার—মেম্বর ও সেক্রেটারী।

ছোটলাট টেম্পল বিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। স্বয়ং পাঁচশত টাকা দান ব্যতিরেকে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষ হইতেও ইহার সাহায্যে তিনি অগ্রসর হইলেন। তিনি ১৮৭৬ সনের ২১শে জানুয়ারী বিজ্ঞান-সভার সাহায্যকল্পে রচিত একটি মিনিটে ঘোষণা করিলেন যে, কলেজ ষ্ট্রীট ও বৌবাজারের মোড়ে একটি বাড়ী সরকার ইহার ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। সভাকে ভাড়া ইত্যাদি কিছুই দিতে হইবে না। তবে সভাকে কয়েকটি সর্ত মানিয়া লইতে হইবে। অন্ততঃ সত্তর হাজার টাকা মূলধন দেখানো দরকার। ইহা হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা সরকারের নিকট গচ্ছিত থাকিবে। সভাকে দুই বৎসরের জন্য প্রতি মাসে অন্তত একশত টাকা আয় দেখাইতে হইবে। ১৮৭৫-৭৬ সনের সরকারী শিক্ষাবিষয়ক বার্ষিক বিবরণীতে এবিষয়ের উল্লেখ ব্যতীত কার্য পরিচালনা সম্পর্কে আরও কতকগুলি তথ্য এইরূপ পাওয়া যাইতেছে: আদায়ীকৃত অর্থাদির ব্যয় সভা যদৃচ্ছ করিতে পারিবেন, অধ্যাপক নিয়োগ, বৃত্তি-প্রদান, প্রভৃতি বিষয়ও

তাঁহাদের করণীয়। সভা ঐ সময়েই একলক্ষ টাকা এককালীন দান এবং। মাসিক দুইশত টাকা দানের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন। ভবনটির জন্য সরকার ইতিমধ্যে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করেন।

সভার কার্য আরম্ভ হইতে আরও কয়েক মাস লাগিয়া যায়। ১৮৭৬, ২৯শে জুলাই ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল মহাসমারোহে বৌবাজারস্থিত ভবনে বহুজন সমক্ষে বিজ্ঞান-সভার দ্বার উন্মোচন করিলেন। এই দিন মহেন্দ্রলাল বিজ্ঞান সম্বন্ধে চিত্রযোগে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এ উপলক্ষে বিশেষভাবে রচিত নিম্নের গানটি গীত হয় ঃ—

রাগিনী পরোজ তাল আড়াঠেকা॥

"বিজ্ঞানসাধনে হও আগুয়ান,
উৎসাহ যতনে প্রিয় ভারত-সন্তান॥
নিম্নভূমি সমুজ্জ্বল, মনুষ্য নাম সকল,
হয় তার, করে যেই জ্ঞান অনুষ্ঠান।
পুরাকালে ঋষিগণ, ভাস্করাদি মহাজন,
জ্ঞানালোকে করেছিল দীপ্ত হিন্দুস্থান॥
শৌর্য বুদ্ধি ধন বল, একত্র লয়ে সকল
কর মাতা প্রকৃতির নিয়ম সন্ধান॥
হিন্দু যশ সৌরভে, ধরা আমোদিত হবে,
ভারত-জননী পুনঃ পাইবেন মান॥"

বিজ্ঞান-সভার কার্যও অবিলম্বে সুরু হইল। ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও ইউজিন লাফোঁ পদার্থবিদ্যা এবং তারাপ্রসন্ন রায় রসায়ন শাস্ত্রে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতার কলেজসমূহের ছাত্রগণ, বিজ্ঞান-সভার সদস্য ও জনসাধারণের মধ্য হইতেও অনেকে বক্তৃতা শুনিতে সভা-ভবনে গমন করিতেন। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত পঁচিশ হাজার টাকায় পদার্থবিদ্যার গবেষণার

জন্য যন্ত্রপাতি শীঘ্রই ক্রয় করা হইল। সরকার সাময়িক-ভাবে উক্ত ভবনটি সভার ব্যবহারের সমুদয় দায়ঝুঁকি বহন করিতেছিলেন। তাঁহাদের অনুমতি লইয়া সভাকর্তৃপক্ষ ত্রিশ হাজার টাকায় বাড়ীটি ক্রয় করিয়া লন। ইহাকে বিস্তৃততর করিয়া গবেষণার উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে পুনরায় চাঁদা তোলা হইল। এসময়েও অনেকে সভার সাহায্যে অগ্রসর হন। বিভিন্ন রাজা, মহারাজা ও বিদ্যোৎসাহীদের নিকট হইতেও এবারে ত্রিশ হাজার টাকা দান পাওয়া যায়। ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা একাই দিলেন চব্বিশ হাজার টাকা। সভার নবনির্মিত হলটির নাম রাখা হয়—ভিজিয়ানাগ্রাম হল। মহেন্দ্রলালের বড়ই ইচ্ছা—শিক্ষণীয় প্রতিটি বিষয়ের জন্য এক একটি অধ্যাপক-পদ প্রতিষ্ঠা করা। এই নিমিত্ত তিনি তিনটি ফণ্ড প্রতিষ্ঠা করিলেন—১৮৮৪ সনে রিপন প্রফেসরশিপ ফণ্ড, ১৮৯৬ সনে হেয়ার প্রোফেসরশিপ ফণ্ড এবং ১৯০৯ সনে ভিক্টোরিয়া প্রফেসরশিপ ফণ্ড। প্রত্যেকটিরই জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতেও আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু মহেন্দ্রলাল জীবদ্দশায় ইহার কোনটিরই প্রতিষ্ঠা দেখিযা যাইতে পারেন নাই। তবে কোচবিহারের মহারাজা দীর্ঘকাল যাবৎ (এপ্রিল, ১৮৯০—এপ্রিল, ১৯২৩) প্রতি মাসে একশত টাকা দান করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা রসায়নের অধ্যাপকের বেতন দেওয়া হইত। তখনও একটি অধ্যাপক পদের জন্যও স্থায়ী ভাণ্ডার গঠিত না হওয়ায় ১৯০১, ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিজ্ঞানসভার বার্ষিক অধিবেশনে দুঃখ করিয়া মহেন্দ্রলাল এই মর্মে বলিয়াছিলেন, "বিজ্ঞান-সভার জন্য দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবৎ যে সময়ক্ষেপ করিয়াছি, সেই সময়ে অর্থ উপার্জনে মন দিলে হয়ত একাই এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারিতাম, অর্থের জন্য দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না; কিন্তু তাহা হইলে ইহা একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান না হইয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে

পরিণত হইত। এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার সময়ও হাতে প্রচুর থাকিত না।" মহেন্দ্রলালের আশা পূর্ণ হইতে আরো ত্রিশ বৎসর লাগিয়াছিল।

প্রথম হইতেই বহু অধ্যাপক অবেতনে এখানে অধ্যাপনা করিতে অগ্রসর হন। লাফোঁ প্রমুখ অধ্যাপকগণের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার নীলরতন সরকার এখানে বক্তৃতাদানে রত হইয়াছিলেন। আরো বহু বিজ্ঞানী চিকিৎসক ও অধ্যাপক পর পর এখানে অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হন। তাঁহাদের মধ্যে ডঃ চুণীলাল বসু, মহেন্দ্রনাথ রায়, প্রমথনাথ বসু, বনোয়ারীলাল চৌধুরী, ডাঃ অমৃতলাল সরকার এবং গিরীশচন্দ্র বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। সভা-ক্রমে আই এস-সি ছাত্রদের উদ্ভিদ্ বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন পড়াইবার ব্যবস্থা করেন।

বিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ১৯০৪ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ইহধাম ত্যাগ করেন। ইহার পর তদীয় পুত্র ডঃ অমৃতলাল সরকার সভার সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সম্পাদকত্ব কালে (১৯০৪-১৯) বিজ্ঞান-সভার উন্নতি বিশেষভাবে সূচিত হয়। প্রথম ত্রিশ বৎসরে এখানে গবেষণাকার্য তেমন আরম্ভ হইতে পারে নাই। বর্তমান শতকের প্রারম্ভ হইতেই এদিকে কিছু কিছু কাজ হইতে সুরু হয়। ১৯০২ সনে ডঃ সরসীলাল সরকার এখানে গবেষণা কার্যে কিছুকাল আত্মনিয়োগ করেন। ডঃ চুণীলাল বসুর নেতৃত্বে খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষণ কার্য এখানে অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ রসিকলাল দত্ত প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানী প্রথম দিকে রসায়নের গবেষণাও চালাইয়াছিলেন। ১৯০৬ সন হইতে এখানে আবহাওয়া বিভাগ খোলা হয়। বহু বৎসর যাবৎ এখানহ ইতে প্রতি-দিন সংবাদপত্রে আবহাওয়ার বিবরণ প্রেরিত হইয়া মুদ্রিত হইত।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকেই স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্ সরকারী কর্ম লইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। বিজ্ঞানের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ তিনি বিজ্ঞান-সভার দিকে আকৃষ্ট হন। তিনি ১৯০৭ সন হইতে সভার গবেষণাগারে গবেষণা কার্যে রত হন। সরকারী কর্মে অবসর খুবই কম; সভা-কর্তৃপক্ষ তাঁহার জন্য গবেষণাগার সকালে-বিকালে খোলা রাখিতেন। রামনের গবেষণা কার্য চলিতে লাগিল। মধ্যে কিছুকাল তাঁহাকে স্থানান্তরে গমন করিতে হয়। কিন্তু কলিকাতায় পুনরায় স্থিত হইয়া তিনি গবেষণা কার্য পূর্ণোদ্যমে সুরু করিয়া দেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞান-সভারও কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ছিলেন। তিনি রামনের গবেষণার সঙ্গে পরিচিত হইলেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সায়ান্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি রামনকে সরকারী কার্য হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিয়োগ করিলেন। সায়ান্স কলেজের গবেষণাগার তখনই প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় গবেষণার সুবিধার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীত যন্ত্রপাতি বিজ্ঞান-সভায় স্থিত হইল, সায়ান্স কলেজের ছাত্রগণ বিজ্ঞানসভায় রামনের নির্দেশে গবেষণায় রত থাকিতেন।

বিজ্ঞান-সভায় রামন পরিচালিত গবেষণা পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে কিরূপ যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে, বিজ্ঞানী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। আলো-বিকিরণ ও ধ্বনি-বিজ্ঞানে তাঁহার গবেষণা। তিনি ১৯২৪ সনে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি নামে বিখ্যাত বিজ্ঞানী-সভার ফেলো বা সদস্য-পদপ্রাপ্ত হন। আলোবিকিরণ বিষয়ে রামন যে নূতন তত্ত্ব বাহির করেন (১৯২৮), তাহা আজ 'রামন-এফেক্ট' নামে পরিচিত। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি ১৯৩০ সনে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডঃ অমৃতলাল সরকারের মৃত্যুর (১৯১৯) পর হইতে ১৯৩৩ সন পর্যন্ত রামন বিজ্ঞান-সভার সম্পাদকের পদেও

অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৪ সনে এক বৎসরের জন্য তাঁহারই অন্যতম প্রাক্তন ছাত্র ও গবেষক ডঃ কে এস কৃষ্ণন সম্পাদক পদে বৃত হন। ১৯৩৪ সনে 'মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপক পদ' প্রথম গঠিত হয়। কৃষ্ণন এই অধ্যাপক পদ সর্বপ্রথম লাভ করেন। তিনি পদার্থবিদ্যার গবেষণায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিযা সম্মানার্হ হইয়াছেন। তিনিও বিলাতের রয়াল সোসাইটির সদস্য-পদ লাভ করেন। বিজ্ঞানসভার গবেষণাদি প্রকাশের জন্য প্রথমে কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৯২৫ সন হইতে 'প্রোসিডিংস' প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৯২৬ সনে ইহার নাম পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে ইহা 'ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স' নামে প্রতিমাসে প্রকাশিত হইতেছে। বিজ্ঞান-সভায় পরিচালিত গবেষণার ফলাফল ইহার মাধ্যমে দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

বিজ্ঞানসভা বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান তথা গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। ডঃ মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্ব কালে (১৯৪৬-৫১) ইহার রূপ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকাবের বিরাট দানে যাদবপুরে বিজ্ঞান-সভার জন্য একটি সুদৃশ্য ভবন নির্মিত হইয়াছে। এখানে পুরাতন বাটী হইতে গবেষণাগারাদির যাবতীয় জিনিসপত্র স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৪ সনে জানুয়ারী মাসে ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু বিজ্ঞানসভার নূতন ভবনের দ্বার উন্মোচন করেন।

দীর্ঘ পঁচাত্তর বৎসরের মধ্যে ভাবতবর্ষে বিজ্ঞানেব মৌলিক গবেষণাব অভূতপূর্ব ও অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে। মহেন্দ্রলালের ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার কৃতিত্বও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ

বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কলিকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অবদানের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। বর্তমানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আনুপূর্বিক ইতিহাস প্রদান আমাদের উদ্দেশ্য নহে, এখানে তাহা সম্ভবও নয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে বাংলার শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অল্পবিস্তর অবগত আছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁহার অনুবর্তীদের এক দলের মধ্যে নানা বিষয়ে মতান্তর ঘটিতে থাকে। এই দল নিজেদের উন্নতিশীল ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতেন। অতঃপর কুচবিহার বিবাহ (৬ই মার্চ ১৮৭৮) উপলক্ষ্য করিয়া উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। এই বিরোধী দলের মধ্যে সেকালের গুণী জ্ঞানী কর্মী বহু ব্যক্তি ছিলেন। আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবচন্দ্র দেব, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—আর কত জনের নাম করিব? তাঁহারা কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আপোষরফায় বিফল হইয়া নিজেরা একটি স্বতন্ত্র সমাজ গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা টাউনহলে ১৮৭৮ সনের ১৫ই মে আনন্দমোহন বসুর পৌরোহিত্যে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইল। সভায় কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মগণ বাদে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি মনীষী রাজনারায়ণ বসু, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও উপস্থিত ছিলেন। এখানকার

সভায় একটি প্রস্তাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বস্তুতঃ এই দিনটিকেই পরে ইহার প্রতিষ্ঠা-দিবস বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। এই নূতন সমাজের প্রথম সভাপতি আনন্দমোহন বসু, সম্পাদক শিবচন্দ্র দেব ও সহঃ সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত।

ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনা লইয়াই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এই দলের প্রধানতঃ বিরোধ বাধে। কাজেই ইঁহারা সমাজ পরিচালনার জন্য গণতন্ত্রমূলক নিয়মাবলী রচনায় বিশেষ মনোযোগী হন। এই নিমিত্ত একটি সাব-কমিটি গঠিত হইল। বিস্তর আলাপ-আলোচনার পর খসড়া রচিত হইয়া কলিকাতার ও মফঃস্বলের ব্রাহ্মসমাজগুলির নিকট প্রেরিত হয়। তাঁহাদের মতামতের নিরিখে সংশোধনান্তর ১৮৭৮, ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত একটি সাধারণ সভায় নিয়মতন্ত্র গৃহীত হইল। ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কোনও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী রচনা এই প্রথম বলিয়া অনেকে দাবি করেন। তবে এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। ধর্মবিষয়ে প্রতিষ্ঠান-প্রাধান্য অপেক্ষা ব্যক্তিত্বের (Personality) প্রাধান্য অধিকতর হিতকর ও ফলপ্রসূ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ ও কর্মিদল নূতনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ধর্ম-কর্মে মন দিলেন। প্রথমেই একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। ব্রাহ্মগণ মনে করেন ঈশ্বরোপাসনা লোকসেবারই নামান্তর। কাজেই সেবাকার্য তাঁহাদের সমাজ ও ধর্ম-জীবনের মূল লক্ষ্য। সংস্কৃতিমূলক কার্যকলাপের কথা বলিতে গেলে, ধর্মের কথাও আসিয়া পড়ে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই ইহার পক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রচারকার্যে বাহির হন। বিজয়কৃষ্ণ পূর্ববঙ্গের নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। রামকুমার চা-বাগানের শ্রমিকদের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তৎসম্বন্ধে প্রথম পুস্তক লেখেন। পরবর্তী-

কালে এই বিষয়ে যে-সব আলোচনা ও আন্দোলন হয় এখানেই তাহার সূত্রপাত। ১৮৮১ সনে চা-বাগানের শ্রমিক সম্পর্কিত আইন প্রণয়নকালে ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাট লর্ড রিপণ যে বক্তৃতা দেন তাহাতে রামকুমারের উক্তির যাথার্থ্য তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব পর্যটনে বাহির হন। তিনি পরেও একাধিকবার ঐসব অঞ্চলে গিয়াছিলেন। সিন্ধু, গুজরাট, বোম্বাই, মাদ্রাজ ভ্রমণেও তিনি ক্ষান্ত হন নাই। ১৮৭৭ সন হইতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভারত পরিক্রমা সুরু করিয়াছিলেন তাহার পরিপূরকরূপে শিবনাথের ভ্রমণ বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধ দৃঢ়তর করিবার পক্ষে সবিশেষ কার্যকরী হয়।

১৮৭৮ সনের শেষার্ধেই একদিকে যেমন সমগ্র ভারতে প্রচার-কার্য সুরু হইল, অন্যদিকে তেমনি একটি স্থায়ী মন্দির প্রতিষ্ঠাব আয়োজন চলিতে লাগিল। বর্তমান সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির, পশ্চিম দিকের প্রাঙ্গণ এবং সাধনাশ্রম সব মিলাইয়া চব্বিশ কাঠার উপর ভূমি ক্রীত হইল। ১৮৭৯ সনের মাঘোৎসবের সময় বর্ষীয়ান্ নেতা শিবচন্দ্র দেব মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর মহাসমারোহে স্থাপন করিলেন। নির্মাণকার্য শেষ হইলে, ১৮৮১ সনের ২২শে জানুয়ারী মন্দির-প্রবেশ উৎসব সুসম্পন্ন হয়। ১৮৭৮ সনে, (বাংলা ১৬ই জৈষ্ঠ, ১২৮৫) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী' নামক পাক্ষিক পত্রিকা শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে। ইহার অল্পকাল পূর্বে, ১৮৭৮, ২১শে মার্চ হইতে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' শীর্ষক একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক নব্যপন্থী ব্রাহ্মদের মতামত প্রচারের জন্য বাহির হইয়াছিল। ইহার সম্পাদক ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পিতা ভুবনমোহন দাশ। তবে উহাতে তৎকালীন প্রগতিমূলক রাজনৈতিক আলোচনাও যথেষ্ট স্থান পাইত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বৎসর, অর্থাৎ ১৮৭৯ সনটি নানা কারণে বিশেষ স্মরণীয়। শিক্ষা ও সেবা, নারী জাতির উন্নতি ও সাহিত্যের প্রসার—ব্রাহ্মসমাজের কর্মিগণের প্রধান কার্য। ১৮৭৯ সনের ৬ই জানুয়ারী সিটিস্কুল স্থাপিত হইল। ইহার অনুষ্ঠানপত্র প্রচারিত হয় আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবনাথ শাস্ত্রীর স্বাক্ষরে। ইঁহারা তখন যুবসমাজের নেতা ও আদর্শস্থল। বিদ্যালয় খুলিবার পরই ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া গেল। প্রথমাবধি স্কুলের আয় হইতেই যাবতীয় ব্যয় সঙ্কুলান হইতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথও এখানে অধ্যাপনায় রত হইলেন। সিটি স্কুলের কলেজ বিভাগ খোলা হয় ১৭ই জানুয়ারী ১৮৮১। কলিকাতার ছাত্র সমাজ অল্পকালের মধ্যেই এখানকার আদর্শ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হইতে সুরু হয় এই ১৮৭৯ সন হইতে ব্রাহ্মসমাজের কর্মীদের আগ্রহে মাঘোৎসবকালে প্রথমে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে এবং পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে স্মৃতিসভা হইতে থাকে। ১৮৮৬ সনে মাঘোৎসবের পরিবর্তে রামমোহনের মৃত্যু দিবস ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। তদবধি নানা স্থানে এই তারিখেই উক্ত মহাপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হইয়া আসিতেছে। এই স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইতে প্রেরণা পাইয়া নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তথ্যমূলক রামমোহন জীবনী রচনা করিয়া প্রকাশ করিলেন (১৮৮২)।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মহিলারাও ১৮৭৯ সন হইতে আত্ম-সংগঠনে মন দিলেন। ধর্মার্থে ব্রাহ্মিকা সমাজ ষষ্ঠ দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতাশ্রমের অধীন ‘বামাহিতৈষিণী সভা’ নারীদের মধ্যে শিক্ষা, সাহিত্য, সেবা ও জাতীয় ভাব উন্মেষের উদ্দেশ্যে

স্থাপিত হইয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মহিলারাও এই সভার অনুরূপ বঙ্গ মহিলাসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন ১৮৭৯ সনের ১লা আগষ্ট তারিখে। বেথুন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী রাধারাণী লাহিড়ী প্রথম সভা-নেত্রী এবং আনন্দমোহন বসুর পত্নী স্বর্ণপ্রভা বসু প্রথম সম্পাদিকা পদে বৃত হন। বস্তুতঃ বসু মহাশয়ার আগ্রহাতিশয্যই ছিল এই সমাজ গঠনের মূলে। মহিলাদের শিক্ষাপ্রদ 'প্রবন্ধ লতিকা' নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন সভানেত্রী রাধারাণী। গৃহশিক্ষা, গৃহস্থলী শিক্ষা, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্গ মহিলাসমাজ মনঃসংযোগ করেন। তাঁহারা মহিলাদের সামাজিক সম্মেলনেরও আয়োজন করিলেন। এই সম্মেলন দীর্ঘকাল চলিয়া-ছিল। পরে, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইহার স্থান গ্রহণ করে ভারত মহিলা সমিতি। কাদম্বিনী লাহিড়ী ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি ইহার তত্ত্বাবধানে একটি বিধবাশ্রম পরিচালনা করিতে থাকেন। হিরণ্ময়ী দেবী কর্তৃক শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা উঠিয়া যায়।

১৮৭৯ সনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়। সমাজের অন্যতম নেতা দুর্গামোহন দাস তাঁহার ধর্ম বিষয়ক পুস্তক-সংগ্রহ দান করায় অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রন্থাগার স্থাপন সম্ভব হইয়াছিল। পরে বিভিন্ন সংগ্রহ লাভে গ্রন্থাগারটি বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে। কুমারী এস. ডি. কলেটের গ্রন্থ-সংগ্রহ এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে প্রাপ্ত মহেশচন্দ্র ঘোষের সম্পূর্ণ দর্শন গ্রন্থাগার দ্বারা ইহার গুরুত্ব বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। সমাজের গ্রন্থ বিভাগের কার্যও ১৮৭৯ সন হইতে সুরু হয় প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক প্রকাশ দ্বারা। এই বিভাগ পরে ধর্ম, জীবনী ও সমাজ-সংস্কারমূলক পুস্তক প্রকাশ করিয়া বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই সময় ৯৩নং কলেজ ষ্ট্রীটে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রেস' নামে একটি ছাপাখানারও উল্লেখ পাই। এখানে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' মুদ্রিত হইত। ব্রাহ্ম-

সমাজের নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্র ব্রাহ্ম মিশন প্রেস স্থাপিত হয় ১৮৮৭ সনে। উক্ত ইংরেজী পত্রিকার পরিবর্তে ১৮৮৩, ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে সাপ্তাহিক 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় সমাজের ইংরেজী মুখপত্ররূপে বাহির হইয়াছিল।

শিশু ও কিশোর বালক-বালিকাদের আদর্শ শিক্ষার জন্যও সমাজ-কর্তৃপক্ষের প্রথম হইতেই দৃষ্টি ছিল। ১৮৮০ সনে এই উদ্দেশ্যে একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়। তবে এনিমিত্ত প্রথম ব্যক্তিগত ভাবেই কার্য আরম্ভ হয় ১৮৮২ সন হইতে। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই বৎসরে এরূপ একটি শিশু-বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। কিন্তু ইহা বেশী দিন টিকিল না, পর বৎসরই উঠিয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজ-কর্তৃপক্ষ ১৮৯০, ১৬ই মে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় স্থাপন করিলেন। এখানে শিশু ও কিশোর ছেলেমেয়েরা নিম্নতম শ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়িতে পাইত। ইহা ১৮৯৬ সনে একটি প্রথম শ্রেণীর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এ বৎসর হইতে এখানে শিক্ষয়িত্রী-শিক্ষণকার্যও সুরু হইল। ১৯০৩ সনে মেরী কার্পেণ্টার প্রদত্ত ৩৬,০০০৲ টাকা গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ২৫,০০০৲ টাকা এবং সাধারণের নিকট হইতে আদায়ীকৃত অর্থে আপার সার্কুলার রোডের উপরে বাড়ী ও জমি শিক্ষালয়ের জন্য ক্রয় করা হয়। এই বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীতে বহু বৎসর যাবৎ ছেলে ও মেয়ে উভয়েই পড়িতে পাইত।

স্ত্রী-শিক্ষা ও শিশু-শিক্ষা সম্বন্ধে সমাজ-নেতৃবর্গের অন্যান্য কার্যও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়' নামে একটি বিদ্যালয় পরিচালিত হইত। মিস অ্যানেট অ্যাক্রয়েডের (পরে মিসেস বিভারিজ) হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়েরই অনুক্রম। বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল। ইহা পরে,

১৮৭৮ সনের ১লা আগষ্ট বেথুন স্কুলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়। বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয়েরই ছাত্রী কাদম্বিনী বসু (পরে গাঙ্গুলী) বেথুন স্কুল হইতে ১৮৭৮ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস ও উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতারা বেথুন স্কুলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে থাকেন। উমেশচন্দ্র দত্তের 'বামাবোধিনী পত্রিকা' স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার তথা নারীজাতির উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। শিশু-শিক্ষায় সমাজ-নেতাদের মনোযোগের কথা বলিয়াছি। সিটি স্কুলের শিক্ষক প্রমদাচরণ সেন শিশুদের জন্য 'সখা' নামে একখানি সচিত্র মাসিকপত্র ১৮৮২, জানুয়ারী হইতে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অকালবিয়োগে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কিছুকাল (জুলাই ১৮৮৫—১৮৮৬) ইহা সম্পাদনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার পর, ১লা অক্টোবর, ১৮৯০ হইতে কয়েকজন মহিলা একটি বোর্ডিং স্কুল গঠন কবিয়াছিলেন। ইহা ঐ বিদ্যালয়ের সঙ্গে অল্পকাল পরেই মিশিয়া যায়। মহিলারা একটি সান্‌ডে স্কুলও পরিচালনা করিতেন। তাঁহাদের উদ্যোগে 'মুকুল' নামে একখানি সচিত্র শিশু-পত্রিকা প্রকাশিত হইল (আষাঢ় ১৩০২)। ইহারও প্রথম সম্পাদক হইলেন শিবনাথ শাস্ত্রী।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্কৃতিমূলক ও জনহিতকর কার্য বিভিন্ন দিকে অনুসৃত হইতেছিল। সমাজের অন্যতম প্রবীণ নেতা শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বরাহনগরের শ্রমিকদের বিবিধ প্রকার উন্নতি বিষয়ে পূর্ব হইতেই মনোযোগী হইয়াছিলেন। 'ভারত শ্রমজীবী' নামক একখানি পত্রিকা তিনি ১৮৭৪ সনেই প্রকাশ করেন। শ্রমজীবীদের নৈতিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনের দিকে এই কাগজখানির লক্ষ্য ছিল। তাহাদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়ও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে তাহাদের মধ্যে প্রচারকার্য

পরিচালনার্থ কর্তৃপক্ষ প্রয়াসী হন (১৮৮০)। শ্রমজীবীদের মধ্যে সেবাকার্যে রত থাকায় শশীপদ 'সেবাব্রত' শীর্ষক জনপ্রিয় উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

এই সমাজের আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্য—আসামের পার্বত্য অঞ্চলে, বিশেষতঃ খাসিয়াদের মধ্যে মিশন প্রতিষ্ঠা (১৮৮৯)। এতাবৎকাল খ্রীষ্টান পাদ্রীরা উক্ত অঞ্চলগুলিতে ধর্ম প্রচারে রত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ মিশন প্রতিষ্ঠায় তাহা কতকটা ব্যাহত হয়। নীলমণি চক্রবর্তীর উপর এই কার্যের ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি খাসি ভাষায় সঙ্গীত ও অন্যান্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। প্রথমে মিশন শিলং-এ থাকিয়া কাজ চালাইতেছিল। পরে চেরাপুঞ্জীতে ইহা নীত হয়। নীলমণি চক্রবর্তী সেবাকার্যেও বিশেষ অবহিত ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টা-যত্নে চেরাপুঞ্জীতে একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এখানে একটি স্কুল স্থাপন করেন। তাঁহার একজন যোগ্য সহকর্মী ছিলেন কামিনীকুমার ঘোষ।

অনুন্নত সমাজের উন্নতির জন্য পরবর্তী কালে (১৯০৯) যে সমিতি স্থাপিত হয় তাহার কার্যকলাপও বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। অনুন্নত শ্রেণীসমূহের বালক-বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার ও সেবা-কার্যের প্রচার ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সমাজে সাম্যবোধের উন্মেষসাধনে এই সমিতির কৃতিত্ব ভুলিবার নয়। ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলী'র (১৯১২) সেবাকার্যে তৎপরতাও আমরা এখানে স্মরণ করি।

এই সমাজের আর একটি প্রধান কার্য ১৮৯২ সনে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের প্রাঙ্গণে সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্ম আচার্য ও কর্মীদের ত্যাগপূত জীবন যাপনে সুযোগ দেওয়া এই আশ্রমের অন্যতম লক্ষ্য

ছিল। এখানে নিজের জন্য অর্থাদি না রাখিয়া প্রয়োজন মত প্রত্যেকে ব্যয় করিবেন স্থির হয়। ইহার আদর্শ কতকটা কেশবচন্দ্র সেনের ভারতাশ্রমের অনুরূপ। এখানকার আচার্য ও কর্মীরা একদিকে যেমন ধর্মালোচনায় মন দিয়াছিলেন অন্য দিকে তেমনি শিক্ষা বিস্তার, জনসেবা ও ধর্মতত্ত্বমূলক গ্রন্থাদি প্রকাশেও অভিনিবিষ্ট হন। মূল আশ্রমের তিনটি শাখা স্থাপিত হয় ঢাকা, বাঁকীপুর ও লাহোরে। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কলিকাতা হইতে আশ্রমের পক্ষে একখানি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। গীতা ও উপনিষদের সটীক সংস্করণ এবং তত্ত্ববিদ্যা ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ক বহু ইংরেজী বাংলা পুস্তকও তাঁহার দ্বারা পর পর সম্পাদিত ও রচিত হইয়া প্রকাশিত হয়। লাহোর শাখা হইতে হিন্দী ও উর্দু ভাষায় বহু মূল ও অনুবাদ পুস্তকও বাহির হইতে লাগিল। বাঁকিপুরস্থ আশ্রমের তত্ত্বাবধানে রামমোহন রায় সেমিনারী নামে এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ১৮৯৭ সনে স্থাপিত হইল। আশ্রমাধ্যক্ষ গুরুদাস চক্রবর্তী স্থানীয় মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলনে এবং নৈশ বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইলেন। ঐ স্থলে ১৮৯৯ সনে প্লেগ মহামারীর সময় তাঁহার তত্ত্বাবধানে সেবাকার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়।

বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে এবং বঙ্গের বাহিরে বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে বিবিধ কার্যের মধ্য দিয়া যোগসূত্র স্থাপনে সমাজ-নেতারা বিশেষ প্রয়াসী হন। গ্রেট বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের আয়োজন হইল ১৮৯৬ সন হইতে। ডাঃ জেবেস টি. সাণ্ডারলণ্ড এই বৎসর ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি কলিকাতার তিনটি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিদের দ্বারা একটি কমিটি গঠন করাইতে সমর্থ হন। বিলাতী বৃত্তির সাহায্যে, এক বৎসরের জন্য অকস্‌ফোর্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার নিউ কলেজে তত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন ও

তথাকার একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে কমিটি এক এক বৎসরের জন্য এক একজন ভদ্রলোককে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। প্রথম বৎসর ১৮৯৬ সনে গেলেন কেশবচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রমথলাল সেন। দ্বিতীয় বৎসরে কেহ যান নাই। তৃতীয় বৎসরে যান বিপিনচন্দ্র পাল ও হেমচন্দ্র সরকার। বিপিনচন্দ্র এই সুযোগে আমেরিকাও পরিভ্রমণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ তখন আমেরিকায়। স্বামীজীর প্রভাব আমেরিকাবাসীদের মনে কত গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া আসেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে কবি, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ্, সমাজসেবক কত যে উদ্ভূত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ সেন, কামিনী রায়ের সাহিত্য সাধনা বাঙালী মাত্রেরই শ্লাঘার বিষয়। বিজ্ঞান-জগতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম বিশ্ববিশ্রুত। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র সম্পাদনায় উমেশচন্দ্র দত্ত (বামাবোধিনী পত্রিকা), কৃষ্ণকুমার মিত্র (সঞ্জীবনী), বিপিনচন্দ্র পাল (নিউ ইণ্ডিয়া, বন্দেমাতরম্ প্রভৃতি), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (দাসী, প্রদীপ, প্রবাসী ও ইংরেজী মডার্ণ রিভিউ), দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (নব্যভারত) প্রমুখ সাংবাদিকদের পরিচয় দিবার আবশ্যক করে না। লোকশিক্ষায়, সমাজ সংস্কারে ও অন্যান্য বহু কর্মে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণপ্রভা বসু, কাদাম্বনী গাঙ্গুলী, সরলা রায়, অবলা বসু প্রভৃতি অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজনীতি ক্ষেত্রে আনন্দমোহন বসু বহু বিষয়ে জাতির পথপ্রদর্শক হইয়া আছেন। বাংলার সংস্কৃতি-সাধনায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দান অফুরন্ত।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট

ইতিপূর্বে আমরা অ্যালবার্ট হল বা ইন্‌ষ্টিটিউটের কথা আলোচনা করিয়াছি। ইহার অনতিদূরে গোল-দীঘির উত্তর-পূর্ব কোণে রাস্তার অপর পারে যে বিরাট সৌধ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহাই হইল কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট। অ্যালবার্ট হলের উদ্দেশ্যের সঙ্গে ইহার মূলগত সাদৃশ্য থাকিলেও কার্যতঃ ইহার লক্ষ্য ছিল অনেকটা বিভিন্ন। কারণ কলেজের ছাত্রদের চরিত্র-গঠন, উন্নততর শিক্ষাদান, স্বাস্থ্য-বিধান এবং তাঁহাদের মধ্যে সেবার ভাব উদ্রেকের জন্যই বিশেষ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটির আবির্ভাব হয়।

তবে অ্যালবার্ট হলের আদর্শ দ্বারাই যে ইহার মূল প্রতিষ্ঠাতা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের আশৈশব সঙ্গী, সমবয়সী ও সহকর্মী। কেশবচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অ্যালবার্ট হলের সঙ্গে তিনিও নানাভাবে জড়িত ছিলেন, ইঁহার কার্যকারিতা তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা—এক কথায় ছাত্র-সমাজের সর্বপ্রকার উন্নতি সম্বন্ধে প্রতাপচন্দ্র চিন্তা করিতে থাকেন। ভারত সরকার ১৮৮৭ সনের ডিসেম্বর এবং ১৮৮৯ সনের আগষ্ট মাসে যথাক্রমে দুইটি রেজল্যুশন বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন—দুই-ই ছিল সরকারী শিক্ষালয়-গুলির ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষাদান সম্পর্কে। প্রতাপচন্দ্র ১৮৮৯ সনে সিমলা অবস্থানকালে এই বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন। ইহাতে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের একত্র করিয়া যথাবিহিত সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত নিজ মতামত ব্যক্ত করিলেন।

প্রতাপচন্দ্রের জীবনীকার বলেন, ১৮৯০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কার্সিয়াঙে নিজ বাটী 'শৈলাশ্রমে' অবস্থান করিতেছিলেন। তখন বেলা দশটা, রবির কিরণ ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রাতঃভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ছেলেদের মঙ্গল-চিন্তায় তাঁহার মন যেন তখন ভরিয়া উঠিল। স্নানে না গিয়া তিনি কাগজ-কলম লইয়া বসিলেন। কিভাবে ছাত্রদের জ্ঞান বৃদ্ধিকল্পে এক প্রস্থ বক্তৃতার আয়োজন করা যায়, তাহার উপায়াদি তাঁহার যেমন মনে আসিয়াছিল কাগজে লিখিয়া ফেলিলেন।

প্রতাপচন্দ্র কালবিলম্ব করিলেন না। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াই সর্বসাধারণের জন্য চারিটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। প্রথম বক্তৃতা দেন তিনি নিজে; বিষয়—'বিংশ শতাব্দীর হিন্দু।' ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলী এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অন্য তিনটি বক্তৃতারও পর পর ব্যবস্থা হইল এবং বক্তৃতা দিলেন যথাক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এবং প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও স্বদেশহিতৈষী রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতাপচন্দ্র ঐ একই উদ্দেশ্যে যুবকদের জন্য একখানি ইংরেজী ও মহিলাদের জন্য একখানি বাঙ্গলা বইও সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিলেন।

ইহার পর ছাত্রসমাজের নিমিত্ত একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার কথা প্রতাপচন্দ্রের মনে উদয় হইল। তিনি ইতিমধ্যেই ব্যক্তিগতভাবে যেরূপ কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাতে শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষও কতকটা উদ্বুদ্ধ হইলেন। তখনকার শিক্ষা-অধিকর্তা সার অ্যালফ্রেড ক্রফ্‌ট ১৮৯১ সনের ১৪ই এপ্রিল তাঁহার আপিসে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া একটি সভা ডাকিলেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতাপচন্দ্র কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষদের নিকট ১৮৯১,

জুলাই মাসে এই মর্মে একখানি আবেদন-পত্র প্রচার করেন যে, তাঁহারা শীঘ্রই একটি সম্মেলন আহ্বান করিবেন, এই সম্মেলনে অধ্যক্ষগণ নিজ নিজ কলেজের বি-এ চতুর্থ শ্রেণী এবং এম-এ শ্রেণীর ছাত্রদের প্রতিনিধি যেন প্রেরণ করেন।

সংস্কৃত কলেজ ভবনে ১৮৯১, ১৩ই আগষ্ট তারিখে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইল। প্রতাপচন্দ্র হইলেন সভাপতি। একত্রিশ জন ছাত্র-প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনাদির পর দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইল: প্রথম প্রস্তাবে ছাত্র-সমাজের নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য "সোসাইটি ফর দি ট্রেনিং অফ ইয়ংমেন" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হইল যে, এই উদ্দেশ্যে তিনটি বিভাগ থাকিবে—(ক) ব্যায়াম বিভাগ, সভাপতি—এইচ লী, (খ) সাহিত্য বিভাগ, সভাপতি—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও (গ) নৈতিক বিভাগ, সভাপতি—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বয়ং।

ইহার পর এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধনসভা হইল ১৮৯১ সনের ৩১শে আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে। এদিনে সভাপতিত্ব করেন হাইকোর্টের বিচারপতি এল আর টোটেনহাম। ছাত্রেরা সভায় আসিয়া ভীড় জমাইল। প্রস্তাবিত সোসাইটির উদ্দেশ্য সকলকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল। সভাপতি, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এইচ লী, মৌলবী আব্দুল জব্বর, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে এই সভায় ছাত্রগণকে অধিক সংখ্যায় যোগদানের নিমিত্ত নিজ নিজ বক্তৃতায় আবেদন জানাইলেন। সাময়িকভাবে টোটেনহামই ইহার সভাপতি নিযুক্ত হইলেন, সম্পাদক হন প্রতাপচন্দ্র নিজে।

সোসাইটির আর একটি সাধারণ সভা হইল সেনেট হাউসে ১৮৯১, ১৯শে ডিসেম্বর দিবসে। এই দিন সোসাইটির নির্বাচিত স্থায়ী সভাপতি এইচ, এইচ রিজ্‌লি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তিনি গ্রেট ব্রিটেন ও জার্মানীর ছাত্র-সমাজের সঙ্গে বাংলার ছাত্রদের তুলনা করিয়া এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিলেন। এই সভায় সাতজন অতিরিক্ত সদস্য (এডিশন্যাল মেম্বর) গৃহীত হন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন—ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ডঃ পি কে রায়, রাজকুমার সর্বাধিকারী ও পণ্ডিত গৌর-গোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ১৮৯২ সনের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে চ্যান্সেলাররূপে বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন এতাদৃশ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। ইহার উদ্দেশ্যের প্রতি নিজ সমর্থন ও সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ তিনি পাঁচ হাজার টাকা দিলেন। সোসাইটির আর একটি সভা হয় ১৮৯২, ৫ই ফেব্রুয়ারী। এদিনকার সভায় (১) খেলার মাঠ ও পাঠাগারের স্থান নির্ণয় এবং (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যাতিরিক্ত পুস্তকাদি নির্বাচনের জন্য দুইটি সাব্-কমিটি গঠিত হয়। শেষোক্ত কমিটিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন সদস্য ছিলেন।

এই বৎসরেই (১৮৯২) সোসাইটির আনুকূল্যে ও তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের পরস্পরের সাহায্যার্থে একটি কমিটি ("কমিটি অফ ইয়ং মেন ফর মিউচুয়াল এড্") গঠিত হয়। ইহার সম্পাদক হন দেবেন্দ্র-নাথ সেন। তখন উচ্চ শিক্ষালাভার্থে বাংলার দূর-দূরান্ত হইতে ছেলেরা আসিয়া বিভিন্ন ছাত্রাবাসে আশ্রয় লইত। গৃহের পরিবেশ হইতে দূরে থাকায় তাহাদের অনেকের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পাইত। ইহা নিবারণকল্পে এবং ছাত্রদের আপদে-বিপদে সাহায্যার্থে পরস্পরে যাহাতে অগ্রসর হয়, তাহার নিমিত্ত এই কমিটি স্থাপিত

হইল। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'পরিদর্শক'-রূপে প্রায়ই ছাত্রাবাসসমূহে গমন করিতেন এবং ছাত্রগণকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

ছাত্রদের পরস্পর মেলামেশারও আয়োজন চলিতে লাগিল সোসাইটির আনুকূল্যে। প্রথমে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বগৃহে ছাত্রদের আহ্বান করিলেন। ১৮৯২ সনের ১৪ই জানুয়ারী ছোটলাট সার চার্লস এলিয়টের আহ্বানে বেলভেডিয়ার প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ছাত্র-সমাবেশ হয়। ইহার পর ৬ই ফেব্রুয়ারী মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর "মরকতকুঞ্জ" উদ্যানে ছাত্রদের আপ্যায়িত করেন। বড়লাট ল্যান্সডাউন ও ছোটলাট এলিয়ট ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। ছোট-লাট স্টীমার-পার্টিতে ছাত্রদের লইয়া যান। ছাত্র-সমাজের সঙ্গে উচ্চ-কর্তৃপক্ষ ঐ সময়ে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ লইতে ছাড়িতেন না।

সোসাইটি স্থাপিত হইলেও প্রথম দিকে ইহার কোন স্থায়ী আবাস নির্দিষ্ট ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় অল্পকালের জন্য সেনেট হাউসে ইহার কার্য পরিচালনার অনুমতি দিয়াছিলেন। সোসাইটির একজন প্রাচীন সভ্য বলেন, বরদাপ্রসাদ ঘোষের বাসভবনে ইহার আপিস প্রথমে স্থিত হয় এবং দেবেন্দ্রনাথ সেন ও ছাত্র-সভ্যগণ কার্য চালাইতেন। তিনি আরও বলেন যে, সাহিত্য বিভাগের সভা বঙ্কিমচন্দ্রের বাসগৃহে হইত। প্রতাপচন্দ্রের বাসগৃহে নৈতিক বিভাগের সভা বসিত। ব্যায়াম বিভাগের আলোচনা চলিত প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হেয়ার স্কুলের মধ্যবর্তী উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।

বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া পদস্থ সরকারী কর্মচারী মাত্রেই এই সোসাইটিকে সমর্থন করিতে লাগিলেন, তখন ইহার একটি উপযুক্ত আবাসস্থল পাওয়াও বিশেষ কঠিন হইল না। প্রতাপচন্দ্রের চেষ্টায় ছোটলাট এলিয়ট হিন্দু স্কুলের পূর্বদিকের কয়েকটি প্রকোষ্ঠ

সোসাইটির ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিতে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। তিনি স্বয়ং চীফ সেক্রেটারীকে সঙ্গে করিয়া ১৮৯২ ডিসেম্বর মাসে এইস্থান পরিদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। সোসাইটির কার্যের উপযুক্ত করিয়া এগুলি মেরামত করিয়া লওয়া হইল। ১৮৯৩, মার্চ মাস হইতে ইহার কার্যও এখানে আরম্ভ হয়। সোসাইটির গ্রন্থাগার এবং পাঠাগার এখানে স্থিত হইল। বাংলা সরকার প্রতি মাসে একশত টাকা অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিলেন। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ১৯১২ সন হইতে মাসিক সাহায্য বাড়াইয়া দুইশত টাকা করা হইল।

১৮৯৩ সন হইতে সোসাইটির কার্য বিশেষভাবে সুরু হয়। এই বৎসরে বাংলার মনীষিদের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতে থাকে। হিন্দু ধর্ম ও নীতি, ললিতকলা, প্রাচীন আর্যদের ছাত্রজীবন, বৌদ্ধধর্ম ও জীবন, ইসলামে নীতিবাদ, জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে যথাক্রমে বক্তৃতা দিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত (১০ মার্চ), প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (১৯ মার্চ), পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় (২৪ মার্চ), ধর্মপাল, বিচারপতি আমীর আলি (১ জুলাই), পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (১০ অক্টোবর)।

শেষোক্ত বক্তৃতার ফলে সোসাইটি একটি নূতন কার্যে উদ্বুদ্ধ হয় সভ্যগণ সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় ভাব প্রচারকল্পে ১৮৯৪ সনের জানুয়ারী মাস হইতে 'দি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিন' নামে একখানি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৩ সনে সোসাইটির কর্মকর্তাদের মধ্যে কতক রদ-বদল হইল। সোসাইটিব প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র শিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে নিমন্ত্রিত হইয়া আমেরিকায় যান। আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে ১৮৯৩, ৮ই জুলাই তারিখে তিনি সেক্রেটারীর পদে ইস্তফা দেন। তাঁহার স্থলে প্রথমে সাময়িক ও পরে স্থায়ীভাবে সেক্রেটারী

বা, [illegible] নিযুক্ত হন প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক সি আর উইলসন। দ্বিতীয়ও সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এই বৎসরের ১৫ই আগষ্ট। তাঁহার স্থলে সভাপতি হন বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী এইচ জে এস কটন। তিনি ভারত-বন্ধু ছিলেন। আসামের চীফ কমিশনারের পদ হইতে অবসর গ্রহণান্তে ১৯০৪ সনে তিনি কংগ্রেসের সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন। ঐ বৎসরের আর একটি ব্যাপারও এখানে উল্লেখযোগ্য। সোসাইটির নিয়মাবলী এবারে সুষ্ঠুভাবে রচিত হইল। ছাত্রগণকে জুনিয়র 'মেম্বর'রূপে ইহার পরিচালনার কতকটা অধিকার দেওয়া হয়।

সোসাইটির কার্য অতঃপর পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। 'ম্যাগাজিন' ১৮৯৪, জানুয়ারী সংখ্যা বাহির হইল। বঙ্কিমচন্দ্র 'বৈদিক সাহিত্যানুশীলন' সম্পর্কে সাহিত্য বিভাগে তিনটি বক্তৃতা দিলেন। ইহার দুইটি সোসাইটির ম্যাগাজিনে (১লা মার্চ ১৮৯৪ ও ১ এপ্রিল ১৮৯৪) পর পর প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে তাঁহার আরও বক্তৃতা দানের বাসনা ছিল। কিন্তু মৃত্যু তাঁহাকে ৮ এপ্রিল ১৮৯৭ দিবসে মরধাম হইতে ছিনাইয়া লইল। প্রতাপচন্দ্র ইতিপূর্বেই প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সোসাইটি ১১ই এপ্রিল বঙ্কিম-চন্দ্রের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের নিমিত্ত সাধারণ সভা আহ্বান করিলেন। 'সংস্কৃতির অগ্রদূত বঙ্কিমচন্দ্র'—শীর্ষক প্রতাপচন্দ্র যে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন, তাহা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বঙ্কিম-চন্দ্র যুবক-বন্ধুদের বেদ অনুশীলনের জন্য যে কিরূপ আকুতি জানাইয়া-ছিলেন নিম্নের কয়েকটি ছত্রে তাহা সুপ্রকট :—

"His young friends who are willing to go through a course of 'Higher Training' as we call it, ought to possess a certain amount of knowledge, of the great Vedic literature of our country ; and that at least

an appreciable portion of them ought to be competent scholars who derive their knowledge from original sources."

সোসাইটির কার্যকলাপের বিষয় শিক্ষা-অধিকর্তার বার্ষিক বিবরণেও (এন্যুয়্যাল রিপোর্ট অফ্ দি ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন) স্থান পাইতে দেখিয়াছি। ১৮৯৪-৯৫ সনের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, এ বৎসর ইহার সদস্য-সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫০ জনে, পূর্ব বৎসর ছিল ২৫০ জন। পঞ্চাশ জন ছিলেন সিনিয়র সদস্য। ইহা বাদে আর সকলেই ছাত্র-সভ্য বা জুনিয়ব মেম্বর। এই সনে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিদ্যুৎ-বিকিরণ (ইলেক্ট্রিক্যাল রেডিয়েশন)—সম্পর্কে সোসাইটির সভ্যগণের সম্মুখে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এ বৎসবে আবও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। সোসাইটির কার্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতব স্থানেব আবশ্যক হইল। হিন্দু স্কুলের আবও চারিটি প্রকোষ্ঠ ও প্রাঙ্গণ সোসাইটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রদত্ত অর্থে প্রাঙ্গণে একটি টেনিস খেলাব মাঠ প্রস্তুত করা হইল। সোসাইটির আনুকূল্যে ক্রিকেট ও ফুটবল প্রতিযোগিতারও আয়োজন হয়। এই বৎসরে আর একটি বিষয়ের প্রতিও শিক্ষা-অধিকর্তা উক্ত বিবরণে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এখন যেখানে মার্কাস স্কোয়ার অবস্থিত, পূর্বে সেখানে একটা প্রকাণ্ড বস্তি ছিল। বাংলা সরকার সোসাইটির সাহায্যার্থে এই অঞ্চলটি দখল করেন। ইহাতে তাঁহাদেব পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণও এজন্য পনের হাজার টাকা অর্পণ করিলেন। এইরূপে সরকারী ও বেসরকারী অর্থে সোসাইটির জন্য মার্কাস স্কোয়ারে খেলার মাঠ তৈরী হয়।

সোসাইটির অত বড় নাম অনেকেরই পছন্দ হয় নাই। ১৮৯৬

সন নাগাদ ইহার নাম পরিবর্তনের চেষ্টা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগেই অনুমতি লওয়া হইয়াছিল। কুড়িজন সদস্যের প্রস্তাবে ১৮৯৬, ১৫ই আগষ্ট একটি বিশেষ সভায় সোসাইটির নাম দেওয়া হইল 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট'। এ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ ও সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তবে অধিকাংশ সদস্যই উক্ত নামের পক্ষে ছিলেন। এইরূপে নূতন নামে এবং কথঞ্চিৎ নূতনরূপেও সোসাইটির কার্য পূর্ণোদ্যমে সুরু হইল।

সাহিত্য-বিভাগে সোসাইটির কার্য বেশ আড়ম্বরেই চলিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৪ সনে 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নামক নূতন রচনা এখানে সর্বজনসমক্ষে পাঠ করেন।

অধ্যাপক উইলসনের সম্পাদকত্বকালে (১৮৯৩-১৮৯৯) কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের উন্নতি হইল নানা দিকে ছাত্রদের মধ্যে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয় ১৮৯৭ সনে। এখানে অভিনয়ও আরম্ভ হইল দুই বৎসর পরে। এই সময় 'মেঘনাদ বধ' ও 'জুলিয়স সীজার' অভিনয় অনেকের প্রশংসা অর্জন করে। বাংলা নাটক অভিনয়ের নূতন টেক্‌নিক বা ভঙ্গিমা এখানে সর্বপ্রথম অনুসৃত হয়। গ্রন্থাগার, পাঠাগারে নিয়মিতভাবে পঠনাদি হইতে থাকে। খেলাধূলার আয়োজন পূর্ণমাত্রায় চলে। মার্কাস স্কোয়ার তখন এই প্রতিষ্ঠানের ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার মাঠে পরিণত হইয়াছিল। আবার স্কুল-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে টেনিস খেলা এবং গোলদীঘিতে নৌকা-চালনারও ব্যবস্থা ছিল।

উইলসনের পরে কয়েক বৎসর যাবৎ ইনষ্টিটিউটের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। মার্কাস স্কোয়ারটিকে কর্পোরেশন দখল করিয়া লয়। অন্যান্য দিকেও প্রগতি ব্যাহত হইতেছিল। ১৯০৬,

আগষ্ট মাসে অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন সম্পাদকরূপে ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্যভার গ্রহণ করায় আবার বিভিন্ন বিভাগে নূতন সাড়া পড়িয়া যায়। খেলাধূলার ব্যবস্থা পূর্বেকার ন্যায় চালু হইল। গ্রন্থাগার, পাঠাগার সুব্যবস্থিত হয়। সদস্য-সংখ্যাও দ্রুত বাড়িয়া চলে। ১৯১২ সনের এপ্রিল মাস পর্যন্ত তিনি সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কার্যভার গ্রহণের সময় সদস্য-সংখ্যা ছিল ৬৫ জন, শেষ বৎসরে বাড়িয়া দাঁড়ায় ৭৩০ জন। সরকার হিন্দু স্কুল হইতে ইন্‌ষ্টিটিউটকে তুলিয়া দিতে চাহিলে বিনয়েন্দ্রনাথের নির্বন্ধাতিশয়ে নিরস্ত হন। তখন হইতে ইহার নূতন আবাস নির্মাণের আয়োজন আরম্ভ হইল। সরকার হইতে তিন লক্ষ টাকা পাওয়ায় বর্তমান ইন্‌ষ্টিটিউট-ভবন নির্মাণ সম্ভব হইয়াছে। বঙ্গের প্রথম লাট লর্ড কারমাইকেল ১৯১৬, ৬ই এপ্রিল এই ভবনের দ্বার উন্মোচন করেন। তখন ইহার সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র। বিনয়েন্দ্রনাথের আর একটি কীর্তি—দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যের জন্য ১৯০৮ সন হইতে 'দরিদ্র ভাণ্ডার' গঠন। ইহা হইতে বিস্তর ছাত্র বরাবর আর্থিক সাহায্য পাইয়া আসিতেছে।

ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্যক্ষেত্র ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে। এখানকার ব্যায়ামশালা এবং গ্রন্থাগার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, নাটকাভিনয় প্রভৃতি বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ঐক্যসূত্র গ্রথিত করিতে প্রয়াস পাইতেছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বকালে ১৯৩৯ সনে বয়স্ক-শিক্ষারও ব্যবস্থা হয়। এখনও সভ্যগণ এই কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট সংস্কৃতি-কেন্দ্ররূপে কলিকাতার একটি বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। জনসাধারণের সঙ্গে ইহার যোগাযোগ সাধিত হইলে ইহার কার্যকলাপ আরও সুফলপ্রসূ হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ

এখন বঙ্গীয় সহিত্য পরিষদের কথা বলিব। স্বল্প পরিসরের মধ্যে ইহার বিরাট কার্যকলাপের ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া এখানে সম্ভব। তবে গোড়ার কথা আমরা হয়ত অনেক ভুলিয়া গিয়াছি। এজন্য এই সম্বন্ধে এখানে একটু বিশদ করিয়া বলিতে চাই।

গত শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে কলিকাতায় সংস্কৃতিমূলক সভা-সমিতি বিস্তর স্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের জন্যও যে কোন কোন সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এমন নহে। তবে এই সকল খণ্ড প্রয়াসই ব্যাপক ও স্থায়ী পরিণতি লাভ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মধ্যে। ইহার উদ্ভবের ইতিহাস সম্বন্ধে এখানে একটু বলিয়া লই।

সিবিলিয়ান জন বীমস্ ১৮৭২ সনে ফরাসীদের ফ্রেঞ্চ একাডেমীর আদর্শে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যকে কথঞ্চিৎ নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনিবার জন্য একটি সমিতি বা পরিষদ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (১২৬৯—আষাঢ়) এই প্রস্তাবকে অভিনন্দন করিয়া লেখেন 'যে সকল বঙ্গ-পণ্ডিতেরা দেশের চূড়া, তাঁহারা ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন।'

বীম্‌সের এই প্রস্তাব লইয়া বঙ্গ পণ্ডিতেরা যে বিশেষ আলোচনায় লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। হিন্দু মেলার অন্তর্গত জাতীয় সভায় ১৮৭২, ১১ই আগষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের সভাপতিত্বে মনীষী রাজনারায়ণ বসু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সম্পর্কে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ইহার উপসংহারে তিনি বীম্‌সের প্রস্তাবের

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্
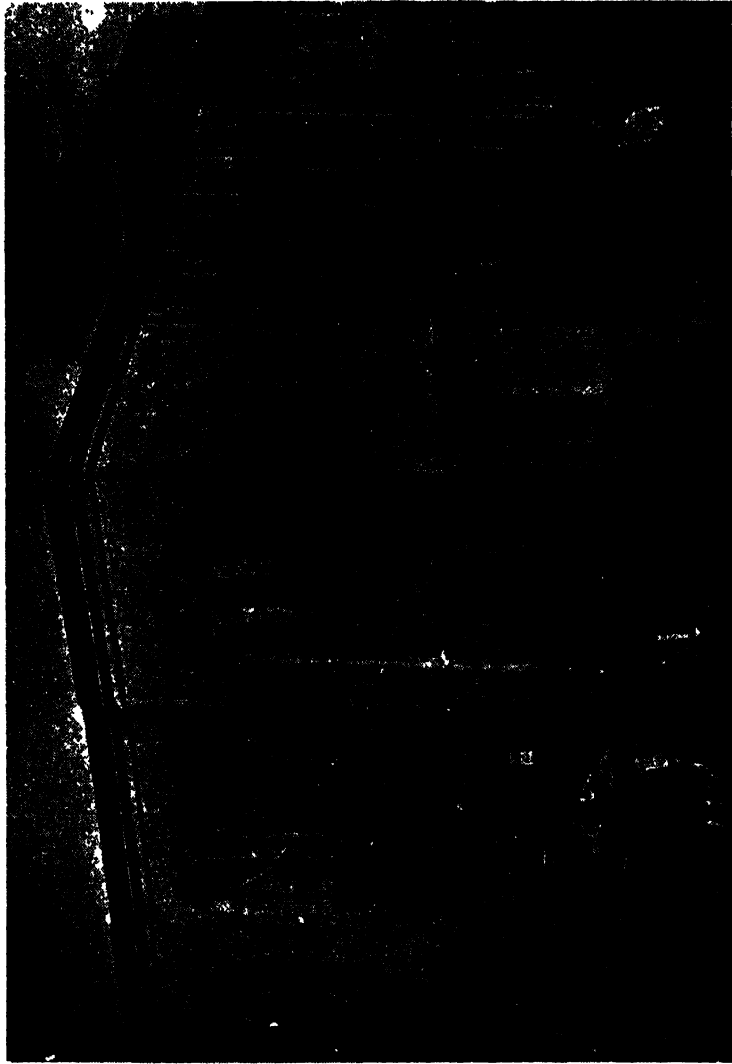
সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ঐরূপ আদর্শে সমিতি স্থাপিত হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি ব্যাহত হইবার প্রচুর সম্ভাবনা। অবশেষে উক্ত সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল যে, 'সাহিত্যরীতি সংস্থাপনী' সভা না হইয়া একটি সমালোচনী সভা হইলে ভাল হয়।

বীম্‌সের প্রস্তাবিত সভা প্রতিষ্ঠিত হইল না। তবে কিছুকাল পর পর বাঙ্গলা সাহিত্য আলোচনা ও অনুশীলনের সহায়ক তিনটি সভার সূচনা হইতে দেখিতে পাই—কলিকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' (এপ্রিল—১৮৭৪), 'সারস্বত সমাজ' (জুলাই—১৮৮২) এবং ঢাকা জয়দেবপুরে 'সাহিত্য সমালোচনী সভা' (মার্চ—১৮৮২)। ইহাদের কোনটিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। একটি সুষ্ঠু সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যও যে ইহাদের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারিত এমন কথাও বলা যায় না। যাহা হউক, ইহার কয়েক বৎসর পরে কলিকাতার আর একটি সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা এবং ইহা হইতে কিরূপে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের উৎপত্তি হইল, সেই কথাই এখানে বলিতেছি।

শোভাবাজারের রাজা (তখন কুমার) বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবনে ও তাঁহারই আশ্রয়ে ১৮৯৩ সনের ২৩শে জুলাই পূর্বোক্ত বীম্‌স সাহেবের প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার জন্য 'বেঙ্গল একাডেমী অফ্ লিটারেচার' নামীয় সংসদ স্থাপিত হয়। এল লিওটার্ড নামক বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী এক ফরাসী ভদ্রলোক এবং ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী সংসদ স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী হন। প্রথম অধিবেশনে সতর জন লোক উপস্থিত ছিলেন। অধ্যক্ষ-সভার সভাপতি হইলেন রাজা বিনয়কৃষ্ণ ও সম্পাদক ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী। এই সভার নামকরণ হইল, 'Bengal academy of Litarature'. 'বাঙ্গলা ভাষার বিশুদ্ধি সাধন সভার উদ্দেশ্য হইল এবং তদুদ্দেশ্যে বাঙ্গলা

গ্রন্থের ও সাময়িক পত্রিকার সমালোচনার্থ প্রবন্ধাদি উক্ত সভায় পঠিত হইত।' অধিকাংশ প্রবন্ধই ছিল ইংরেজী ভাষায় রচিত। কার্যবিবরণও ইংরেজী ভাষায় লেখা হইত। সভার নামে ইহার মুখপত্র প্রকাশিত হয় ১৮৯৩, আগষ্ট মাস হইতে। ইহাতে বাঙ্গলা রচনা স্থান পাইলেও ইংরেজী রচনারই বাহুল্য ছিল। সে যুগের বহু বিশিষ্ট মনীষী ও সাহিত্যিক একাডেমীর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন। সংসদের নাম, ইংরেজীর মাধ্যমে বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনা ইত্যাদি অল্পকালের মধ্যেই কোন কোন সদস্যের নিকট বড়ই বিসদৃশ ঠেকিতে লাগিল। রাজনারায়ণ বসু দেওঘর হইতে ১৮৯৩ সনের শেষ দিকে ইহার প্রতিবাদ করিয়া পত্র লেখেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' নামটি উমেশচন্দ্র বটব্যালের দেওয়া। ১৮৯৪ সনের প্রথমে তিনিও উক্ত বাঙ্গলা নামটির সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়া একখানি পত্র পাঠাইলেন। ১৮৯৪, ২৯শে এপ্রিল (১৩০১ সাল, ১৭ই বৈশাখ) একাডেমীর সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণের পৌরোহিত্যে এই সকল বিষয় আলোচনান্তর স্থির হয় যে, একাডেমীর নাম অতঃপর 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' এবং এই সময় হইতে ইহার কার্যবিবরণ, পঠিতব্য প্রবন্ধাদি রচনা সকলই বাঙ্গলা ভাষার মাধ্যমে হইবে। ইহার মুখপত্রখানিরও নাম হইল 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র প্রথম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন রজনীকান্ত গুপ্ত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল ১৩০১, ১৭ই বৈশাখই ধরা হয়। এই দিনে ইহার প্রথম সভাপতি পদে বৃত হন রমেশচন্দ্র দত্ত। প্রথম দুই বৎসর তিনি সভাপতি ছিলেন। প্রথম সহকারী সভাপতি—নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম বৎসরে সম্পাদকের কার্য করেন লিওটার্ড ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বৎসরের মধ্যে লিওটার্ড পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে রামেন্দ্রসুন্দর

ত্রিবেদী অন্তত্তর সম্পাদক হন। আগেকার উদ্দেশ্যের বদলে পরিষদের উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হইল এইরূপ—বিবিধ উপায়ে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুশীলন এবং উন্নতিসাধন। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই উপায়সমূহ অবলম্বন করাও স্থির হয়: (১) বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন, (২) বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক শব্দের পরিভাষা সঙ্কলন, (৩) প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ, (৪) ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদিব অনুবাদ প্রকাশ, (৫) দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য প্রভৃতি সকল প্রকার সাহিত্যের আলোচনা ও সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির প্রকাশ এবং (৬) 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' নামে বাঙ্গলা ভাষায় একখানি সাময়িক পত্র প্রচার।

পরিষদের প্রথম চাব-পাঁচ বৎসবের কার্যকলাপেব মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ কবিয়া উল্লেখ কবিতে হয়। বাঙ্গলা-সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে বাঙ্গলা শিক্ষার প্রসার একান্ত আবশ্যক। পরিষৎ-কর্তৃপক্ষ প্রথমেই এই কথা বিবেচনা করিয়া একদিকে বাঙ্গলা সবকার ও অন্যদিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হন। দীর্ঘকাল চেষ্টার পব ১৯০৪ সনে সরকাবী সিদ্ধান্তে স্থির হয়—তের বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের বাঙ্গলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং প্রবেশিকা পর্যন্ত স্বতন্ত্র বিষয়রূপে তাহারা বাঙ্গলা পড়িতে বাধ্য থাকিবে। পরিষদের দাবী আংশিকভাবে স্বীকার করিয়া সেনেটও ইতিপূর্বে ১৮৯১, ৩০শে জানুয়ারীর অধিবেশনে এফ এ ও বি এ পবীক্ষার্থীদের বাঙ্গলাকে একটি স্বেচ্ছামূলক পরীক্ষার বিষয় বলিয়া ধার্য করিলেন। পরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে (১৯০২-৩) উচ্চশিক্ষায় বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা-সাহিত্যকে যথানির্দিষ্ট স্থান দেওয়া হয়। ১৮৯৬ সনে সাহিত্য-পরিষদ যে প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন, দশ বৎসরের মধ্যে তাহা অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শতাব্দীর শেষ বৎসর হইতে পরিষৎ কর্তৃপক্ষ ইহাকে দৃঢ়তর

ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন সুরু করেন। ১৮৯৯ সনের ১৪ই এপ্রিল পরিষদ ১৮৬০ সনের ২১শ আইন অনুযায়ী রেজিষ্ট্রীকৃত হইল। পরিষদের তৎকালীন অবস্থা বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ স্থির করিলেন, ইহার উদ্দেশ্য ব্যাপক ও সাধারণগ্রাহ্য করিতে হইলে রাজ-আশ্রয় ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র ভবনে ইহার স্থান করিয়া লওয়া কর্তব্য। প্রতিষ্ঠা অবধি পরিষদ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবনেই স্থাপিত ছিল। ১৯০০, ১৯শে ফেব্রুয়ারী পরিষদের সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় ধার্য হয় যে, পরিষদ স্থানান্তরিত হওয়া প্রয়োজন। তৎপর দিবসই পরিষদের কার্যালয় ১৩৭।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে উঠিয়া আসে।

এই সময় হইতে সাহিত্য পরিষদে যেন নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হইল। পরিষদ বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিতে সুরু করিয়া দিলেন বাঙ্গলা ১৩০৬ সন (১৮৯৯—১৯০০) হইতে। বিভিন্ন সাহিত্যিক সুধী ব্যক্তির সম্পাদনায় প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থ ও পুঁথি প্রকাশিত হইতে লাগিল। পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম পুস্তক 'রসমঞ্জরী'। এশিয়াটিক সোসাইটির আদর্শে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন হইল। ১৩০৭ সন হইতে ১৩১৩ সন পর্যন্ত 'প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থাবলী' নামে দ্বৈমাসিক পত্রিকাকারে বাহির হয়। ইহা ছাড়া প্রথমাবধিই সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য, বিশেষ করিয়া প্রাচীন বাঙ্গলার আলোচনা-গবেষণার ফলও প্রকাশিত হইতে থাকে।

পরিষদের একটি প্রধান কার্য—বাঙ্গলার ও বঙ্গের প্রদেশগুলি হইতে বাঙ্গলা পুঁথি সংগ্রহ। এই কার্যে নানা জনে নানাভাবে সহায়তা করিতে আরম্ভ করেন। পরিষদের পক্ষে ইহার অন্যতম সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী (১৩০৬—১৩২২) দীর্ঘকাল

এই কার্যে লিপ্ত ছিলেন। আজ পরিষদের পুঁথিশালা যে এত সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাহার জন্য এ সময়কার কর্মীদের কৃতিত্ব কম নহে। প্রথম বর্ষ হইতেই পরিষদের পুঁথি-সংগ্রহ কার্য আরম্ভ হইয়াছিল। পরিষদকে লোক-শিক্ষার কেন্দ্র করিবার উদ্দেশ্যে 'লোকরঞ্জক বক্তৃতা' প্রদানের নিয়মিত ব্যবস্থা হয় ১৯০৬ সন হইতে। 'একালের দর্শন' শীর্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর চারিটি বক্তৃতা করেন।

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র প্রসার এবং বঙ্গের ঐতিহাসিক উপকরণ ও প্রাচীন কাব্যাদি সংগ্রহের জন্য প্রতি জেলায় ইহার একটি করিয়া শাখা-সভা স্থাপিত হউক'—১৩১১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে রংপুর হইতে এইরূপ একটি প্রস্তাব আসে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এইরূপ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পরিষদ হইতে অনুমতি পাইয়া ১৩১২ সনে রংপুরে প্রথম শাখা-পরিষদ স্থাপিত হইল। ইহার পরে ক্রমশঃ মফঃস্বলে বহু স্থানে শাখা-পরিষদ গঠিত হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩১১ সন হইতে একাদিক্রমে আট বৎসরকাল পরিষদের সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন। তাঁহার সম্পাদকত্বকালে পরিষদের নানা দিকে উন্নতি সূচিত হয়। শাখা-সভা গঠনের কথা এইমাত্র বলিয়াছি। তাঁহার সময়ে আরব্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন একটি বিশেষ কীর্তি। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সনে একটি বক্তৃতায় প্রাদেশিক ভাষা, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস ও বিবিধ তত্ত্বের আলোচনার জন্য একটি বার্ষিক সম্মেলনের ভার লইতে পরিষদকে অনুরোধ করেন। তখন বঙ্গবিভাগ স্থির হইয়াছে। এ সময় এরূপ সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যগত যোগাযোগের প্রয়োজন অধিকতর অনুভূত হইতেছিল। ১৯০৬ সনে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলনীর অব্যবহিত পরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন হইবার কথা থাকে। কিন্তু সরকারী অনাচারে প্রাদেশিক সম্মেলন ভাঙ্গিয়া

যাওয়ায় সাহিত্য-সম্মেলনও হইতে পারে নাই। ইহার পর বৎসর, ১৩১৪ সালের ১৭—১৮ কার্তিক মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে কাশিমবাজারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন সুসম্পন্ন হইল। এই সম্মেলন পরেও বহুবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কলিকাতায় ১৯০৬ সনে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষ্যে যে বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছিল তাহাতে কংগ্রেস প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের আহ্বানে পরিষদ বিশেষভাবে যোগদান করে। সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদে রক্ষিত প্রাচীন পুঁথি ও পুস্তক ব্যতীত বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক স্থানাদির ফটোগ্রাফ পুরা-দ্রব্য এবং কুটীর শিল্পাদি প্রদর্শনেরও আয়োজন করেন। এই সব দ্রব্য প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত করিতে পরিষদ সমর্থ হইয়াছিল—তাম্র ও প্রস্তরলিপির ছাপ, প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্থানের ও মন্দিরাদির ফটো, অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র, সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য ও হস্তলিপি প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গলা পুস্তক ও প্রাচীন পুঁথি। প্রদর্শনীর এই বিভাগটি দেখিয়া অনেকে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এগুলি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্যও পরিষদকে অনুরোধ জানান। পরিষদ নিজ গৃহের একটি কক্ষে সাময়িকভাবে এ সব রাখিবার ব্যবস্থা করে। পরিষদের চিত্রশালার উৎপত্তি হইল এইরূপে। জাতীয় ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্পকলা ও ঐতিহ্যের এই সকল গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের জন্য একটি স্থায়ী আবাসের প্রয়োজন বিশেষ করিয়া অনুভূত হইল। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনেই (১৩১৪) রামেন্দ্রসুন্দর এই নিমিত্ত একটি 'সারস্বত-ভবন' নির্মাণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিরূপে এই 'সারস্বত-ভবন'এর প্রয়োজন মিটিয়া গেল একটু পরে তাহা বলিতেছি।

১৯০৬ সনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষদ শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক হইতে ইহার সঙ্গে একযোগে কার্য করিতে আরম্ভ করে। রামেন্দ্রসুন্দরের দূরদর্শিতার জন্যই তখন ইহা সম্ভব হয়। স্বদেশী আন্দোলনকালে জাতীয় শিক্ষাপ্রচেষ্টা বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির মূলে ঢের রসদ জোগাইয়াছিল। পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উচ্চতম বিজ্ঞানবিষয়ক বিদ্যাও যাহাতে বাঙ্গলার মাধ্যমে আয়ত্ত করা যায় তদুদ্দেশ্যে রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা গঠনে উদ্যোগী হন। এই কার্যে তাঁহাব প্রধান সহায় হইলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

রামেন্দ্রসুন্দরের সময়কার সর্বপ্রধান কার্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবন নির্মাণের আয়োজন। ১৯০১ সনে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী পরিষদকে প্রায় সাত কাঠা পরিমিত ভূমি দান করেন। এই ভূমির উপরে বর্তমান সাহিত্য পরিষদ ভবন নির্মিত হয়। নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলে ১৯০৮ সনের ৬ই ডিসেম্বর মহা-সমারোহে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহপ্রবেশ করা হইল। বদান্য বাঙ্গালী প্রধানদের দানেই গৃহ-নির্মাণ সম্ভব হইয়াছিল। লালগোলার মহারাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় দ্বিতলের সমুদয় ব্যয় একাই বহন করেন। মনীষী ও সাহিত্যিকপ্রধানদের মূর্তি এবং চিত্র প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য গৃহসজ্জার ব্যাপারে আরও অনেকে বিস্তর দান করিলেন।

কবি সাহিত্যিক এবং মণীষাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অভিনন্দনের ব্যবস্থা পরিষদ করিতে লাগিল। পরিষদ একপঞ্চাশৎবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দনপত্র দ্বারা সম্বর্ধনা করে (১৯১২)। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বেই বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে এই অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়।

১৩১৬ সালে পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের পরলোকপ্রাপ্তিতে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ একটি সারস্বত ভবন নির্মাণের আশু প্রয়োজন অনুভূত হয়। স্মৃতি সমিতির অনুরোধে, বরোদার

গাইকোয়াড় সয়াজী রাও এই নিমিত্তে পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র ১৩২১ বঙ্গাব্দে পরিষদ-সংলগ্ন আরও সাত কাঠা জমি এইজন্য দিলেন। ১৩৩১ সালে এই ভবনের নির্মাণ-কার্য শেষ হয়। ইহা অতঃপর 'রমেশ ভবন' নামে পরিচিত হইল। চিত্রশালাও এখানে স্থানান্তরিত হইবার সুযোগ পাইল। পরিষদ ইহার পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ইহার প্রায় বার বৎসর পরে কয়েকজন পরিষদ-বন্ধুর, বিশেষতঃ রমেশচন্দ্রের দৌহিত্রী লেডী প্রতিমা মিত্রের ঐকান্তিক চেষ্টায় রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্মাণ সম্পন্ন হয়। প্রাচীন মুদ্রা, প্রস্তর মূর্তি, তাম্র শাসন, প্রাচীন চিত্র, প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র, প্রাচীন দলিল, সাহিত্যিক ও মনীষীদের মূর্তি এবং চিত্রাদি চিত্রশালার বিশিষ্ট অঙ্গ।

পরিষদের অমূল্য পুস্তক-সংগ্রহ এবং পুস্তক-প্রকাশ সম্বন্ধেও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। পরিষদ-প্রতিষ্ঠাবধি ইহার সঙ্গে একটি গ্রন্থাগার রক্ষার আয়োজন হয়। দীর্ঘ-কালের চেষ্টায় এই গ্রন্থাগার বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। একদিকে পরিষদ কর্তৃপক্ষ যেমন পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, অন্যদিকে বিশিষ্ট ব্যক্তির দানেও ইহা অতিশয় পুষ্ট হইয়াছে। বিশিষ্ট দান ও সংগ্রহগুলির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিনয়কৃষ্ণ দেব ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পুস্তক সংগ্রহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য পুস্তক প্রকাশে পরিষদের আগ্রহের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বিশেষ করিয়া লালগোলার মহারাজার ব্যক্তিগত দানেই প্রথম হইতে ইহা সম্ভব হইয়াছে। তিনি পরে এইজন্য তের হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এই অর্থের সুদ হইতে প্রতি বৎসর পুস্তক মুদ্রিত হইয়া থাকে। বাঙ্গলা সরকার ১৯১২, ১৯শে অক্টোবর এক পত্রে পরিষদকে পুস্তক প্রকাশার্থ প্রতি বৎসর বার শত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন এই সর্তে যে, ঐ উদ্দেশ্যে

ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। পরিষদ এই সর্তে দান গ্রহণ করেন।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ তহবিলে ঝাড়গ্রাম-রাজ দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই সকল দানের সুযোগ পরিষদ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্য হইতে উনবিংশ শতাব্দীর ক্লাসিক্‌স পর্যন্ত প্রকাশে সমর্থ হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের ভিতরে কতকগুলি বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'বৌদ্ধগান ও দোহা' এবং বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণী, বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী, চণ্ডীদাসের পদাবলী, মহাভারত (কাশীরাম দাস), শ্রীশ্রীপদকল্পতরু প্রভৃতিরও এই প্রসঙ্গে নাম করিতে হয়। যোগেশচন্দ্র রায় সঙ্কলিত বাঙ্গলা ভাষা (শব্দকোষ) এবং ফণীভূষণ তর্কবাগীশের ন্যায়-দর্শন (পাঁচ খণ্ড)ও স্মরণীয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বঙ্কিম-মধুসূদন-ভারতচন্দ্র-রামমোহন-দীনবন্ধু-দ্বিজেন্দ্রলাল-শরৎকুমারী-রামেন্দ্র-রচনাবলীর সুষ্ঠু সংস্করণ পরিষদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র বিষয়ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হয়। পরিষদ প্রকাশিত 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' বাঙ্গালা সাহিত্য-সাধকদের অমূল্য জীবনী-গ্রন্থ।

পরিষদের চিত্রশালা ও পুঁথিশালা বিশেষ সমৃদ্ধ। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কৃত মুদ্রা ও মূর্তির বিবরণ সহ তালিকা, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের মূর্তি-পরিচয় গ্রন্থ এবং শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তীর পুঁথি-শালায় সংরক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ পরিষদের এই সব স্থায়ী সম্পদের সঙ্গে সকলকে পরিচয় করাইয়া দিয়াছে। বাঙ্গলার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পকলা-স্থাপত্য-ভাস্কর্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়

লাভে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহায়তা একান্তভাবে স্মরণীয়। বহু সহৃদয় বাঙ্গালীর দানে পরিষদের উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারিয়াছে। সাহিত্য পরিষদ বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্বান্, সুধী, বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মিলনস্থল।*

আর একটি কথাও এখানে বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। পরিষদ-প্রকাশিত পুস্তকাবলী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-গবেষকদের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। এখানে মুদ্রিত ও অ-মুদ্রিত যেসব আকর-গ্রন্থ এবং বাংলা সাময়িক পত্রিকাদির সংগ্রহ আছে তাহাতে শুধু পরিষদই সমৃদ্ধ হয় নাই, বাঙ্গালী জীবন সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের নিকট সত্যসত্যই ইহা একটি তীর্থ-ক্ষেত্র।

---

*প্রবন্ধ রচনায় প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পুস্তক-পুস্তিকা হইতে সাহায্য লইয়াছি ঃ

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৪, ১৩১৫, ১৩১৬, ১৩১৭

২। পরিষৎ পরিচয়, ১৩৪৬

৩। ঐ, সংক্ষিপ্ত, ১৩৫৬

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ

এখন বলা যাক জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ সম্বন্ধে কিছু। বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলনের ইহা অন্যতম স্থায়ী ফল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীনে প্রদত্ত শিক্ষা জাতীয় আদর্শের অনুকূল ছিল না। জাতির সামাজিক প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষেও ইহা ছিল নিতান্তই অযথেষ্ট। সরকার যখন শিক্ষা-ব্যবস্থা নিজের হাতে ল'ন তদবধি ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়া সরকারী প্রয়োজন মিটাইতে, অর্থাৎ সস্তায় কর্মচারী সরবরাহে লাগিয়া যায়। কিন্তু ক্রমে শিক্ষার বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এ অভাব আর রহিল না। পরন্তু শিক্ষিত-বেকারের সংখ্যা অত্যধিক বাড়িয়া যায়। জাতির উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে শিক্ষিত দেশবাসীর বিমুখতা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই শিক্ষার গোড়ার গলদ সম্পর্কে সজাগ করিয়া তোলে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্দ্র পাল, সিষ্টার নিবেদিতা, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দেশহিতব্রতীরা এ বিষয়ে নানারূপ আলোচনায় ব্যাপৃত হন। কিন্তু তখন কার্যতঃ তেমন কিছুই করা সম্ভব হয় নাই।

এই সময় আসিল বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হেতু দেশমধ্যে যে আত্ম-নির্ভরতার অভূতপূর্ব প্রেরণা আসে তাহাতে যুবক ছাত্র-সমাজও যোগ না দিয়া পারে নাই। ছাত্রগণ দলে দলে সরকারী ও সরকার-অনুমোদিত বিদ্যালয়সমূহ বর্জন করিল। ইহা হইল ১৯০৫ সনের শেষার্ধের কথা। ছাত্রসমাজকে জাতীয় আদর্শ ও প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষা দিয়া সুপথে পরিচালনা করার জন্যই জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের সূচনা। আশুতোষ চৌধুরীর (পরে

হাইকোর্টের বিচারপতি ও 'স্যার' উপাধি প্রাপ্ত) আহ্বানে বাঙ্গলার নেতৃবৃন্দ ১৬ই নভেম্বর ১৯০৫ তারিখে এক সভায় মিলিত হইয়া উক্ত উদ্দেশ্যে একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে ছিলেন ডঃ রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সিষ্টার নিবেদিতা, চিত্তরঞ্জন দাশ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, (রাজা) সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ডঃ প্রসন্নকুমার রায় প্রমুখ চল্লিশ জন সদস্য। সম্পাদক হইলেন আশুতোষ চৌধুরী ও ডাঃ নীলরতন সরকার।

এখানকার সিদ্ধান্ত পরদিন এক প্রকাশ্য সভায় ছাত্রগণকে জানান হইল। এদিকে অস্থায়ী কমিটির কার্যও দ্রুত চলিতে লাগিল। নিয়ম-কানুন তৈরী হইয়া ১৯০৬, ১১ই মার্চ একটি প্রকাশ্য সম্মেলনে তাহা গৃহীত হয়, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ হয় 'ন্যাশনাল কৌন্সিল অফ্ এডুকেশন' বা জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ। পরিষদ ১৮৬০ সনের ২১শ আইন অনুযায়ী ১৯০৬, ১লা জুন রেজেষ্ট্রীকৃত হইল। বাঙ্গলার মফঃস্বলেও ইতিমধ্যে কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতায় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের আদর্শ এবং কর্মপ্রণালীকে সুষ্ঠু রূপ দিবার নিমিত্ত একটি স্কুল ও কলেজ স্থাপন করাও সাব্যস্ত হয়। ইহার উদ্বোধন-উৎসব সম্পন্ন হইল ১৯০৬ সনের ১৪ই আগষ্ট।

এইদিন কলিকাতা টাউন হলে এ উদ্দেশ্যে একটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। ডঃ রাসবিহারী ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইস-চ্যান্সেলার ডঃ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠায় সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তিনি সভার সম্মুখে পরিষদের আদর্শ ও নিয়মাবলী

যথাযথ ব্যাখ্যা করেন। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরোধিতা না করিয়াও, ভারতীয় জীবন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকলার চর্চা যে সাধ্য এবং তাহাই যে যুবসমাজের সত্যকার শিক্ষার উদ্দেশ্য—নিয়মাবলীর সরল ব্যাখ্যা হইতে তাঁহার প্রমুখাৎ উপস্থিত জনগণ তাহা সবিস্তারে জানিয়া লইল। রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য ভাষায় এই জাতীয় শিক্ষার শুভ সূচনাকে অভিনন্দিত করিয়া একটি চমৎকার বক্তৃতা করিলেন।

জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল তিন জন স্বনাম-ধন্য বাঙ্গালী-প্রধানের দানে। 'রাজা' সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা দান করিলেন। ময়মনসিংহ—গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী এবং মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী যথাক্রমে পাঁচ লক্ষ ও আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়া দিলেন। এই সময় হইতে কমবেশী আরো অনেকে পরিষদে দান করিতে আরম্ভ করেন। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ কয়েকজন খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতীর ত্যাগপূত সাহায্যলাভেও সমর্থ হয়। বরোদার গাইকোয়াড় কলেজের উপাধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ (পরে শ্রীঅরবিন্দ) নামমাত্র বেতনে নব-প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়-কুমার সরকার, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখ বিভিন্ন বিদ্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ তথা বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে আসিয়া যোগ দিলেন। স্কুল-কলেজের গতানুগতিক শিক্ষার পরিবর্তে ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির ভিত্তিমূলে জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হইল এখানে। জাতীয় কলেজ ও স্কুলের কার্যারম্ভ হয় ১৬৬নং বৌবাজার

ষ্ট্রীটে, বর্তমান বসুমতী সাহিত্য মন্দির ভবনে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ বিষয় লইয়া সান্ধ্য-বক্তৃতারও পরিষৎ-কর্তৃপক্ষ আয়োজন করিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য, ডঃ এ. কে. কুমারস্বামী প্রাচ্য শিল্পকলা, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কশাস্ত্র এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত উপনিষৎ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন। পরিষৎ-পরিচালিত পরীক্ষাদির প্রশ্নপত্র রচনা ও উত্তরপত্র পরীক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন বিস্থায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্য লওয়া হইত। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ শিক্ষা বিষয়ে পুরাপুরি জাতীয় হইয়া উঠিল।

বিজ্ঞান-আলোচনা ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানে শিক্ষাদান পরিষদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও কর্তৃপক্ষ প্রথমেই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। স্যার তারকনাথ পালিতের নেতৃত্বের পূর্বেকার অস্থায়ী কমিটির কয়েকজন সভ্য এই বিষয়ে সকলের আগেই কার্য আরম্ভ করা সমীচীন বোধ করেন। মতবিরোধ হেতু উক্ত কমিটি ত্যাগ করিয়া তাঁহারা 'সোসাইটি ফর দি প্রোমোশন অফ্ টেকনিক্যাল এডুকেশন' নামে একটি সভা গঠন করিলেন। এ সভাটিও ১৮৬০ সনের ২১শ আইন অনুযায়ী ১৯০৬, ১লা জুন রেজিষ্ট্রীকৃত হইল। পালিত মহাশয় এই সভার আনুকূল্যে ৯২, আপার সারকুলার রোডে স্বকীয় একটি বাড়ীতে ঐ সনের ২৫শে জুলাই 'বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইনষ্টিটিউট' স্থাপন করিলেন। এ সভারও সভাপতি হইলেন ডঃ রাসবিহারী ঘোষ এবং সম্পাদক পদে বৃত হইলেন ডাঃ নীলরতন সরকার, সত্যানন্দ বসু ও রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ইনষ্টিটিউটের প্রথম অবৈতনিক অধ্যক্ষ হইলেন প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু। এখানকার শিক্ষণীয় বিষয়—(১) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, (২) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, (৩) ভূতত্ত্ব এবং (৪) ফলিত রসায়ন। কাঁচ ও মৃৎশিল্প, রঞ্জন, সাবান তৈরী ও চামড়ার কাজ শেষোক্ত বিষয়টির অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরও

কতকগুলি কাজ, যেমন—এসিষ্টাণ্ট ফোরম্যান, ইঞ্জিনচালনা, মিটার ও মেকানিক্যাল ড্রাফ্‌ট্‌সম্যানের কার্যও শিখাইবার ব্যবস্থা হয়।

১৯১০ সন। তখন স্বদেশী আন্দোলনের প্রাবল্য অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল এবং বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রসংখ্যাও বিশেষ হ্রাস পায়, আর্থিক সচ্ছলতাও তেমন ছিল না। এ সময়ে এই দুইটি প্রতিষ্ঠান নিতান্ত আত্ম-রক্ষার তাগিদেই মিলিত হইল। তারকনাথ পালিতের ৯২নং আপার সারকুলার রোডে বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটেই ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল উঠিয়া আসে ১৯১০ সনের মে মাসে। উভয়েই জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইল তবে প্রত্যেকটির জন্য পরিষদের অধীনে স্বতন্ত্র পরিচালক-সভা রহিল। ১৯১০ জুন মাসে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ও ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকার হার্ভার্ড, ইয়েল ও মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতজন ছাত্র প্রেরণের জন্য জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের হস্তে ত্রিশ হাজার টাকা অর্পণ করেন। ইহার একটি সর্ত থাকে যে, ইহাদের প্রত্যেককে সাত বৎসর পরিষদের অধীনে নির্দিষ্ট বেতনে শিক্ষাদানকার্যে রত থাকিতে হইবে। এই অর্থে প্রেরিত সাতজনের মধ্যে কেহ কেহ পরবর্তীকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

নূতন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) বলে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভাইস্‌-চ্যান্সেলার রূপে ইহার পুনর্গঠনে ১৯১০ সন হইতে বিশেষ তৎপর হন। জাতীয়-শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে তিনি কখনও যুক্ত হন নাই বটে, তবে তিনি যে ইহার জাতীয় আদর্শে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা বিশেষ উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এক স্থলে তাহার সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়

সরকারী প্রতিষ্ঠান, তাহার সম্পদ ও শক্তি অপরিসীম। আবার ১৯১১ সনের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ায় পূর্বের ন্যায় ব্যাপক আন্দোলনেরও আর অবকাশ ছিল না। এইরূপ অবস্থায় কেহ কেহ জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের প্রয়োজনীতায়ও সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। স্যার তারকনাথ পালিত পরিষদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। তাঁহারই আদেশে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল এবং বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটকে আপার সারকুলার রোডের ভবন ছাড়িয়া যাইতে হইল। পালিত মহোদয় আপার সারকুলাব রোডের এই ভবনটি ১৯১২ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিলেন। এই বৎসরই জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠানগুলি মাণিকতলার মুরারিপুকুরে 'পঞ্চবটী ভিলা' নামক একটি বাগান-বাড়ীতে উঠিয়া যায়।

উল্লিখিত কারণসমূহের জন্য ন্যাশনাল কলেজের ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতে থাকে। ১৯১৭ সন নাগাদ কলেজ বিভাগ এবং ১৯২০ সন নাগাদ স্কুল বিভাগ উঠিয়া গেল। বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকিলেও, ববাববই কিছু কিছু ছিল। ১৯১৭ সন হইতে পুনরায় ইহা দ্রুত বাড়িতে থাকে। ১৯২১ সনে অসহযোগের মরশুমে পূর্ব বৎসব অপেক্ষা ইহা প্রায় তিন গুণ (৬৬৫ জন) বাড়িয়া যায়। মফঃস্বলের জাতীয় বিদ্যালয়-সমূহও জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরিষদ্ ইহাদের অর্থসাহায্যও করিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের পরে এগুলি প্রায়ই উঠিয়া যায়। দুই একটি মাত্র অবশিষ্ট ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, চাঁদপুরে হরদয়াল নাগের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত জাতীয় বিদ্যালয়টি নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বরাবর চলিয়া দেশবিভাগ ভিত্তিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সম্প্রতি উঠিয়া গিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনকালে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও বহু

জাতীয় বিদ্যালয় পরে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের অধীনে আসে ও ইহার সাহায্যলাভ করে। এগুলিও বেশীদিন টিকে নাই। তবে বরিশালের অন্তর্গত বানরীপাড়া জাতীয় বিদ্যালয়টিও বহুদিন চলিয়া দেশবিভাগের পর বন্ধ হইয়াছে।

১৯২১ সনে ছাত্রসংখ্যা অকস্মাৎ বাড়িয়া যাওয়ায় পরিষৎ কর্তৃপক্ষ ভীষণ ফাঁপড়ে পড়িলেন। ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষাদান যে প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। ইহার উপর আর একটি ব্যাপার তাঁহাদের উদ্বেগের কারণ হইল। ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর দানের একটি সর্ত ছিল যে, দানের সময় হইতে পনর বৎসর পরে পরিষদের মূলধন তাঁহার দান বাদে সাত লক্ষ টাকার কম হইলে তাঁহার প্রদত্ত সাহায্য হইতে পরিষদ বঞ্চিত হইবে। ১৯২১ সনটি তাই পরিষদের পক্ষে মারাত্মক বিবেচিত হইল। প্রতিষ্ঠাবধি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ছিলেন ডঃ (পরে স্যার) রাসবিহারী ঘোষ। তিনি এই বিপদের কথা জানিতেন। পূর্বে কিছু না বলিলেও ১৮২১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে রাসবিহারীর মৃত্যুর পর দেখা গেল—তাঁহার চরম ইচ্ছাপত্রে তিনি পরিষদকে তেরলক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সুদিন আসে। এই কথাই এখন বলি।

রাসবিহারী ঘোষের পর স্যার আশুতোষ চৌধুরী জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি হইলেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই সময় ছিলেন অন্যতর সম্পাদক। ইঁহারা প্রত্যেকেই এই প্রতিষ্ঠানটি গঠনে এবং ইহার পুষ্টিসাধনে সূচনা হইতে ধাত্রীর ন্যায় কার্য করিয়াছিলেন। রাসবিহারীর দান-প্রাপ্তির পর পরিষৎ-কর্তৃপক্ষ কালবিলম্ব না করিয়া ইহার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করিতে তৎপর হইলেন। কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে প্রাপ্ত যাদবপুরে নিরানব্বই বিঘা জমির উপর বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের ভবনসমূহ ও ছাত্রাবাস নির্মাণ তাঁহারা সুরু করিয়া দেন। ১৯২২ সনের মার্চ মাসে মূল বিদ্যালয়

ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯২৮ সনের শেষ পর্যন্ত সওয়া আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলেজ-ভবন, পরীক্ষণ ও গবেষণাগার, বিদ্যুৎ-উৎপাদন গৃহ, কারখানা ও ছাত্রাবাস, অধ্যাপক-নিবাস প্রভৃতি নির্মিত হয়। মাত্র কলেজ-ভবন নির্মিত হইলেই ইন্‌ষ্টিটিউট ১৯২৪ সনের জুন মাসে এখানে চলিয়া আসে। ১৯২৩ সনে এখানকার তিনজন অধ্যাপককে পরিষৎ উচ্চতম ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য জার্মানীতে পাঠান। তাঁহারা প্রত্যেকেই ইঞ্জিনীয়ারিং ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানে ডক্টর উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯২১ সনে ভবানীপুরের গোপালচন্দ্র সিংহ বাৎসরিক সাড়ে চারি হাজার টাকা আয়ের একটি সম্পত্তি পরিষৎকে দান করেন, কৃষিতত্ত্ব শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত। পরিষৎ নিজে কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা না করিতে পারায় প্রথমে কিছুকাল চুঁচুড়া কৃষি বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর অন্তর্গত শ্রীনিকেতনে এই উপস্বত্ব হইতে সাহায্য দেন। পরে, ১৯২৯ সনে কর্পোরেশনের নিকট হইতে কয়েকটি সর্ত সাপেক্ষে এই নিমিত্ত নিরানব্বই বিঘা জমি প্রাপ্ত হন। কিন্তু নানা কারণে কৃষি-বিভাগ খোলা সম্ভব হয় নাই। কর্পোরেশন পূর্ব সর্তাদি সত্ত্বেও পরিষৎকে নিজ প্রয়োজনে ইহার কতকাংশ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছিল। পরে আবার কৃষি-বিভাগ খোলার কথা হয়। ১৯২৭ সনে কর্পোরেশন পরিষৎকে ত্রিশ হাজার টাকা বার্ষিক অর্থসাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। ইহার নিকট হইতে ১৯৩৩ সনে এককালীন দেড় লক্ষ টাকা পাওয়া যায়।

এখানে আর একটি কথাও বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হয়। ১৯২৯ সনে বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের নাম বদল করিয়া 'কলেজ অফ্ ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেক্‌নোলোজী, বেঙ্গল' নামকরণ হয়। এখানে জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগে ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—জুনিয়র বিভাগে তিন বৎসর এবং সিনিয়র

বিভাগে পাঁচ বৎসরের জন্য। ইহা ছাড়া পরীক্ষা ও নক্সা অঙ্কনাদি শিক্ষার জন্য দুই বৎসরের একটি বিভাগ আছে। সিনিয়র বিভাগে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং এই তিনটি উপ-বিভাগ রহিয়াছে।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কলেজ ও স্কুল বিভাগ এখন বিলুপ্ত। 'হেমচন্দ্র বসুমল্লিক চেয়ার' নামে ইতিহাসের অধ্যাপক এবং 'প্রবোধ চন্দ্র বসুমল্লিক চেয়ার' নামে দর্শনের অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথম অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয় ১৯০৬ সন হইতেই। অরবিন্দ ঘোষ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিধুভূষণ দত্ত, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই পদে নিযুক্ত থাকিয়া বক্তৃতা দিয়াছেন। দর্শন বিভাগে ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ডঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বিগত কুড়ি বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় মহাসমর ও নানা বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। কলেজের বহুলাংশ সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়ায় কলেজের উন্নতিও ব্যাহত হইয়াছিল। ইহার পর পুনরায় সুদিন আসিয়াছে। স্বাধীন ভারতে বাঙ্গলা সরকার ও ভারত সরকার পরিষৎ-পরিচালিত কলেজের উপকারিতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া ইহাকে প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানটিকে ভিত্তি করিয়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইয়াছে। এই নব রূপায়ণের কথা এখানে আলোচ্য নহে। বস্তুত স্বদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে এবং স্বদেশীয় শিল্প ও শিল্পকারখানার উন্নতিতে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের কৃতিত্ব অসামান্য।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ

আমরা এযাবৎ কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্রগুলির কথা আলোচনা করিতে গিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে কিংবা তাহারও পূর্বে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি-কেন্দ্রসমূহের পরিচয় দিতে প্রধানত প্রয়াস পাইয়াছি। বিংশ শতকের প্রথম পাদে কলিকাতায় এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় হইয়াছে, জাতীয় সংস্কৃতির বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে যাহাদের কথাও বিশেষ করিয়া বলিতে হয়।

প্রথমেই সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইংরেজী ১৯১৬ সনে কয়েকজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং কতিপয় সংস্কৃতাধ্যায়ী বিদ্যার্থীর প্রাণপণ চেষ্টায় এই পরিষদ স্থাপিত হয়। সংস্কৃত ভাষার এবং সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ সাহিত্যের প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যেই পরিষৎ প্রতিষ্ঠা কবা হয়। উদ্দেশ্যসাধনকল্পে কয়েকটি উপায়ও নির্ণীত হইল। এগুলির মধ্যে এই কয়টি উল্লেখযোগ্য (১) গ্রন্থাগার—এখানে মুদ্রিত গ্রন্থ ও হস্ত-লিখিত পুঁথি সংগৃহীত হইয়া থাকে, (২) গ্রন্থ-প্রকাশ; (৩) পত্রিকা-প্রকাশ; (৪) চতুষ্পাঠী স্থাপন ও (৮) সংস্কৃত নাট্যের অভিনয়।

এই সকল উদ্দেশ্যে কার্যও অবিলম্বে সুরু হইল। প্রথমেই গ্রন্থাগারের কথা বলি। গ্রন্থাগারে দুইটি বিভাগ—মুদ্রিত পুঁথি ও হস্তলিখিত পুঁথি। সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ—ভারতবর্ষের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর ইংরেজী ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত পুস্তকাবলী সহ এখানে প্রতিষ্ঠাবধি সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এক স্থলে সংস্কৃত সাহিত্য
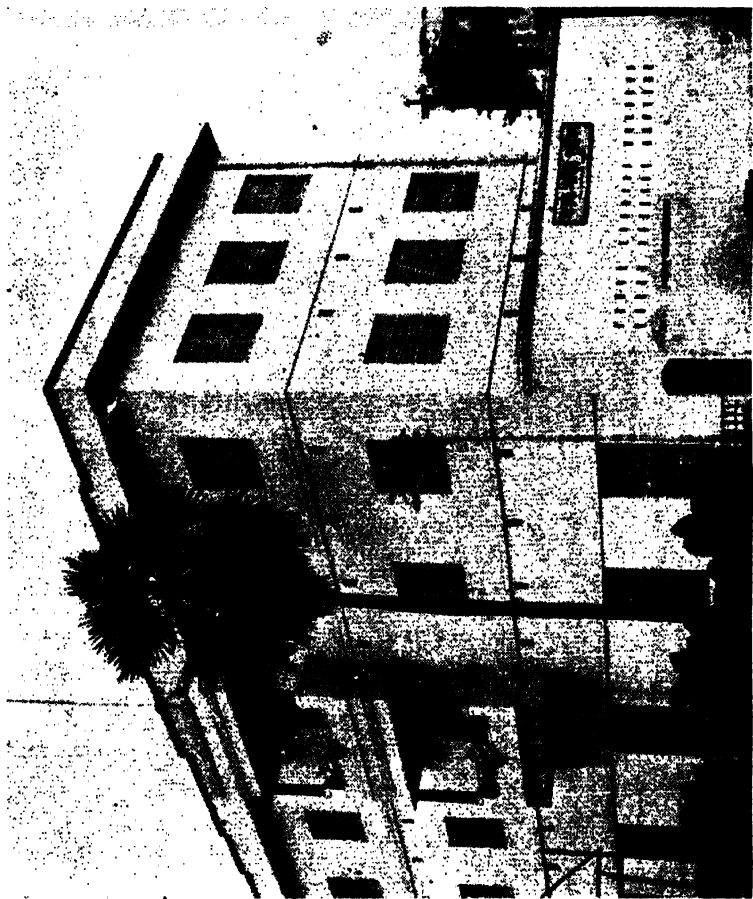
সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্
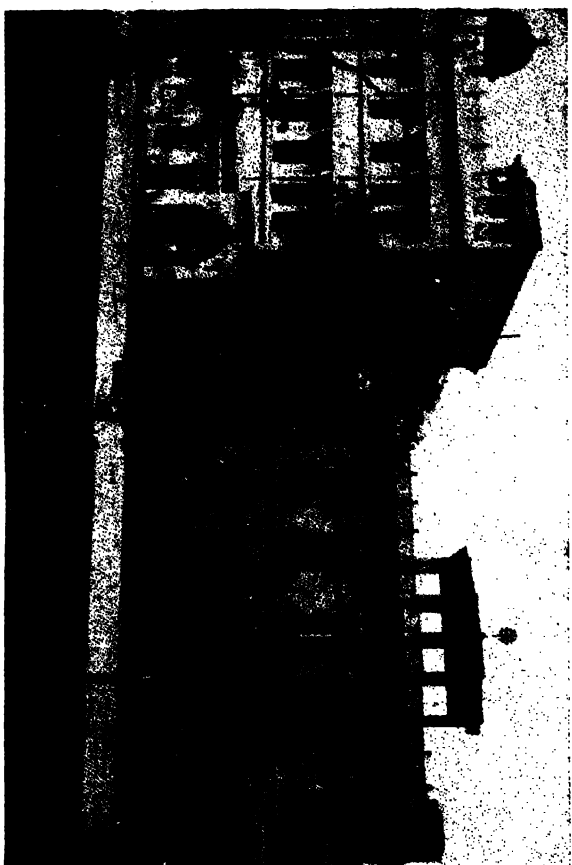
বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

পুস্তকের এরূপ মূল্যবান সংগ্রহ বঙ্গদেশে কচিৎ দেখা যায়। এখানকার পুস্তক-সংখ্যা বর্তমানে দশ হাজারের উপর।

পুঁথি সম্পর্কেও পরিষদ্ বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত ও বাংলা—দুই ভাষায় লিখিত পুঁথিই এখানে রহিয়াছে। এই বিভাগ-টিতে কলিকাতার প্রাচীন ও বিশিষ্ট পরিবারের কর্তৃপক্ষ-স্থানীয়েরা বহু সংস্কৃত পুঁথি দান করিয়াছেন। এই সকল দানের মধ্যে শোভাবাজারের মহারাজা কমলকৃষ্ণের পুঁথি-সংগ্রহ, ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের পুঁথি-সংগ্রহ, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণের পুঁথি-সংগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া ও ইল্‌ছোবা, বর্ধমানের মেমারি, যশোহরের ব্রাহ্মণডাঙ্গা, সাতক্ষীরা এবং ফরিদপুরের অন্তর্গত ধানুকা ও কোটালিপাড়া প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রসমূহ হইতেও বিস্তর সংস্কৃত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। বাংলা পুঁথিও নানা স্থান হইতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কয়েকখানির সন্ধান ইতিপূর্বে কোথাও মিলে নাই। পরিষদের প্রাক্তন অন্যতম সহকারী সম্পাদক অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী পরিষদ্-সংরক্ষিত সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথির বিবরণ পূর্বে যথাক্রমে কলিকাতাস্থ 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টালি' (২য় খণ্ড) এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য—অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ। গ্রন্থ-প্রকাশ প্রচুর অর্থসাপেক্ষ। প্রতিষ্ঠার ছয় বৎসরের মধ্যেও পরিষৎ-কর্তৃপক্ষ এদিকে মনঃ-সংযোগ করিতে পারেন নাই। ইহার পরই তাঁহারা গ্রন্থ প্রকাশে সবিশেষ তৎপর হন। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহ প্রামাণিক পুঁথি দৃষ্টে সংশোধনান্তর অভিজ্ঞ সংস্কৃত-পণ্ডিত বা অধ্যাপকদের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। আবার এমন পুস্তকও প্রকাশিত

হইয়াছে, যাহা ইতিপূর্বে কখনও মুদ্রিতাকারে পাওয়া যায় নাই। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ১৯২৭ সন পর্যন্ত প্রকাশিত এরূপ আঠাবখানি পুস্তকেব বিবরণ উক্ত ইংরেজী পত্রিকায় (১ম খণ্ড) লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার পর আরো বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। উপরেই বলিয়াছি, বাংলার প্রখ্যাত সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণ এসব সম্পাদনায় লিপ্ত ছিলেন। এই সকল গ্রন্থের মাত্র কয়েকখানি এখানে উল্লেখ করিতেছি: কালীতন্ত্রম্, শঙ্করী সঙ্গীতম্, দুর্গাপূজাতত্ত্বম্, মুক্তিবাদঃ, সায়নভাষ্যভূমিকা, প্রভাকরবিজয়ম্, পবনদূতম্, ভাষারত্নম্, ছন্দোোগ্যমন্ত্রভাষ্যম্, মনোদূতম্, দেবীশতকম্, শতরঞ্জ-কুতূহলম্, আনন্দলতিকা প্রভৃতি। পরিষদের গ্রন্থমালা ভারতবর্ষ ও ইউরোপ আমেরিকার বুধমণ্ডলী কর্তৃক বিশেষ সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। পরিষদ্ এ সকল প্রচারের যথাসাধ্য প্রযাস পাইয়া থাকেন।

পবিষদ্ সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য অনুশীলনেব জন্য একটি চতুষ্পাঠী পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। বাংলাব বিখ্যাত পণ্ডিতগণ এখানে অধ্যাপনাকার্যে রত আছেন। চতুষ্পাঠী স্থাপনাবধি বহু বৎসর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য ইহার অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ-পদের নাম 'আচার্য'। তাঁহার অধ্যক্ষতা-কালে বহুশত ছাত্র কলিকাতা সংস্কৃত এশোসিয়েশন ও ঢাকার সারস্বত সমাজের বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। চতুষ্পাঠীতে আরও অনেক অধ্যাপক অধ্যাপনাকার্যে লিপ্ত ছিলেন এবং এখনও লিপ্ত রহিয়াছেন। লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীজানকীনাথ শাস্ত্রী চতুষ্পাঠীর আচার্য পদ অলঙ্কৃত কবিয়াছিলেন। শ্রীরামধন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন শাস্ত্রে ছাত্রবৃন্দের যথারীতি অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

প্রতিষ্ঠাকাল হইতে পরিষদ্ স্বীয় উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য করিতে তৎপর হন, আগে বলিয়াছি। কোন কোন উদ্দেশ্য—(যেমন সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ)—অনুযায়ী কার্যারম্ভ হইতে বেশ সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু পরিষদের মুখপত্রস্বরূপ একখানি সংস্কৃত মাসিক পত্রিকার প্রকাশ সুরু হয় ইহার দ্বিতীয় বর্ষ হইতে। সংস্কৃত চর্চার প্রসার সাধনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী পণ্ডিত-গণের সারগর্ভ প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এযাবৎ বহুসংখ্যক ভারতবিখ্যাত পণ্ডিতের জীবনী চিত্রসহযোগে ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। পত্রিকাখানি প্রবন্ধ-গৌরবে ভারতের অন্যান্য সংস্কৃত ভাষার পত্রিকাসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিগত মহাসমরকালে কাগজ-নিয়ন্ত্রণ হেতু কর্তৃপক্ষ ইহার কলেবর সঙ্কীর্ণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তবে এখানি এখনও প্রবন্ধ বিষয়ে সমৃদ্ধ এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট অত্যন্ত আদরণীয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রথম হইতেই পরিষৎ-কর্তৃপক্ষ আর একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন--ইহা রূপকাভিনয় বা সংস্কৃত নাটকের নাট্যরূপ প্রদর্শন। এ পর্যন্ত ত্রিশখানিরও উপর নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কালিদাস, ভবভূতি, ভাস, ভট্টনারায়ণ, ভাস্কর, শূদ্রক, বোধায়ন ও শ্রীহর্ষ কৃত সুবিখ্যাত নাটকগুলি পরপর অভিনীত হয়। আধুনিক পণ্ডিতগণের রচিত কোন কোন নাটকের অভিনয়ও বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

সংস্কৃতের অনুশীলন যাহাতে ব্যাপ্তিলাভ করে সে উদ্দেশ্যে পরিষদ্ বাংলার বাহিরেও নানা স্থানে সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করে। হরিদ্বার, কানপুর, কাশী, পাটনা প্রভৃতি বহু স্থানে এযাবৎ অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে। নিখিল-ভারত সংস্কৃত মহা-

সম্মেলন ও প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনে সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের জন্য পরিষদ্ একাধিকবার নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই নাটক অভিনয়ও বহু দেশী-বিদেশী বিদগ্ধজনের বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছে।

সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে বাংলার বিখ্যাত পণ্ডিত, অধ্যাপক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ নানাভাবে যুক্ত। পরিষদের প্রথম সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বিদ্যারত্ন (১৩২৩-৩০ বঙ্গাব্দ)। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ কলিকাতা ত্যাগের পূর্বে দুই বৎসরকাল (১৩৩১-৩৩) এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ১৩৩৪ সাল হইতে ১৩৪৫ সালে মৃত্যু পর্যন্ত সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিচারপতি ডঃ বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় কয়েক বৎসর যাবৎ পরিষদের সভাপতি ছিলেন। প্রতিষ্ঠাবধি পরিষদের একটি উৎসব প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। প্রথম বার্ষিক উৎসবে পৌরোহিত্য করেন স্বনামধন্য স্যার ডঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন, ডঃ এস্ রাধাকৃষ্ণণ, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ প্রমুখ বহু পণ্ডিত ও যশস্বী ব্যক্তি বিভিন্ন বার্ষিক উৎসবে সভাপতি হইয়াছিলেন।

স্বীয় সার্থক কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা পরিষদ্ দেশ-বিদেশে বিশিষ্টমর্যাদা লাভ করিয়াছে। একসময় নিখিল-ভারত সংস্কৃত মহাসম্মেলনের পরিচালন ভারও সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের উপর অর্পিত হয়। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ১৯০৬ সনে এই মর্মে বলিয়াছিলেন যে, সর্বভারতীয় লিপিস্বরূপ নাগরী লিপি গ্রহণ এবং সংস্কৃত ভাষার ভিত্তিতে একটি সাধারণ ভাষা গঠন স্বাধীন ভারতের জাতীয় লিপি ও ভাষার অভাব নিরাকৃত করিবে। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের দীর্ঘকালব্যাপী প্রয়াসের ফলে লোকমান্যের এই

উক্তি সার্থক হইতে পারে বলিয়া অন্ততঃ পণ্ডিতাগ্রগণ্য সমাজের প্রতীতি জন্মিয়াছে। এদিকে পরিষদের কৃতিত্ব সত্য সত্যই প্রশংসার্হ। কিছুকাল হইল পরিষদ্ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে নিজস্ব ভবনে উঠিয়া আসিয়াছে। ইহার সংস্কৃতিমূলক কার্য সম্প্রসারণে এই নূতন ভবনটি বিশেষ সহায় হইবে সন্দেহ নাই।

সায়ান্স কলেজ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ সায়েন্স কলেজ নামে পরিচিত। এই কলেজের পুরা নাম কিন্তু বেশ দীর্ঘ—'ইউনিভার্সিটি কলেজ অব্ সায়ান্স এণ্ড টেক্‌নোলোজী'। পঁচিশ বৎসর পূর্বেও আপার সার্কুলার রোড আজিকার মত এত জনাকীর্ণ ছিল না। এখানে ভূমিখণ্ডের উপর সায়ান্স কলেজের প্রাসাদোপম বিরাট ভবন অবস্থিত। শিয়ালদহ হইতে উত্তর দিকে রওনা হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে এই ভবনটি সকলেরই চোখে পড়িবে।

এই ভবন কিন্তু বিজ্ঞান বা সায়ান্স কলেজের একাংশ মাত্র। বালিগঞ্জেও ইহার একটি বিভাগ আছে। সেখানকার ভূমির আয়তন হইল ইহার দ্বিগুণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণার মূল এই কেন্দ্রটির সুন্দর ইতিহাস আছে। প্রথমেই সংক্ষেপে এসম্বন্ধে কিছু বলিব।

গত শতাব্দী হইতেই কলিকাতার কোন কোন সরকারী ও বেসরকারী কলেজ ও প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন হয়। বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ ও বিবরণ পাঠক-পাঠিকা পাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষিগণও বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া এ সম্পর্কে স্বদেশবাসীদের সচেতন করিয়া দিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ভারতবর্ষের উন্নতির পক্ষে বিজ্ঞানের অনুশীলন অপরিহার্য—একথা তাঁহারা তখনই ব্যক্ত করিয়াছিলেন—ইহার পর আসিল বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলন। এই সময় বিজ্ঞান-চর্চার উপরে দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়।

তখন নেতৃবৃন্দ টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্র প্রসারিত করিতে চেষ্টিত হন। ঐ সময় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। তিনি নিজেও ছিলেন বিজ্ঞানী—অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি স্বদেশের প্রয়োজন মিটাইবার উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনতিবিলম্বে ইহাতে সুফলও ফলিল। কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার তারকনাথ পালিত তাঁহার কলিকাতার ও কলিকাতার বাহিরের বিরাট সম্পত্তি ১৯১২ সনে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা-সম্বলিত একখানি পত্রে স্যার আশুতোষের মাধ্যমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিলেন। আপার সারকুলার রোডের উপরে যেখানে এখন সায়ান্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত সে ভূমির পরিমাণ বার বিঘা এবং এই সময় তারকনাথ ছিলেন ইহার মালিক। এই জায়গাটিরও ইতিহাস আছে। এটি ছিল পার্শী দানবীর বিখ্যাত রুস্তমজী কাওয়াসজীর বাগান। পার্শ্ববর্তী পার্শীবাগান লেন এখনও ইহার স্মৃতি বহন করিতেছে। এই বাগানে ১৮৭৫ সনে রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে হিন্দু মেলার বাৎসরিক অধিবেশন হয়। তারকনাথ পালিতের আগ্রহাতিশয়ে এখানে প্রথম বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টি-টিউট স্থাপিত হইল। পালিতের দানে প্রাপ্ত এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভূমিতে সায়ান্স কলেজের প্রধান অঙ্গটি স্থাপিত হইয়াছে। বালিগঞ্জের যে স্থলে সায়ান্স কলেজের অন্য অংশ অবস্থিত, সেখানে তারকনাথ স্বয়ং বাস করিতেন। তাহার আয়তন চব্বিশ বিঘা। পালিত-প্রদত্ত দানের পরিমাণ পনর লক্ষ টাকা। সম্পত্তির আয় হইতে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার জন্য একজন করিয়া অধ্যাপক নিয়োগের কথা থাকে। দানের পরিমাণ হইতে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা আলাদা করিয়া রাখা হয় বিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে বিশেষ বৃত্তি প্রদানের জন্য।

স্যার তারকনাথ পালিতের মত কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি স্যার রাসবিহারী ঘোষ ১৯১৩ সনের ৮ই আগষ্ট স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হস্তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং কৃষিকেন্দ্রিক উদ্ভিদ্ বিদ্যার অধ্যাপক নিয়োগের নিমিত্ত এককালীন দশ লক্ষ টাকা অর্পণ করিলেন। ইহার কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর পরে রাসবিহারী পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়কে এগার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা দেন ফলিত রসায়ন ও ফলিত পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপক নিয়োগের উদ্দেশ্যে। দাতা প্রথম পত্রে দানের সর্তস্বরূপ চারিজন অধ্যাপকের সঙ্গে দুইজন করিয়া ছাত্র-গবেষক নিয়োগের উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় বারেও দুইজন করিয়া চারিজন ছাত্র-গবেষক নিয়োগের ব্যবস্থা হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সানন্দে রাসবিহারীর এই দুইটি দানই গ্রহণ করিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার জন্য আরও কয়েকটি দান এখানে উল্লেখযোগ্য। খয়রার রাণী বাগেশ্বরী এবং কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহের নিকট হইতে প্রাপ্ত দানের বাৎসরিক ত্রিশ হাজার টাকা আয় দ্বারা পাঁচটি বিষয়ের অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা হয় ১৯২০-২১ সনে। তন্মধ্যে বিজ্ঞানের বিষয় হইল তিনটি—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও কৃষিতত্ত্ব। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেপ্টেম্বর ১৯২২ হইতে আগষ্ট ১৯৩৭ পর্যন্ত প্রাপ্ত সমুদয় বেতন স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া রসায়নের অনুশীলনের নিমিত্ত একটি ভাণ্ডার গঠন করেন। সায়ান্স কলেজ ভবন সংলগ্ন অজৈব রসায়ন গবেষণাগার গৃহ নির্মাণ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি ভবনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার আয় হইতে মাসিক দুইশত টাকা রায়বৃত্তি দিয়া একজন রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর চরম

ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী তদীয় পত্নী লেডী অবলা বসু ১৯৩৭ সনের ১১ই ডিসেম্বর পত্র দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক লক্ষ টাকা দান করেন। উদ্দেশ্য—পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যার সম্পর্ক-নির্ণায়ক গবেষণা কার্য পরিচালনা।

পালিত এবং ঘোষের নিকট হইতে দান প্রাপ্তির অল্পকাল পরে সায়ান্স কলেজ ভবনের নির্মাণকার্য সুরু হয়। নির্মাণকার্য শেষ হইলে, এখানে বিজ্ঞান শিক্ষাদান ও গবেষণাকার্য আরম্ভ হইল ১৯১৭ সনে। রসায়নশাস্ত্রের প্রথম পালিত অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৯১৬-৩৭)। পদার্থবিদ্যায় প্রথম পালিত অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্ (১৯১৭-৩৪)। রাসবিহারী ঘোষের নিকট হইতে দান পাওয়া গেল নগদ টাকায়। তিনি দুই বারে যে-পরিমাণ অর্থ দান করেন তাহা দ্বারা দান-প্রাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৯১৪ সনে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন ফলিত গণিতে গণেশপ্রসাদ, পদার্থবিদ্যায় দেবেন্দ্রমোহন বসু, রসায়নে প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র এবং উদ্ভিদবিদ্যায় এস্ পি আগারকার। দ্বিতীয়বারের দানে ১৯২০ সনে হেমেন্দ্রকুমার সেন ফলিত রসায়ন এবং ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ ফলিত পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদ লাভ করেন। খয়রার গুরুপ্রসাদ সিংহ পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক পদে ১৯২১ সনে প্রথম নিযুক্ত হইলেন মেঘনাদ সাহা, রসায়নে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং কৃষিতত্ত্বে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দানের ফলে প্রথম ফেলো বা গবেষক পদ লাভ করেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বর্মণ (১৯৩০), আর আচার্য জগদীশচন্দ্রের দানে প্রথম ফেলো বা গবেষক নিযুক্ত হন বসুকুমার বাগচী (১৯৩০)। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। পালিত, ঘোষ ও অন্যান্য দাতাদের সর্তস্বরূপ এই সকল অধ্যাপক ও গবেষক পদে ভারতবাসী নিয়োগেরই ব্যবস্থা হয়। ইহার কারণও সুস্পষ্ট। ভারতবর্ষে ভারতবাসীদের মধ্যে

বিজ্ঞানের গবেষণার প্রসারই দাতাদের একান্ত লক্ষ্য ছিল।

দানে প্রাপ্ত অর্থ ও ভূসম্পত্তির আয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সব অধ্যাপক পদ ও গবেষক পদের সৃষ্টি হয় এ পর্যন্ত তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয় নিজেও ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের কয়েকটি বিষয়ে স্বতন্ত্র অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি করিলেন। উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন পি ব্রুল ১৯১৮ সনে। এইরূপে ক্রমে প্রাণিবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে উচ্চতর অধ্যাপনা ও গবেষণা সুরু হয়। প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক হন প্রথমে সমরেন্দ্রনাথ মৌলিক (১৯২০), মনস্তত্ত্বে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু (১৯৩৯), এবং নৃতত্ত্বে ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৪০)। ভূতত্ত্বের অধ্যাপনা চলিলেও এই বিষয়ে অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি হয় মাত্র অল্পদিন। শ্রীনির্মলনাথ চট্টোপাধ্যায় জুন ১৯৫২ হইতে এই পদে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়-অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। এ সকল ছাড়াও ভূগোল, সংখ্যাতত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগও খোলা হইয়াছে। এসব পদেও অধ্যাপক নিযুক্ত রহিয়াছেন। এখানে কয়েকটি বিভাগের অধ্যাপকগণের নামই মাত্র উল্লেখ করিলাম। তাঁহাদের সহকারীরূপেও বহু কৃতী বিজ্ঞানী বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত আছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানবিভাগ গঠনের মূলে রহিয়াছে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব, একথা আজ আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। তিনি প্রধানতঃ পালিত, ঘোষ ও খয়রার দানের উপর নির্ভর করিয়া প্রায় পাঁচ বৎসরের মধ্যেই বিরাট ভবন ও গবেষণাগার সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয় সায়ান্স কলেজ গঠনে সমর্থ হন। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহারই নির্বন্ধাতিশয়ে বিভিন্ন অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীন ছিল। ঐ সকল দানের প্রধান সর্তস্বরূপ ভারতীয়দের নিয়োগের কথা থাকায় ভারত সরকার প্রথম হইতেই

ইহার উপর বিরূপ ছিলেন এবং আশুতোষের এই কার্যে যথোপযুক্ত সাহায্য না করিয়া বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। ১৯২০ সনের পর, ডায়ার্কির আমল হইতে বিশ্ববিদ্যালয় সাক্ষাৎভাবে বাঙলা সরকারের অধীনে আসে। কিন্তু অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের তুলনায় বাঙলা সরকার বিজ্ঞান-বিভাগকে সাহায্য করিতে বিশেষ কার্পণ্য দেখান। সরকারী সাহায্যের পরিমাণ স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্যন্ত ত্রিশ বৎসর যাবৎ ছিল মোট ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশ মাত্র। বিভিন্ন দানের আয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি-ফণ্ড হইতে বাকী প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ব্যয় নির্বাহিত হইয়াছে। ইহার ফলে বাঙলা দেশে সুষ্ঠুরূপে বিজ্ঞান-চর্চার সূচনা হইলেও অর্থাভাবে তাহা আশানুরূপ প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। বরং অন্যান্য প্রদেশ হইতে পিছাইয়াই পড়িতেছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সায়ান্স কলেজের যথেষ্ট উন্নতির উপায় সূচিত হইয়াছে। আণবিক গবেষণার জন্য যন্ত্রাদি স্থাপনেরও নানারূপ ব্যবস্থা হইতেছে।

সায়ান্স কলেজের কার্যারম্ভের পর গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে, সরকারী বিরূপতা সত্ত্বেও, যে-সব কাজ হইয়াছে তাহা বিশ্ব-বৈজ্ঞানিক মহলের বিস্ময় উদ্রেক না করিয়া পারে নাই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-কার্যের কথা 'প্রেসিডেন্সী কলেজ' প্রসঙ্গে কিছু বলিয়াছি। অবসর গ্রহণের পর আচার্য বসু 'বসু বিজ্ঞান-মন্দির' প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ গবেষণা-কেন্দ্র তৈরী করিয়া লন। ইহার কথা একটু পরেই বলিব। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সরকারী কর্মে বহাল থাকিতেই স্যার আশুতোষের অনুরোধে সায়ান্স কলেজ গঠনের ভার লইয়া ১৯১৬ সনে এখানকার কর্মে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার উপদেশে প্রেসিডেন্সী কলেজের একদল যুবক-ছাত্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকেই

এখানে আসিয়া তাঁহার সহকারী হইলেন। উপরে গোড়াকার দিকের যে-সকল অধ্যাপকের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র। তাঁহারা এক একজন এখন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকরূপে দেশ-বিদেশে প্রশংসিত।

স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্‌কে ১৯১৭ সনে স্যার আশুতোষ পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। রামন্‌ ইতিপূর্বে সরকারী কর্মে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক বিজ্ঞান-প্রীতি বশে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভায় ১৯০৭ সন হইতেই পদার্থবিদ্যার গবেষণাকার্যে প্রবৃত্ত হন। তিনি সেখানকার কর্তৃপক্ষ দ্বারা কিরূপ সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা প্রসঙ্গে তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। এইখানে স্যার আশুতোষ রামনের গবেষণা-কার্য প্রত্যক্ষ করেন। ১৮১৭ সনে সরকারীকর্ম ত্যাগ করিয়া রামন্‌ যখন সায়ান্স কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হইয়া আসেন তখন এখানে পদার্থবিদ্যার গবেষণাগার ভালরূপ নির্মিত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়-ক্রীত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি লইয়া তিনি বিজ্ঞান-সভায়ই গবেষণা করিতে থাকেন। দীর্ঘকাল গবেষণার ফলে ১৯২৮ সনে তিনি আলো-বিকিরণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। ইহার নাম দেওয়া হয় 'রামন্‌ এফেক্ট'। এই আবিষ্কারের দরুণ তিনি ১৯৩০ সনে পদার্থ বিদ্যায় বিশ্ববিশ্রুত নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। এশিয়া মহাদেশে বিজ্ঞানের জন্য তিনিই প্রথম নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হন।

আচার্য রায় ও চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামনের নেতৃত্বে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন গবেষণায় বহু কৃতী যুবক ক্রমে ক্রমে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। রসায়ন বিজ্ঞানে ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, ডঃ প্রিয়দারঞ্জন রায়, ডঃ দুঃখহরণ চক্রবর্তী প্রমুখ বিজ্ঞানীগণের জৈব ও

অজৈব রসায়নের গবেষণা দেশ-বিদেশে সমাদৃত হইয়াছে। আচার্য রায়ের অনুপ্রেরণায় 'ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার মুখপত্রস্বরূপ যে 'জর্নাল' বাহির হয় তাহাতে রসায়ন-গবেষকদের মৌলিক গবেষণা সকল প্রকাশিত হইয়াছে। বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও আবিষ্কারের ফলাফল আচার্য রায় ও তাঁহার ছাত্রগণের যুগ্ম নামে প্রকাশিত হইত। ইহাতে আচার্য রায়ের সঙ্গে তাঁহার ছাত্রদের নামও বিজ্ঞানী মহলে প্রচারিত হইবার সুযোগ পায়।

পদার্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ শিশিরকুমার মিত্র, ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু প্রভৃতি যে-সব গবেষণা ও আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা আজ বিদগ্ধ বিজ্ঞানী-সমাজে সুবিদিত। পদার্থ-বিজ্ঞানের কোন কোন জটিল সমস্যা ডঃ সাহার গবেষণার ফলে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইন-ষ্টাইনের কোন কোন গবেষণা বিশেষভাবে অগ্রসর হইয়াছে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আবিষ্কারের ফলে। বর্তমানে প্রত্যেক বিজ্ঞানছাত্রকে পদার্থবিদ্যা অধ্যয়নকালে এই দুইজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকের নাম এক সঙ্গে উচ্চারণ করিতে হয়। রেডিও বা বেতার বিষয়ে অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র যে সকল গবেষণা করিয়াছেন, শুধু ভারতবর্ষে নহে, অন্যান্য বহু উন্নত দেশের পক্ষেও তাহা অভিনব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে 'পদার্থবিদ্যার যুদ্ধ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এটম্, রেডিও প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণা ও আবিক্রিয়ার দরুণই উহা এইরূপ আখ্যা লাভ করিয়াছে। কলিকাতা সায়ান্স কলেজে এ সকল বিষয়ে যে সমুদয় গবেষণা হইয়াছে তাহার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এ বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ ও তাঁহাদের গবেষণা বিভিন্ন বিখ্যাত বিজ্ঞান-পত্রিকায় স্থান পাইতেছে। ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট অফ

সায়ান্সেস্-এর মুখপত্রেও এ সকল নিয়মিত বাহির হইয়া থাকে।

এখানে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধেই বিশেষ করিয়া বলা হইল। এজন্য কেহ যেন মনে না করেন যে, বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে তেমন কার্য হয় নাই বা হইতেছে না। ভূতত্ত্বের অধ্যাপক নির্মলনাথ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল যাবৎ কয়লা, মৃত্তিকাদি নানা বিষয়ের গবেষণায় এরূপ বহু তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন যাহার ফলে শিল্পাদির ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও প্রয়োগ দ্বারা জাতি প্রচুর লাভবান্ হইবে। মনস্তত্ত্ব বিভাগ ডাঃ গিরিন্দ্রশেখর বসুর নেতৃত্বে পুনর্গঠিত হইয়া এদেশে বিজ্ঞান আলোচনার এক নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছে। মনস্তত্ত্ব-বিদ্‌গণ একটি সোসাইটি গঠন করিয়া শুধু গবেষণা নহে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও স্বদেশবাসীর মনোরোগের প্রতিষেধক আয়োজন করিতেছেন। নৃতত্ত্ব, সংখ্যাতত্ত্ব, শিক্ষা-বিজ্ঞান, খাদ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিভাগেও বিস্তর কাজ হইতেছে। আশা করা যায়, নূতন পরিবেশে সায়ান্স কলেজ বিজ্ঞানের অনুশীলনে সমগ্র দেশে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। এখান হইতে প্রকাশিত, সুসম্পাদিত 'সায়ান্স এণ্ড কালচার' নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকা এই বার্তাই যেন দেশবাসীকে পরিবেশন করেন।

বসু বিজ্ঞান-মন্দির

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-সভার কথা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এখন বসু-বিজ্ঞান-মন্দির সম্বন্ধে কিছু বলিব।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কারের কথা দেশে বিদেশে কে না জানেন? এ সকল আবিষ্কারের একটি সূত্র এবং ইতিহাস আছে। সে-সব আলোচনার স্থান ইহা নহে। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তাঁহার মনে কিরূপে উদয় হয় সে সম্বন্ধে প্রথমে একটু বলিয়া লই।

১৮৯৬ সন। আচার্য জগদীশচন্দ্র সহধর্মিণী লেডী অবলা বসুকে সঙ্গে লইয়া বিলাতে উপস্থিত। লণ্ডনের রয়্যাল ইনষ্টিটিউটে আচার্য বসু তাঁহার নূতন আবিক্রিয়া তাঁহারই উদ্ভাবিত নূতন যন্ত্র সহযোগে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সম্মুখে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তখন আচার্য বসু ও তাঁহার সহধর্মিণী উভয়েরই মনে ভারতবর্ষেও এইরূপ একটি ইন্‌ষ্টিটিউট বা মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উদিত হয়।

ইহার পর দীর্ঘ কুড়ি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আচার্য বসুর আবিক্রিয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে—বিদ্যুৎ-তরঙ্গ হইতে উদ্ভিদ্‌-চেতনায় অনুক্রামিত হইয়াছে। দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকগণের নিকট জড় বলিয়া বিবেচিত তরুলতারও প্রাণের স্পন্দন নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্র সহযোগে দেখাইতে গিয়া কতই না পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকদের বিতর্ক ও বিরুদ্ধাচরণ কখনও কখনও শত্রুতার পর্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আচার্য বসু অচল অটল। তিনি যাহা একবার ধরিয়াছেন তাহা তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি তাঁহার আবিক্রিয়ার যথার্থতা বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী

তাঁরা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করাইয়া তবে ছাড়িয়াছেন। তাঁহার এই জয়মাল্য ভারতমাতার গলায় পরাইবেন কেমন করিয়া?

বিলাতের রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের মত একটি গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁহার হৃদয়ের অন্ত-স্তলে ধীরে ধীরে রূপ লইতেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহ-বাণী এবং সিষ্টার নিবেদিতার ঐকান্তিক 'ভারতীয়তা' আচার্য বসুকে এই কার্যে ক্রমশঃ অধিকতর প্রবুদ্ধ করিতে লাগিল। সিষ্টার নিবেদিতার কথা আচার্য বসুর জীবনীকার পেট্রিক গেডিস এইরূপ লিখিয়াছেন:

"Nivedita's combination of intellectual and pers - nal idealism was fully aroused by Bose's discoveries and his difficulties in those days in convencing others of them. Her fervid faith in the long-dreamed-of Research Institute, its possibilities for science and its promise for India, was no small impulse and en-couragement towards its realisation; and thus is explained the memorial fountain with its bas-relief of "Woman carrying light to the Temple." (Life and work of Sir Jagadish Ch. Bose, p. 221.)

বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিকল্পনায় 'ভারতীয়তা'র ছাপ সুস্পষ্ট। স্বদেশীয় শিল্প-কলা স্থাপত্য-রীতিতে ইহা সত্য সত্যই একটি মন্দিরের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। আচার্য জগদীশচন্দ্রের জাতীয় আদর্শানুযায়ী গবেষণা-মন্দির প্রতিষ্ঠা আধুনিক যুগে একটি অভিনব ব্যাপার।

জগদীশচন্দ্র ১৯১৫, ৩০শে নভেম্বর প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াই দীর্ঘকাল পোষিত পরিকল্পনাকে সুষ্ঠু রূপ দিতে

অগ্রসর হইলেন। কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া স্বোপার্জিত অর্থের দ্বারা বর্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করিয়া দেন। এই সময়, কয়েকজন গণ্যমান্য ভারতবাসী—স্যার আশুতোষ চৌধুরী, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, স্যার আলী ইমাম, ডাঃ নীলরতন সরকার, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ডঃ বনোয়ারীলাল চৌধুরী—জাতির নিকট আচার্য জগদীশচন্দ্রের পরিকল্পনাকে আশু রূপায়িত করিবার জন্য আবেদন জানান (প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩২৪, পৃঃ ৫২৫—২৭)। এই আবেদনে ফলও হইয়াছিল যথেষ্ট। বরোদার মহারাজা গায়কোয়াড়, বোম্বাইয়ের এম আর বোমান্‌জী, মূলরাজ খৈতান, দানবীর স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি দেশহিতৈষী মহানুভবগণের নিকট হইতে বহু অর্থসাহায্য পাওয়া গেল। বাঙ্গলা সরকার এবং ভারত সরকারও সহানুভূতি ও সহায়তা প্রদর্শন করিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আচার্য জগদীশচন্দ্র স্বোপার্জিত নগদে ও সম্পত্তিতে সতের লক্ষ টাকা এই মন্দিরের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে জগদীশচন্দ্রের 'অন্তরের আদর্শ, প্রদীপ্ত বাসনা এবং জীবনের সাধনা ফলবতী' হইবার অবকাশ পাইল।

যথানির্দিষ্ট দিনে, ১৯১৭ সনের ৩০শে নভেম্বর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দিরেব উদ্বোধন-কার্য উদ্‌যাপন করিলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার তাম্রফলকের উপর তিনি এই কথা কয়টি লেখেন:

"ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ
কামনায় এই বিজ্ঞান-মন্দির দেব
চরণে নিবেদন করিলাম।
—শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু"
(১৪ই অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯৪৭।)

রবীন্দ্রনাথ রচিত 'আবাহন' সঙ্গীত গীত হইবার পর জগদীশচন্দ্র 'নিবেদন' পাঠ করেন। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের ভাবাদর্শ ও ভাবী

গবেষণা-প্রণালীর নির্দেশ তিনি ইহাতে দিলেন। তিনি ইহার একস্থলে বলিয়াছেন :

"বিজ্ঞান অনুশীলনের দুইটি দিক আছে। প্রথমতঃ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর, জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার। সেইজন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতাগৃহ নির্মিত হইয়াছে। এস্থানে কোন বহুচর্চিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে সেই সকল নূতন সত্য এস্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। ...মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকা দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে। এ মন্দিরের শিক্ষা লইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না।"

("অব্যক্ত", ২য় সং, পৃঃ ১৮১—৮২)

এই উদ্ধৃত অংশ হইতে জগদীশচন্দ্রের ভাষাতেই তাঁহার বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে পরিচিত হই। মন্দির প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যে এখানে গবেষণার কাজও সুরু হইল। কিন্তু এ বিষয়ের পূর্বে মন্দিরের অবস্থান শাখা ও পরিচালনাদি সম্পর্কেও দু-চার কথা বলিতেছি।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দির ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণ ও মাঠ প্রথমেই ক্রীত হয় এবং গবেষণা-কার্য পরিচালনের নিমিত্ত যেমন তরুলতার উদ্যান গঠিত হয় তেমনি উত্তরে ও দক্ষিণে দুই সারি গৃহও নির্মিত হয়। গবেষণার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের একটি কারখানাও এই সঙ্গে স্থাপিত হইয়াছিল। এইসব ভবনের আকার ক্রমে পরিবর্ধিত হইয়াছে। শিল্প ও কারুকার্য সমন্বিত বক্তৃতা-গৃহের উপরেও একটি ত্রিতল অংশ বর্তমানে পাঠক দেখিতে পাইবেন। এইসকল গৃহের অধিকাংশ-গুলিরই পরিকল্পনা আচার্য জগদীশচন্দ্রের। আর এবিষয়ে তাঁহার প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন শ্রীযুত অবনীনাথ মিত্র। বসু-বিজ্ঞান-

মন্দিরের দুইটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—দার্জিলিঙের মায়াপুরীতে এবং বজবজ লাইনে কলিকাতার বত্রিশ মাইল দূরবর্তী ফলতায় পূর্বে সিজবেরিয়া এবং যশোহর রোডের পার্শ্ববর্তী বামনগাছিতেও কৃষিবিষয়ক গবেষণার জন্য জমি লওয়া হয়।

এই জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানটিকে দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমেই একটি গবর্ণিং বডি বা অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হয়। এই সভা বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের যাবতীয় সম্পত্তি রক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করেন। অধ্যক্ষ-সভায় প্রথমে ছিলেন—আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসু, লেডী অবলা বসু, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, ডাঃ নীলরতন সরকার, ডঃ বনোয়ারীলাল চৌধুরী, সুধাংশুমোহন বসু ও সতীশ রঞ্জন দাশ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও প্রথম দিকে এই মন্দিরের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। ইহা ছাড়া মন্দিরের কার্য পরিচালনার জন্য একটি কৌন্সিল বা পরিচালনা-সমিতি আছে। মোট বার জন সদস্য লইয়া ইহা গঠিত। অধ্যক্ষ-সভা তাঁহাদের মধ্য হইতে এখানে মনোনীত করিয়া পাঠান ইঁহাদের সাতজন। ইহা ছাড়া ফাইনান্স কমিটি, বিল্ডিং কমিটি আদিও আছে। আচার্য বসু এখানকার প্রথম ডিরেক্টার বা পরিচালক। তাঁহার মৃত্যুর (১৯৩৮) পর হইতে বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯১৯, ১০ই এপ্রিল হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জগদীশচন্দ্রের প্রধান সহকারী বা এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর ছিলেন অধ্যাপক নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ। অধ্যাপক নাগের অবসর গ্রহণের পর এই পদ উঠিয়া যায়। ইহার পরে রেজিষ্ট্রার পদের সৃষ্টি হয়। এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন উদ্ভিদবিদ্ শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ। প্রথমেই নয়জন কর্মী ও গবেষক আসিয়া আচার্য বসুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহারা যথাক্রমে—গুরুপ্রসন্ন দাস, সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, বশীশ্বর সেন, জ্যোতিঃপ্রকাশ সরকার, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,

সত্যেন্দ্রনাথ দে, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

জড় ও জীবের ভিতরে বাহিরের আঘাত-উত্তেজনায় যে একই রকমের সাড়া পাওয়া যায় এ বিষয়টি বিজ্ঞানজগতে প্রতিষ্ঠা করিতে জগদীশচন্দ্রকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। উদ্ভিদের যে প্রাণ ও চেতনা আছে, একথাও তিনি জগদ্‌বাসীকে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার এই আবিষ্কার আর এই গবেষণাকার্যের জন্য তাঁহারই উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতিও সকলের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ক্রমে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী যে তাঁহার আবিষ্কার ও গবেষণা-প্রণালীর মৌলিকতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা আরম্ভেই বলিয়াছি। বসু মহাশয়ের এই আবিষ্কারগুলি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের উন্নতিতেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে। এই বিষয়ে পরীক্ষা ও গবেষণার জন্যই এই বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণার পরিণতি উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে; কাজেই উদ্ভিদ্ সম্পর্কে গবেষণাই এখানে প্রাধান্য লাভ করে। তথাপি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের গবেষণারও আয়োজন করিবার কথা থাকে যাহাতে উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের গবেষণা ও পরীক্ষণে সহায়তা হইতে পারে।

প্রতিষ্ঠাবধি প্রথম বার বৎসর বসু মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীনে মন্দিরের যাবতীয় গবেষণাকার্য পরিচালিত হয়। শিষ্য ও কর্মীদেরও প্রধানতঃ তাঁহারই নির্দেশে গবেষণা ও পরীক্ষাকার্য চালাইতে হইত। এই সময়ের মধ্যে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রাকৃতিক ঘটনাদি সম্পৃক্ত তাঁহার নিম্নোক্ত চারিখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক ১৯২৩, '২৪, '২৬ ও '২৯ সনে পর পর প্রকাশিত হয়:

Physiology of the Ascent of sap.
The Physiology of Photosynthesis.
The Neverous Mechanism of Plants.
Growth and Torpic Movements of Plants.

শেষোক্ত ১৯২৯ সন হইতে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষণার কতকটা মোড় ফিরিল। এই সময়ে গবেষক-কর্মীগণ নিজ নিজ মতে স্বাধীনভাবে গবেষণা করার সুযোগ পান। পর বৎসর কর্মীদের গবেষণার ফল একখানি বিবরণী-পুস্তকে প্রকাশিত হইল। ইহাই বসু-বিজ্ঞান-মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত 'ট্রানজ্যাকৃশুন্‌স্' নামে পরিচিত। আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবিতকালে এই পুস্তকের বার খণ্ড বাহির হয়। ইহার পরে আরো কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে কত বিভিন্ন ধরনের গবেষণা গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এই বিবরণ-পুস্তকগুলি তাহার দর্পণস্বরূপ। মন্দিরে গবেষণার ক্ষেত্র ক্রমশঃ কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে ইহা হইতে তাহাও হৃদয়ঙ্গম হয়।

উক্ত বিবরণ-পুস্তকমালার প্রথম ছয় খণ্ডে আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং প্রথম দিককার তাঁহার সহ-গবেষকদের বিস্তর নূতন নূতন পরীক্ষিত তথ্য স্থান পাইয়াছে। 'বৃক্ষের রস-সঞ্চালন', 'উদ্ভিদ্‌দেহে স্পন্দন' এবং 'উদ্ভিদ্ ও জীবদেহে উত্তেজনাপ্রবাহ' প্রভৃতি বহু তথ্যপূর্ণ গবেষণা এই বিবরণ-পুস্তকগুলিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। ১৯২৯ সনে সহকারী ডিরেক্টর অধ্যাপক নগেন্দ্রচন্দ্র নাগের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় রসায়ন-বিভাগের যথারীতি গবেষণা সুরু হয়। এই বিভাগ হইতে প্রকাশিত গবেষণা-প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদের রাসায়নিক পরীক্ষা' শীর্ষক নিবন্ধটি চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়াছে।

নৃতত্ত্ব ও কীটপতঙ্গ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণাও শীঘ্রই বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে আরম্ভ হইল। সপ্তম খণ্ড বিবরণপুস্তকেই (১৮৩১-৩২) শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র বসুর নৃতত্ত্ববিষয়ক এবং শ্রীযুত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কীটপতঙ্গ বিষয়ক গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়। গোপালচন্দ্রের 'মৎস্যাশী মাকড়সা ও তাহাদের চরিত্র' বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে গবেষণা-ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়। জগদীশচন্দ্রের জীবিতকালেই উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌ শারীরতত্ত্ব, রসায়ন, কীটপতঙ্গ বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, প্রজননতত্ত্ব প্রভৃতি সাতটি বিজ্ঞান-শাখায় গবেষণার সূত্রপাত হয়। পরবর্ত্তী বিবরণ—পুস্তকগুলিতে এই সকল বিষয়ের গবেষণালব্ধ বহু নূতন নূতন তথ্যসম্বলিত প্রবন্ধ ক্রমে প্রকাশ পায়। অষ্টম খণ্ডে (১৮৩২-৩৩) প্রকাশিত 'উদ্ভিদ্‌-কাণ্ডের ব্যাসবৃদ্ধির উপর বহিঃপ্রযুক্ত উত্তেজনার ফলানুসন্ধান', নবম খণ্ডের (১৮৩৩-৩৪) 'অঙ্কুরোদ্গম নির্ণায়ক যন্ত্র' এবং 'স্বয়ংমান প্রশ্বাস-যন্ত্র', দশম খণ্ডের (১৯৩৪-৩৫) 'ভিটামিন সি' বিষয়ের তথ্যমূলক গবেষণা প্রবন্ধ (শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত) বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছে। শেষোক্ত গবেষণা-প্রবন্ধটি খাদ্য-বিজ্ঞানের আলোচনায় যুগান্তর আনিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার পর বিভিন্ন বিভাগের গবেষণাদি বিবরণ-পুস্তকগুলিতে স্থান পাইয়াছে।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের কর্ম্মী-গবেষকগণের বহু গবেষণার ফলাফল দেশ-বিদেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকাদিতেও ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। কীটপতঙ্গ-তত্ত্ববিশারদ শ্রীযুক্ত গোপাল ভট্টাচার্যের প্রবন্ধাদি সংখ্যায় বহু এবং কলিকাতা, বোম্বাই, বাঙ্গালোর, নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থানের বিশেষ বিশেষ পত্রিকায় স্থানলাভ করিয়াছে। ডঃ হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রসায়নমূল, ডঃ শশাঙ্কশেখর সরকারের ভূতত্ত্ব ও আদিম সংস্কৃতিবিষয়ক, ডঃ হীরেন্দ্রকুমার নন্দীর পাট-উৎপাদন ও পাটের কীটশত্রু সম্বন্ধীয় এবং পদার্থবিজ্ঞানের বহু গবেষণা-প্রবন্ধও এইরূপে অন্যান্য পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। আর সকল বিষয়ে প্রথম হইতেই জগদীশচন্দ্র বসু বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে ফলতায় কৃষিকার্য ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ্‌ এবং জীব-

রসায়নের গবেষণাও ঐ সময় পরিচালিত হয়। পরে বামনগাছিতে কৃষিবিষয়ে গবেষণা-কার্য আরম্ভ হয়।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার ইচ্ছা ও আদর্শ অনুযায়ী বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গবেষণা এবং সকলের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে তৎসমুদয়ের প্রয়োগে কর্তৃপক্ষ প্রথমাবধি তৎপর হইয়াছেন। বর্তমানে স্বাধীন ভারতে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের মত একটি স্বদেশীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সর্বসাধারণ স্বীকার করিয়াছেন। ভারত-সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় অর্থাদি সাহায্য দান এবং এখানে নিজ ব্যয়ে গবেষক নিয়োগ ইহার প্রমাণ। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির দেশ বিদেশের সকল বিদ্বজ্জনের মিলন ক্ষেত্র। বর্তমানে ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসুর সুযোগ্য পরিচালনায় ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইতেছে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এই মন্দিরে কিছুকাল অবস্থিত থাকিয়া বাঙ্গলাভাষীদের মধ্যে বিজ্ঞানের নব নব বার্তা পৌঁছাইয়া দিতে সহায়তা করে। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির সত্য সত্যই বাঙ্গালী জাতির একটি শ্লাঘার বস্তু।

নির্ঘণ্ট